SHARI'AH FACULTY STUDENTS'

JOURNAL 2003

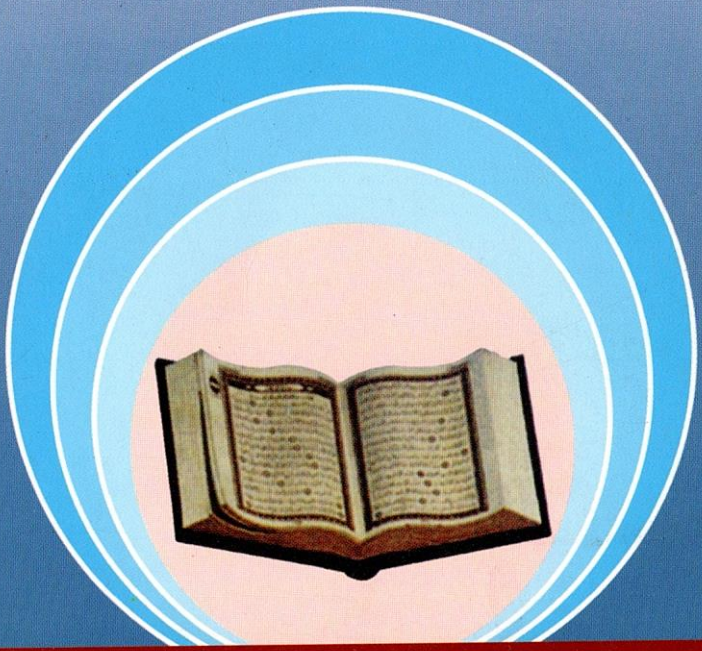

297.05
H139r
J-1606

الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ
International Islamic University Chittagong

SHARI'AH FACULTY STUDENTS'
JOURNAL 2003

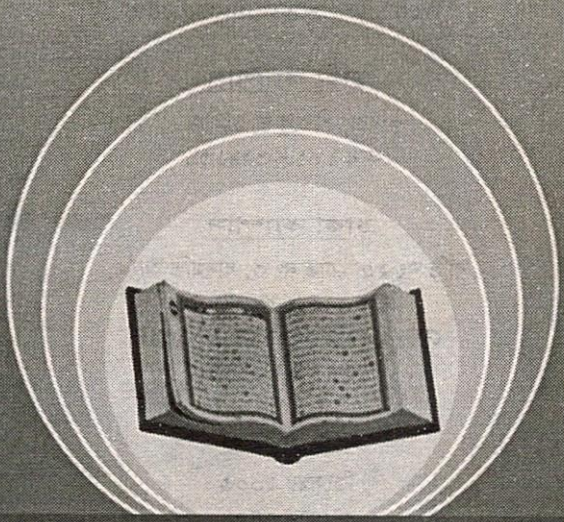

الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ
International Islamic University Chittagong

CENTRAL LIBRARY
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY, CTG.
Acc. No: J - 1606
Date: 07 - 02 - 2017

শরীয়াহ ফ্যাকাল্টি স্টুডেন্ট'স জার্নাল ২০০৩

প্রকাশনায়

শরীয়াহ ফ্যাকাল্টির ছাত্রবৃন্দ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।
চকবাজার, চট্টগ্রাম- ৪২০৩
ফোনঃ ৮৮০-৩১-৬১০০৮৫, ৬১০৩০৮, ৬২৫২৩০, ৬৩৮৬৫৬-৭
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-৩১-৬১০৩০৭
ই-মেইল ঃ info@iiuc.ac.bd
Web site : www.iiucbd.edu

স্থায়ী ক্যাম্পাস

কুমিরা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ০১৮-৩২৯১৩৯

ঢাকা ক্যাম্পাস

বাড়ি নং ২৩, রোড নং ৩, ধানমন্ডি আ/এ,
ঢাকা ১২০৫, বাংলাদেশ।
ফোন ঃ ০২-৮৬২৯৯৪৭, ৮৬১৩৯৪
ফ্যাক্স ঃ ০২-৮৬২৪৬৯২

প্রকাশ কাল

ডিসেম্বর ২০০৩
শাওয়াল ১৪২৪
পৌষ ১৪১০

প্রচ্ছদ, কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
সাইলেক্স
হোটেল ইন্টারন্যাশনাল (৪র্থ তলা)
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ৬২০৮২৯

শরীয়াহ ফ্যাকাল্টি স্টুডেন্ট'স জার্নাল ২০০৩

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

উপদেষ্টাবৃন্দ

প্রফেসর ড. এ.কে.এম আজহারুল ইসলাম
প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক
প্রফেসর ড. আবদুল মুন্‌ইম আল-বিররী
প্রফেসর ড. ওমর আবদুল আজীজ কুরাইশী
প্রফেসর ড. নুরুল ইসলাম
প্রফেসর ড. আতর আলী
প্রফেসর ড. সাইয়েদ আতহার
আলহাজ্ব বদিউল আলীম
প্রফেসর ড. মিদহাত আতিয়্যাহ

সম্পাদনা পরিষদ

মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন হাফিজ
ড. আবু জামাল মুহাম্মদ কুতবুল ইসলাম নোমানী
মাহমুদুল হাসান
মুহাম্মদ হারুনুর রশীদ

সহযোগীবৃন্দ

মুহাম্মদ আইয়ুব আল আনসারী
মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান

মুহাম্মদ আবুল কালাম
আহমদ ছফা
ফারুক আমিন
মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম
আ.ফ.ম. নুরুজ্জামান
এ.এস.এম সিরাজুল ইসলাম
মুহাম্মদ সাঈদুর রহমান
আবু বকর সিদ্দীক

সূচী

Frist Man Adam was sprung from clay	৭	Prof. Dr. A.K.M. Azharul Islam
International Islamic University Chittagong (IIUC) its objectives, efforts and expectations	১১	Prof. Dr. Abu Bakr Rafique
ইন্টারনেটে ইসলাম ও মুসলমান	১৫	আবদুস সালাম আজাদী
ইসলাম, মুসলমান ও আমরা	৩৩	আ.ফ.ম. নুরুজ্জামান
কোরআনে হাকীমের আলোকে বিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণা ও চিন্তাধারা	৪১	মূল: অধ্যাপক হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ রূপান্তর : মাহমুদুল হাসান
মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা:) এর অবদান	৫৬	আইয়ুব আল আনসারী
ফিলিস্তিন ঃ ফিরে দেখা ইতিহাস	৬৭	মোহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দীক
যুগ পরিক্রমায় নারী	৭৬	মুহাম্মদ আশেকুল্লাহ্
আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় গলদ ঃ উত্তরণের উপায়	৮২	মুহাম্মদ নাজমুল হুদা (সোহেল)
মহানবীর (সা:) যুগান্তকারী সমাজ দর্শন	৮৮	মুহাম্মদ আবুল কালাম
তাফহীমুল কোরআন ঃ যুগোপযোগী এক তাফসীর গ্রন্থ, ইসলামী আন্দোলনের গাইড বুক	৯৪	মুহাম্মদ রফিকুল হক

সম্পাদকীয়

আক্ষরিক অর্থে শিক্ষিত, জ্ঞানী কিংবা চিন্তাশীলের মাঝে তেমন ফারাক না থাকলেও ব্যবহারিক ও বাস্তব ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে রয়েছে বিশাল ফারাক। শিক্ষিতরা অনেক সময় জ্ঞানী কিংবা চিন্তক হয়ে উঠতে পারে না। তারা জ্ঞানবৃত্তিক সৃজনশীলতার মহা সমুদ্রে সাঁতরাতেও পারে না। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তারা বেড়ে উঠে খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। ফলে সত্যের প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণেও হয় ব্যর্থ।

চিন্তার দৈন্যতা ও সংকটকালে আজ গভীরতর দৃষ্টি সম্পন্ন একদল জ্ঞানী ও শক্তিমান ভাবুকের বড়ই প্রয়োজন। যারা প্রমাণ করিয়ে দেবে- মানুষের অন্তসত্তায় জীবন বুঝার প্রেরণা প্রোথিত। যারা এ প্রেরণাকে নিয়ে যাবে উপলব্ধির স্তরে। প্রচলিত একদেশদর্শিতা এড়িয়ে সত্যের কঠিন ও নিরেট সৌন্দর্যকে তারা নিত্য আবিষ্কার করে চলবে। পূর্ববর্তী মুসলিম চিন্তাবিদগণ যা করেছিলেন তাদের পদাঙ্ক অনুকরণ করে অধঃপতিত ও পশ্চাদপদ উম্মাহকে জাগ্রত করে তুলবে, তাদের স্মরণ করিয়ে দিবে পূর্বসূরীদের পথ ও পাথেয়। যেন আবার তারা সৃজনশীলতা, সৃষ্টি ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।

শরীয়াহ অনুষদের 'ষ্টুডেন্ট'স জার্নাল এ উদ্দেশ্যে নিবেদিত এক ক্ষুদ্র প্রয়াস। প্রজ্ঞা ও গভীরতার প্রামাণ্যে উৎরাতে না পারলেও একটি ধারাবাহিক প্রয়াস হিসেবে বোদ্ধা মহলে তা সমাদৃত হবে বলে আশা করা যায়।

এভাবেই হয়ত একদিন আমাদের শৈল্পিক মানসে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠবে। জ্ঞান বৃত্তিক চর্চায় নতুন প্রাণ ফিরে আসবে আবার। সৃজনশীল বা বিশ্লেষণী চিন্তার মনস্তাত্ত্বিক দিককেও প্রাধান্য দিতে শিখব একদিন।

মহান আল্লাহ্ আমাদের কবুল করুন।

১৫/১২/২০০৩ ইং

First Man Adam was sprung from clay

Dr. A.K.M. Azharul Islam*

The Holy Quran is a Book of Guidance for the human being. Almighty Allah, the Creator of man, has revealed it to us. The first man was Adam (as) - he was the first of the human race, and the common parent of mankind; and Eve, the mother of all. The constituent and essential parts of man, created by Allah, which are two, body and soul; these appear at his first formation; the one was made out of the dust, the other was breathed into him; and so at his dissolution, the one returns to the dust from whence it was; and the other to Allah that gave it; and, indeed, death is no other than the dissolution, or disunion of these two parts. The body without the Spirit is dead; the one dies, the other does not.

According to the Quran, first-Man was created out of clay (dust+water) and the

The Quran presents a scientific fact in several verses (96:2; 22:5; 23:12-14) in an eye-opening manner. It refers to the creation of human being from A'laq (that which clings

then from a little lump of flesh shapely and shapeless, that We may make (it) clear for you. And We cause what We will to remain in the wombs for an appointed time, and afterward

The Quran further states the following in several other verses:

presence another determined term; yet ye doubt within yourselves! (6:2).

(Allah) said: "What prevented thee from prostrating when I commanded thee?" He said: "I am better than he: Thou didst create me from fire, and him from clay" (7:12; see also 17:61).

---

* Vice Chancellor, International Islamic University Chittagong.

"Man We did create from a quintessence (of clay)" (23:12)

"He Who has made everything which He has created most good: He began the creation of man with (nothing more than) clay" (32:7)

"Just ask their opinion: are they the more difficult to create, or the (other) begins We have created? Them have We created out of a sticky clay!" (37:11).

"Behold, thy Lord said to the angels: "I am about to create man from clay" (38:71).

"He created man from sounding clay like unto pottery" (55:14)

The successive stages in the development of a human being from an embryonic stage to the full-grown foetus have been mentioned in sura Hajj (22: 5) and sura Al-Muminun (23: 12-14). These facts were mentioned in the Quran in the 7th Century - it is at a time when Europe was in the darkness. The Science of Embryology was not even born then. Embryology is a recent development and it is, thus, amazing that discovery of the successive stages of human embryologic development as revealed by Allah to our Prophet Muhammad (sa) is a modern discovery. Thus the mention of such scientific phenomena several centuries before their discovery by modern science enhances our faith in Allah, the Creator of all creations.

Himself proclaimed this in the Holy Book we have no doubt about it. But there are people who are disturbed in view of the so-
the work of British born scientist Charles Darwin. The proponents of Darwinian Evolution reject that first man Adam was created by Allah. Instead they propagate that man descended from an ape-like ancestor million of years ago.

The Qur'an contains many verses about the creation of life and the universe. It does not support the ideas that *species* evolved from one another or that there is an evolutionary link between them. On the contrary, the Qur'an reveals that Allah created life. The first man was made out of the dust of the earth, that is, macerated with water. Hence man is said to be made out of the clay. When we recall that some of the scientific discoveries also invalidate evolution, we once again see how the Qur'an always runs parallel to science.

Science backed up religion this week in a study that suggests life may have indeed sprung from clay - just as Islam teaches. A recent scientific study suggests life sprang

had shown materials in clay were key to some of the initial processes in forming life. A clay mixture called *montmorillonite* helps form little bags of fat and liquid. It also helps cells use genetic material called RNA. That, in turn, is one of the key processes of life.

Three scientists - Jack Szostak, Martin Hanczyc and Shelly Fujikawa were building on earlier work that found clays could catalyze the chemical reactions needed to make RNA from building blocks called nucleotides. They found the clay sped along the process by which fatty acids formed little bag-like structures called vesicles. The clay also carried RNA into those vesicles. A cell is, in essence, a complex bag of liquid-type compounds.

The scientist Szostak said in a statement, "We have demonstrated that not only can clay and other mineral surfaces accelerate vesicle assembly, but assuming that the clay ends up inside at least some of the time, this provides a pathway by which RNA could get into vesicles".

The researchers published their work in the journal *Science*. "The formation, growth and division of the earliest cells may have occurred in response to similar interactions with mineral particles and inputs of material and energy."

Szostak further stressed - "We are not claiming that this is how life started. We are saying that we have demonstrated growth and division without any biochemical machinery. Ultimately, if we can demonstrate more natural ways this might have happened, it may begin to give us clues about how life could have actually gotten started on the primitive Earth."

The *Newsweek* (p-50, April 15, 1985) reports that NASA scientists suggested that clay acts as a catalyst in producing proteins and DNA. The clay lattice can store energy in the form of electrons and then can release it when subjected to stress caused perhaps from the wetting and drying cycles when the tides rise and recedes. The released energy is then available to drive chemical reactions.

The DNA-protein cycle resembles a modern automatic assembly line on a molecular scale, the whole process being a self-reproducing DNA. In human being this process has to occur in every cell for producing at least 2000 different proteins without a single mistake. One is astonished to think of the organization and mechanism by which protein synthesis takes place. However, the creation of a human being the most magnificent of all creations innate with complex biochemical activities, is far from the creation of an amoeba. The creation of the first human DNA with its unique

Other religious texts also refer to life being formed from the soil. The Bible's Book of Genesis refers to a text where God tells Adam, (King James translation), "In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return."

Evolution claims further that disordered molecules spontaneously came together to form highly complex molecules. This claim is completely at odds with the laws of physics. The second law of thermodynamics constitutes an insurmountable obstacle for the scenario of evolution, in terms of both science and logic. Unable to offer any scientific and consistent explanation to overcome this obstacle, evolutionists can only do so in their imagination. For instance, the well-known evolutionist Jeremy Rifkin notes his belief that evolution overwhelms this law of physics with a "magical power":

Evolution dissipates the overall available energy for life on this planet. Our concept of evolution is the exact opposite. We believe that evolution somehow

These words from a well-known evolutionist indicate clearly that evolution is a dogmatic belief rather than a scientific thesis. If half-ape half-human creatures really existed before Prophet Adam, Allah would have explained that in an understandable manner. The fact that the Qur'an is quite clear and very understandable as far as scientific indications are concerned shows that the claim of evolutionary creation is untrue. The creation of the first man from clay is not a myth as supposed by some people.

International Islamic University Chittagong (IIUC) its objectives, efforts and expectations

Prof. Dr. Abu Bakr Rafique*

International Islamic University Chittagong (IIUC) is one of 51 non-government Universities of Bangladesh but the only Islamic one and unique in respect of its objectives, characteristics, philosophy and expectation from its students.

The Shariah Faculty of this University is at par with any of the renowned universities of Islamic world, like Al-Azhar University of Egypt, Al-Imam University of Riadh, IIU of Islamabad and IIU of Malaysia. The Science Faculty of IIUC is one of the best Faculties of the Universities of Bangladesh, if not the best one. However, we are proceeding towards obtaining the best position within a few years Insha Allah. The Executive MBA of the Faculty of Business Administration has become the first priority to the admission seekers among civil administrators, business executives and army personnels. The IIUC observes its 2nd Convocation on 17 December 2003 at

preside over as the Chancellor. 471 Graduates will be receiving their certificates.

The objectives of IIUC:

IIUC has been established to revitalize the Islamic concept of learning which *ibadah*) and the spirit behind the pursuit of scientific enquiry as inspired by the teachings of the Holy Qur`an.

---

* Pro Vice-Chancellor, International Islamic University Chittagong

tradition of the pursuit of knowledge and truth, as reflected by those pioneering works of early Islamic scholars and thinkers of golden ages of Islamic History.

To revive the golden Islamic tradition of learning where knowledge was propagated *Ibadah*).

To widen the choices open to the *Muslim Ummah* in higher education through the establishment of an Islamic Institution of higher learning, which endeavours to excel in all disciplines of academic achievements.

The University aims at creating an atmosphere completely conducive to academic environment, keeping the students aloof from all political chaos and conflicts, which can help them employ all of their talent for acquiring academic excellence and high level of expertise to serve the *Ummah* with competence, and help the country in getting rid of intellectual bankruptcy.

IIUC has been established to produce a group of qualified and competent scholars for the advancement of knowledge, as well as of society, to fill the vacuum of leadership to lead the country to a new direction.

Its Philosophy:

The philosophy of the Islamic University Chittagong is based upon the spirit of the five initial verses of the Holy Qur`an, which inspire for securing knowledge and propagating it in the spirit of belief, leading towards the recognition of Allah (swt) as the absolute Creator, Master of mankind and recognition of Allah as the Lord of the Universe, who has created the human intellect and entrusted them with knowledge. And, as such, all disciplines of knowledge should lead towards subservience to this truth. It leads to believe that knowledge is a form of trust *(Amanah)* from Allah on earth. In this way the quest for knowledge is regarded as an act *ibadah*. So one should not employ his knowledge for any activity detrimental to the humanity destructive to the society and contradictory to the will of Allah (swt).

IIUC is Islamic in character by its adoption and implementation of the Islamic principles of Education in total knowledge. Consequently it is mandatory for Muslim students and staff of the University to observe the Islamic way of life and to be sincere in performing their religious duties as long as they remain as members of

Islamic codes of conduct while within the campus of the University.

The International Islamic University Chittagong is not an institution limited to the study of Islam and Islamic Theology. It also endeavors on the contrary to introduce integrated teaching and learning process alongwith the inculcation of both moral and spiritual values. The approach towards knowledge in Science, Humanities and other modern disciplines like Business Studies and Administrative Sciences is one of the integration of Islamic values recommended by the principles of Islamic education.

The University is making its utmost effort to produce scholars and professionals who seek to improve the quality of human living and achieve high morality in line with the Islamic faith and way of life.

To equip the students with these characteristics the International Islamic University Chittagong has designed its curricular, co-curricular and extra curricular activities is such a way that a student can have a vivid idea of the fundamentals of Islamic belief, the way of leading his life in accordance with the teachings of Islam and an awareness about the glorious chapter of Islamic history. He also learns to be acquainted with at least two major International languages like English and Arabic and thus he gets interested in how to quench his thrust of acquiring knowledge from global society.

A call to self-recognition:

I would like to call upon my dear students to get the correct recognition of their selves.

In fact the man is holding very high and dignified position in this universe in the eye of Allah. He has been created by Allah Himself with a great objective and as His vicegerent in this world, and everything in this world has been subdued for him, without sharing by any other creative of Allah. And, as such, the man is the best of all creatures (*Ashraful Makhluqat*). But as a matter of great concern the man has always failed to discover his position and recognize himself. Forgetting Allah the Almighty, he has created form him many gods and has shown his utmost servitude to many false gods, who appear before them in different forms and different names like power and position, the wealth and riches, race and region, the language and nationality, the false desire and self interest and many other false gods of this kind who debar a man from the servitude of Allah (SWT).

A real Muslim can only hold this high position of Allah's vicegerent in this earth. A real Muslim is one who stands against all these false gods boldly with courage ir anyadverse situation.

In fact the world is created for this Muslim alone and he is created for Allah (SWT) and to act as the vicegerent of Allah for whom each and everything in the world has been subdued. Iqbal says:

Equip yourself with the quality of a falcon:

My dear students! I would like to advise you to adorn the qualities of a falcon, which is the symbol of courage and self reliance, high ambission and being free from temptation. You can learn three lessons from the life of a falcon. These are:

That he does not make any abode for him, which is the cause of temptation. Whenever, he gets tired he takes some rest on the branch of a tree for a little while, then starts flying.

That he does not accept anything hunted by others or anything availed without efforts. He rejects anything that was not hunted by himself.

That his ambission is very high, his target is in the endless space. He continues to fly and fly to reach that target.

ইন্টারনেটে ইসলাম ও মুসলমান

আব্দুস সালাম আজাদী*

১. ভূমিকা:

তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের এই যুগে পৃথিবী এসে গেছে মানুষের খুব কাছে। বিভিন্ন যোগাযোগের মাধ্যমে পৃথিবীবাসী একে অপরের যেমন কাছাকাছি চলে এসেছে, তেমনই হাতের কাছে পেয়ে যাচ্ছে পারস্পরিক পরিচিতির বিশাল ক্ষেত্র। ইন্টারনেট এ সবেরই সেতু বন্ধন। এই ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে পারি। এর মাধ্যমে আমরা আবিস্কার করতে পারি নিজকে আলোকিত করার বিশাল ভূবন । ইন্টারনেট এখন বিভিন্ন ধর্ম ও আদর্শ প্রচারেরও হয়েছে এক গুরুত্বপূর্ন হাতিয়ার। মুসলমানরা বর্তমান শতাব্দীর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের বিপরীতে যে অপ্রতুল প্রস্তুতি নিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে,আগ্রাসী সভ্যতার কাছে মুসলমানরা আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহন করেছে, ইন্টারনেটের কাছেও তাদের সে একই অবস্থা । এই প্রবন্ধটিতে ইন্টারনেটে ইসলাম ও মুসলমানদের অবস্থান নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাব, যাতে করে তরুন প্রজন্ম তাদের ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারনের দিকনির্দেশনা পাবে।

১.১. ইন্টারনেট কি?

প্রথমেই জানা দরকার "ইন্টারনেট"কি? "ইন্টারনেট" শব্দটি এত আধুনিক শব্দ যে, ১৯৮৮ সালের কোন এক ডিকশনারীতে শব্দটির অস্তিত্ব পাইনি। তবে Inter শব্দের সাথে net এর সমন্বয়ে এ যৌগিক শব্দটির অর্থ নেটওয়ার্কসমূহের আন্তঃসম্পর্ক। তথা টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে পরস্পর সংযোগকৃত কম্পিউটারের গ্লোবাল নেট-ওয়ার্ককে ইন্টারনেট বলা হয়।

১৯৯৫ সনের ২৪ শে অক্টোবর FNC ইন্টারনেটের সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে ইন্টারনেটের সংজ্ঞা প্রদান করেন। সংজ্ঞাটি এমনঃ গ্লোবাল নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে internet protocol (IP) এর উপর ভিত্তি করে কোন একক ঠিকানার মাধ্যমে Globally সংযোগ কৃত হবে। তাছাড়া Transmission Control Protocol (TCP) এবং Internet Protocol (IP) ব্যবহার করে তথ্যের আদান প্রদান করা যাবে। এভাবে ব্যক্তিগত ভাবে কিংবা সামগ্রিকভাবে access করা যাবে এমন ব্যবস্থার নাম Internet. মোটকথা, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য কম্পিউটারের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বা যোগাযোগ ব্যবস্থা-ই হচ্ছে Internet. [১]

১.২. ইন্টারনেটের উদ্ভাবকঃ

আমেরিকান প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের একটি সংস্থা হলো Advanced Research Projects Agency (ARPA) সামরিক বাহিনীর ব্যবহারের জন্য নিত্য নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনই এর দায়িত্ব। এই সংস্থার বিজ্ঞানীরা নিজেদের ভেতর

---

* লেখক, লেকচারার, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

[১] মুহাম্মদ আজিজুর রহমান ও অন্যান্য, **ইন্টারনেট**, (ঢাকা:জ্ঞানকোষ প্রকাশণী,দ্বিতীয় প্রকাশ,২০০০),পৃষ্ঠা-২৪।

উৎপত্তি।[২]

১.৩. ইন্টারনেট বিশ্ব:

Global Village বা বৈশ্বিক গ্রাম তথা সারা বিশ্বকে যে আজ হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে তা এই ইন্টারনেট। ১৪০ টির বেশী দেশকে সংযোগের আওতায় এনে প্রায় ১০০ মিলিয়ন কানেকশনের মাধ্যমে বর্তমান এই ইন্টারনেটে বিশ্ব পরিচালিত। দিন যতই যাচ্ছে ততই এ হয়ে উঠছে দৈনন্দিন জীবনের অত্যাবশ্যক বিষয়। ধারনা করা হচ্ছে ২০১০ সাল নাগাদ সারা বিশ্বের সমগ্র মানুষ টেলিফোন সংযোগের মত পরস্পরের সাথে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংযোগ করবে।

১.৪. ইন্টারনেটের গন্ডি:

ইন্টারনেটের গন্ডি সংক্ষেপে চারটি বিশাল ক্ষেত্রে সীমিত করা চলে।[৩]

১. World Wide Web (www)
২. Electronic Mail (e mail)
৩. Internet Relay chat
৪. Flie Transfar Protocol (FTP)

১.৪.১. world wide web:

world wide web হলো ইন্টারনেটের একটি অংশ। web browsing করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রাখা web page পরিদর্শন করা যায় এর মাধ্যমে এবং বিভিন্ন তথ্য নিয়ে আসা যায়। এ ব্যাপারে রয়েছে এক বিশেষ ভাষা বা যোগাযোগ মাধ্যম যাকে বলে Hyper Text Transfer Protocol (http), internet এর সাথে যে সমস্ত কম্পিউটার এই যোগাযোগ মাধ্যমটি ব্যবহার করে, তারাই www গোষ্ঠি গড়ে তুলেছে।

কোন তথ্যাবলী Hyper Text Markup Language (HTML) ফাইলে লিখে ইন্টারনেটে ব্যবহারকারীদের দেখার জন্য সার্ভারে রাখা page কে web page বলে। একে Home page ও বলা হয়।[৪]

১.৪.২. Electronic mail:

Electronic mail দ্রুত চিঠি পাঠানোর এক অলৌকিক তুল্য যোগাযোগ মাধ্যম। এজন্য প্রয়োজন হয় E mail address এর যাতে দুটি অংশ থাকে। প্রথম অংশ User ID বা account name এবং পরের অংশ Domain name (ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদানকারীর পরিচিতি মূলক ID) এবং মাঝখানে থাকে একটি @ sign.[৫]

১.৪.৩. Internet Relay chat:

Internet Relay chat(IRC) বলতে বুঝায় এক প্রকার ইন্টারনেট আড্ডা। বন্ধুর সাথে আড্ডা, বন্ধু বানানোর জন্য আড্ডা কিংবা আনন্দ করার জন্য আড্ডাই এই ব্যবস্থার লক্ষ্য। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এক সাথে অনেক লোকের সাথে live chat করা যায়। একা তো যায়ই।[৬]

---

[২] পূর্বোক্ত,২৫
[৩] পূর্বোক্ত,২৫
[৪] পূর্বোক্ত,২১৪
[৫] পূর্বোক্ত,৭৮
[৬] পূর্বোক্ত,৩০৮

এর কাজ হচ্ছে এক যায়গা থেকে ফাইল অন্য যায়গায় Transfer করা, এর সাহায্যে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী নিজের কম্পিউটার থেকে ফাইল কোন সার্ভারে রেখে দিতে পারেন। আবার অন্য সার্ভারে রাখা কোন ফাইল নিজের কম্পিউটারে নামিয়ে নিতে পারেন। অন্য সার্ভারে ফাইল রাখা কে বলে upload করা, আর নিজের সার্ভারে নামিয়ে রাখাকে বলে download.[7]

১.৫. বর্তমান বিশ্বে ইন্টারনেট:

মোটামুটি ভাবে মিডিয়াকে এখন দেশ চালনায় চতুর্থ ফ্যাক্টর মনে করা হয়।[৮] তন্মধ্যে ইন্টারনেট হয়ে দাঁড়িয়েছে এক ভয়ংকর ফ্যাক্টর। নিম্নে কয়েকটি ক্ষেত্রে এর আলোচনায় দেখা যাবে বর্তমান জীবনে ইন্টারনেট ছাড়া জাতীয় উত্তরণ অনেকটা বাঁধাগ্রস্থ।

১.৫.১. রাজনৈতিক কর্মকান্ডে ইন্টারনেট:

যেহেতু মানুষের বসবাস বর্তমান যুগে কোন এক ভৌগলিক সীমারেখায় আবদ্ধ নেই। পৃথিবীর সর্বত্র আজ সবাই ছড়িয়ে পড়ছে। কাজেই স্ব, স্ব দেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক অবস্থা ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে মানুষ প্রত্যহ তার দেশের সাথেই তালমিলিয়ে চলছে। তাছাড়া দেশের অভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া অনেক গোপন বিষয় বাইরে এর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়ে সঠিক সংবাদ আমাদের গোচরে আসছে। এজন্য মালয়েশিয়ার সরকারকে এক সময় ইন্টারনেট ব্যবহারে খুবই শক্ত হতে হয়ে ছিল। তা না হলে আনোয়ার ইব্রাহীমের খবরগুলো খুব দ্রুত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছিল। ফলে মালয়েশিয়ায় ঘটে যাচ্ছিল এক মারাত্মক বিপর্যয়। যাহোক, রাজনৈতিক অংগনে আজ ইন্টারনেট প্রভাব ফেলছে তা অনস্বীকার্য। মতিউর রহমান রেন্টুর "আমার ফাঁসী চাই" বইটি তৎকালীন সরকার বাতিল করলেও ইন্টারনেটের মাধ্যমে তা হাজারো পাঠক পড়তে পেরেছিল। এবং রাজনৈতিক মঞ্চের অনেক কর্তা ব্যক্তিকেও সেদিন ভাবিয়ে তুলেছিল।

১.৫.২. সংস্কৃতি কর্মকান্ডে ইন্টারনেট:

সিনেমা হল, যাত্রার মঞ্চ এবং গানের আসরে আজকাল অনেকে যাননা। কারণ তারা ইন্টারনেট নিয়ে বসলে সর্বাধুনিক Movie, super hit সংগীত দেখতে পারেন, শুনতে পারেন। সারা দুনিয়ার সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হতে পারেন কয়েক মূহুর্তের মধ্যেই। ফলে প্রতিটি দেশে সংস্কৃতির বলয়ে এসেছে নবতর ধারা। এখানে বিশ্বায়নের ছোয়া এতো বেশী যে কোন এক নির্দিষ্ট সংস্কৃতিতে জনগনকে ধরে রাখা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সর্বত্রই আজ শোরগোল শোনা যাচ্ছে, গেল গেল নিজস্ব সংস্কৃতি গেল। ক্যাবল সংযোগ সহ এই ইন্টারনেট ভূবনের কত প্রভাব তা গত বাজেট এবং গেল সপ্তাহে ক্যাবল কোম্পানীগুলোর ধর্মঘটে বোঝা গেছে।

১.৫.৩. অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ইন্টারনেট:

এ সম্পর্কে আজ আর আলোচনার প্রয়োজন বোধ করে না কেউ। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ দাবী উঠেছে Economics এ E Comerce বিষয়টি সংযুক্ত করা হোক। Sky Shopping এর ধারনা এর মাধ্যমে এসেছে। Sex কে কেন্দ্র করে যে সব কোম্পানী ইন্টারনেট ব্যবহার করে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে তার কথা আজ কারো অজানা নয়। বিভিন্ন Advertisement, দালালী ব্যবসা, মডারেটর ইত্যাদির মাধমে ইন্টারনেট হয়ে উঠেছে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের একটি এ্যাসেনশিয়াল মাধ্যম। শেয়ার বাজারে অংশ গ্রহণ ও চলছে এর মাধ্যমে।

---

[৭] পূর্বোক্ত,৩২০

[৮] জামাল সুলতান, আল ই'লাম আল ইসলামী,আল বায়ান,বর্ষ:১৬, সংখ্যা:১৭০ জানুয়ারী,২০০২, পৃষ্ঠা-৬৯

চরিত্র ধ্বংশ করতে আজ ইন্টারনেট যেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তা অন্য কোন মিডিয়া দ্বারা হচ্ছে না। পর্নোগ্রাফি, live sexual show, বিভিন্ন অপাচার যেমন বহুগামিতা, সমকামিতা, পশুর সাথে যৌনাচার, ইত্যাদির live vedio প্রদর্শনের মাধ্যমে আজ যুব সমাজ ধ্বংষের মুখোমুখি। অবশ্য এর পাশাপাশি অনেক উপকারী বিষয়ের মাধ্যমে এ সমাজকে পরিশীলিত ও পবিত্রও করা যায়।

১.৫.৫. ধর্মীয় ক্ষেত্রে ইন্টারনেট:

বর্তমান বিশ্বে বড় বড় ধর্মের অনুসারীরা ইন্টারনেটকে তাদের ধর্ম প্রচারের মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে। নিম্নের ধর্মগুলোর web page এর সংখ্যা দেখলে এর একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যাবে।

১. খৃস্টান: তাদের web page ৩২২৬৭ টি
২. ইয়াহুদী: তাদের web page ২১১৪ টি
৩. হিন্দু: তাদের web page ৩৫৩৩৭ টি
৪. বৌদ্ধ: তাদের web page ১৪৩৮৫ টি
৫. শিখ: তাদের web page ১০৭৬ টি

২. ইন্টারনেটে ইসলাম ও তার অবস্থান:

যদিও ইন্টারনেটের ব্যাপক পর্যায় জুড়ে আছে ইসলাম বিরোধী কিংবা ইসলাম শিক্ষা বিরোধী তত্ব, তথ্য, কর্মকান্ড ও দর্শন দিয়ে। আর সত্যিকারার্থে ইসলামের শত্রুরা বেশ দক্ষতার সাথে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। তথাপিও কিছু আল্লাহর বান্দা আছেন যারা সময়, শ্রম ও অর্থ এর পেছনে ব্যয় করে ইসলামকে মানুষের নিকট পৌছানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

web page এর মধ্যে ইসলাম মোটামুটিভাবে স্থান পেলেও E mail, IRC ও FTP তে ইসলাম যথাযথ যায়গা পায়নি। ওয়েব পেজও যা পাওয়া যায়, সময়ের দাবীর কাছে তা খুবই অপ্রতুল। নিম্নের আলোচনায় সেগুলো স্পষ্ট করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

২.১. ইসলামের মূল উৎস:

ইসলামের নানা বিষয়ে Internet এ web page বিদ্যামান। অত্যন্ত ছোট খাট বিষয় থেকে শুরু করে বড় বড় বিষয় পর্যন্ত এতে এসেছে। yahoo search এ ইসলামের উপর ৬৬৫ টি web page এর সন্ধান পাওয়া গেছে। Google নামক আরেক সংস্থার search ফলাফলে ১২৬৫ টি web page দেখতে পাওয়া যায়। ইসলামের এসব বিষয়ের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হচ্ছে:

২.১.১. আল কুরআন

আল কুরআন ইসলামের মূল উৎস। ইন্টারনেট yahoo search এর মাধ্যমে আল কুর'আন বিষয়ক ৮৩ টি web page এর সন্ধান দিয়েছে। তন্মধ্যে উপকারী হলো:

http:// www.islam.org
http://www.info.uah.edu
http://www.ummah.org.uk

এই web page গুলো কুরআনের একাধিক অনুবাদ এমনটি একাধিক ভাষায়ও অনুবাদ ছড়িয়ে দিচ্ছে। তাছাড়া অডিও রেকর্ডের মাধ্যমে হারাম শরীফের ইমামগনের তিলাওয়াতও যুক্ত রেখেছে। কিছু web page কুরআনের মৌলিক শিক্ষা ও কতিপয় দিক নিয়ে আলোচনার জন্যই প্রস্তুত হয়েছে। যেমন:

www.quran-islam.org www.quranidowa.com

address হলো: http://www.laila.aresworld.net এতে Al-Quran wa Sunnah Islamic voice chat নামে একটি chat site আছে। যাতে চ্যাটের মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে জানা যাবে। কুরআন ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক অলৌকিকত্ব নিয়ে রয়েছে বেশ ক'টি website। তার মধ্যে http://www.itis truth .org একটি ব্যাপক ও পূর্নাঙ্গ website।

২.১.২. আল হাদীস:

হাদীসের উপর ও অনেক গুলো webpage দেখা যায়। yahoo search ২১টি web page এর সন্ধান দিয়েছে, google দিয়েছে ৫৯টি। এগুলোর মধ্যে পূর্নাঙ্গ ও উন্নত মানের web page পরিলক্ষিত হয়না। প্রায় web page ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে হাদীস প্রসংগ নিয়ে এসেছে। যেমন দেখুন:- http://www.al-islam.org এর Hadith al thaqlayn page টিতে বিভিন্ন হাদীস তো আছেই, তাছাড়া কিছু উসূলে হাদীস বা হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি নিয়েও আলোচনা রয়েছে। আরো দেখুন: http://tariq.hitshop.com এটি একটি ব্যতিক্রম ধর্মী webpage এখানে সাধারন শিক্ষিতদের খুব সহজে ইসলাম শেখানোর প্রয়াস আছে। Sipmly Islam: Hadith নামক page এ মহানবী(সা:) এর অনেক হাদীস উল্লেখিত হয়েছে। কয়েকটি web page আছে যেখান থেকে প্রতিদিন কয়েকটি করে সহীহ হাদীস member দের কাছে পাঠান হয়। এর মধ্যে অন্যতম :

www.dahuk.org , www.ahad.org

এরা বাছাই কৃত সহীহ হাদীস বিষয় ভিত্তিক বিভাগ করে নিয়মিত subscriber দের কাছে পাঠায়।

তবে কুরআনের মত হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ সম্বলিত কিংবা সমগ্র হাদীস একত্রিত করে কোন web page অদ্যাবধী খোলা যায়নি www.islam.org এর মধ্যে অবশ্য প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ সমূহের সিডি Alim install করা আছে, যার মাধ্যমে গ্রন্থায়িত সমস্ত হাদীস একস্থানে পাওয়া যেতে পারে। তবে হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ সমূহ সম্বলিত একক web page নেই। শুধু মাত্র ইমাম নওয়াওয়ীর ৪০ হাদীসের একটি web page পাওয়া যায়। যার ব্যাখ্যা ও নানান প্রশ্নোত্তর সুন্দর ভাবে দেয়া হয়েছে। দেখুন:

www.freewebz.com তবে হাদীসে কুদুসীর ৪০ টি নিয়ে একটি web page সেবা করছে, তা হলো www.studorg.nwu.edu হাদীসের উপর কাজ কম হওয়ার পেছনে কারণ হলো কুরআন, যেমন বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হওয়ায় সাধারণ শিক্ষিতরা তা web page এ লাগাতে পারছেন, হাদীস সেভাবে পরিচিত না হওয়ায় তারা তা পারছেন না।

বর্তমান যুগের অনেক আলিমকে দেখেছি, এসব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়াটাকে ঈমানের বৈশিষ্ট্য মনে করেন। আমি স্বীকার করতে বাধ্য, বর্তমান দুনিয়ার অনেক আলিম মাত্র ক'দিন আগ থেকে এদিকে রহমতের নযর ফিরিয়েছেন। আশায় আছি হাদীসে নবভীর খিদমাত তারা এখানেও করবেন।

২.১.২. ফিক্হ:

ফিক্হ এর উপর সুনির্দিষ্ট web page খুবই কম। আর একাডেমিক দৃষ্টিকোণে ফিকাহ এর উন্নত মানের web page সৃষ্টিতে কেউ এগিয়ে আসছে বলে মনে হয় না। এরও কারণ উলামায়ে কিরামের অনীহা কিংবা এক্ষেত্রে তাদের এগিয়ে আসার অভাব। তবে আশার সঞ্চার করে এ সংক্রান্ত ১০৮ টি web page দেখে, যেখানে ইসলাম ও তার আরকান, আহকাম, ঈমান ও তার বিভিন্ন অংগ, মুআমালাত এবং তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা আছে। এসবের বৈশিষ্ট্য হলোঃ-

২.১.২.২. এসব হুকুম আহকাম বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন মাযহাব কে লক্ষ্য রাখা হয়নি। বরং শুধুমাত্র কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক ফিকহী মাসআলা বলে দেয়া হয়েছে।

২.১.২.৩. যে সব বিষয়ে পাশ্চাত্যে মারাত্মক ভূল বুঝাবুঝি আছে তা নিয়েই এদের বেশী আলোচনা । যেমন ১১ সেপ্টেম্বর এর পর থেকে ইসলামী জিহাদের বিরুদ্ধে মারাত্মক বিষোদগার করা হচ্ছে। এজন্য অনেক web page তৈরী হয়েছে যেখানে ইসলামী জিহাদের প্রকৃত অর্থ ও ক্ষেত্র বর্ণনার পাশাপাশি ভূল ধারণা সমূহের অপনোদন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে শুধু মাত্র কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক আলোচনাই প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন দেখুন:

www.religioustolerance.org
www.islamdenouncesterrorism.com
www.submission.org

নারী সম্পর্কেও আছে পাশ্চাত্যে নানান ভুল বুঝাবুঝি। তাদের দৃষ্টিতে পর্দা প্রথা, বহু বিবাহ, বিবাহ পূর্ব প্রেম, বিবাহ প্রথা এমনকি সংসার জীবন সম্পর্কে ইসলামের নীতিমালা খুবই অমানবিক। প্রায় ৫০ টি web page এজন্য আছে যেখানে চেষ্টা করা হয়েছে ইসলামে নারীর অবস্থান বর্ণনা করা এবং যাবতীয় ভুল ধারণার সুস্পষ্ট জবাব দেয়া। যেমন দেখুন:

www.unn.ac.uk
www.iad.org
www.sistersinislam.net

২.১.২.৪. ফিকহ কে জীবনের অনুঙ্গে এনে তাকে ব্যবহারিক ইসলামে রূপায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। যেসব web page এ নিয়ে ব্যাপক কাজ করছে তন্মধ্যে হলো:

www.islam-guide.com এটা অমুসলিমদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। www.islam-qa.com ইসলাম সম্পর্কে যাবতীয় প্রশ্নের বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রামানিক উত্তর দেয়ার জন্যই এর সৃষ্টি। www.answering-islam.org এটি এক বর্ণাঢ্য, সুবিশাল ও আনন্দদায়ক web page.

২.২. ইসলামের বিশ্বাস ও ইবাদত

২.২.১. আকিদা বিশ্বাস:

ইসলামের আকিদা বিষয়ের উপর ১৫ টি web page স্বতন্ত্রভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। তন্মধ্যেঃ

www.pbs.org , www.iad.org , www.arches.uga.edu

উল্লেখ করার মত web page। এখানে সামগ্রিক আক্বীদা বিশ্বাসের আলোচনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২.২.২. ইবাদত:

ইসলামের আরকান গুলো নিয়েও রয়েছে স্বতন্ত্র web page , প্রায় ১২ টি web page এমন আছে যেখানে ইসলামের ৫ টি বুনিয়াদী আরকান, তাওহীদ, নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাতের কথা ব্যাপক ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শুধু তাই না, এগুলোতে রয়েছে ইসলামের এ বিষয়গুলোর পুংখানুপূংখ হুকুম আহকাম। যেমন:

www.islamzine.com
www.viewislam.com
www.pillarsislamschool.com

২.২.৩. হালাল হারাম বিধান:

বিষয়টিতে বড় সমস্যার শিকার। বড় বড় প্রায় সব web pageএ এ সম্পর্কে মোটামুটি আলোকপাত থাকলেও স্বতন্ত্র দু' একটি web page এর জন্য আছে। তা হলো:
www.halal.50megs.com কিম্বা www. eat-halal. com

২.২.৪. দোয়া:

যে সব দোয়া মুমিনদের নিত্যকার জপযোগ্য, কুরআন ও হাদীসের আলোকে সেগুলো চয়ন করে তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন web site এ। www.islam.tc হলো তন্মধ্যে একটি যেখানে দুআসমূহ আরবী Text ও তার English অনুবাদসহ যে কেউ পেতে পারে।

২.৩. ইসলামের সার্বিক দিক:

তবে ইসলামের সার্বিক দিক নিয়ে পূর্ণাঙ্গ web page এর সংখ্যা একেবারে কম যে, তা নয়। আমরা এখন মূল্যায়ন করছিনে। কিন্তু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা এক্ষেত্রে যেভাবে ও যে আঙ্গিকে এগিয়ে গেছে সেভাবে মুসলমানরা এখনো এগিয়ে আসেনি।

২.৩.১. ইসলামের সংক্ষিপ্ত গাইড লাইন:

সংক্ষেপে ইসলাম শেখার জন্য বহু web site লক্ষ্য করা যায়। তন্মধ্যে www.quickislam.tk www.knowislam.net ইত্যাদি বেশ সমৃদ্ধ web page।

২.৩.২. ইসলামের বিস্তারিত web page:

তবে ব্যাপক ভাবে ও ইসলামের সার্বিক দিক ও বিভাগ সম্বলিত web page অনেক রয়েছে। yahoo search ও google এর মাধ্যমে প্রাপ্ত site গুলো আমরা visit করার চেষ্টা করেছি। তন্মধ্যে visit করার যোগ্য web page:-

www.al-islam.org
www.islam-online.net
www.islam.org.au
www.themodernreligion.com
www.islamweb.net
www.islamfortoday.com
www.islam.com
www.islamic.org.uk
www.whyislam.org
www.ummah.org.uk ,www.ummah.com, www.ummah.net
www.oprah.com
www.islam.org
www.understanding-islam.org
www.islamicity.org
www.thewaytotruth.org
www.muslimsonline.com

সবচেয়ে বিশাল আয়তন ও ব্যাপক বিষয় সমৃদ্ধ গুলো হলো:

www.al-islam.org
www.islam.org

www.islamonline.org
www.ummah.net
এখানে একটা কথা না বললে নয় যে, ইসলামের প্রকৃত ধারক ও বাহকদের web page গুলো কিন্তু খুবই নগণ্য ও অপেক্ষাকৃত নিম্ন মানের। অধিকাংশ সুন্দর, সাজানো, বিশালাকায় ও পূর্ণাঙ্গ web page গুলো হয় শিয়া, নতুবা কাদিয়ানী বা বাতিল উপদল গুলোর। আমাদের জন্য এ এক অশনি সংকেত। দু' একটা home page বাদ দিলে আমাদের আর যা আছে তা নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল।

২.৪. ইসলামের উপদলঃ

web site এ ইসলামের উপদলগুলোর যে তালিকা পাওয়া যায় তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আহলুস সুন্নাহ ওয়া আল জামাআতের চেয়ে বাতিল চিন্তার ধারক বাহকদের দৌরাত্ম এক্ষেত্রে অনেক বেশী। একটা জিনিষ বিশেষভাবে লক্ষণীয় তাহলো ইসলামের উপদল তালিকায় Schools of thought এর প্রসংগ কম।
www.mideasti.org এর মত দু'একটি site বাদ দিলে এসম্পর্কে আলোচনা পাওয়াই যাবে না। এতে বুঝা যায় সঠিক পন্থী মুসলমানদের কাছে হানাফী, মালেকী বা শাফেয়ী কিংবা হাম্বলী আইডেন্টিটী এখন আর বড় নয়। বড় হলো সে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী। কিন্তু যে বিষয়টা এক্ষেত্রে চিন্তার উদ্রেক করে তাহলো যে সব উপদল ইসলামে চরম ঘৃণিত তাদের ইন্টারনেটে অত্যন্ত বলিষ্ঠ পদচারণা।

২.৪.১. শিয়াঃ

শিয়ামতবাদ ইসলামের মর্ম মূলে আঘাতকারী মতবাদ। yahoo search result এ তাদের web page পাওয়া গেছে ২৬২০ টি, Google এ সংখ্যা ৩৯১০ টিতে পৌছেছে। তাদের প্রায় প্রতিটি web page browse করা যায় এবং পরিপূর্ণতার অধিকারী।
www.al-islam.org নামক বিখ্যাত home page টি তাদেরই করা। তাদের site গুলো দেখলে নিম্নের বৈশিষ্ট্য সমূহ নযর কাড়েঃ

২.৪.১.১. অধিকাংশ শিয়া web page গুলো সত্যিকার মুসলমানদের ধোঁকা দেয়ার জন্য তাদের প্রসিদ্ধ 'তাকিয়া' নীতি অবলম্বন করে।[৯] ফলে যে কেউ তাদের web site দ্বারা প্রতারিত হতে পারে। যেমন দেখুন www.allahuakbar.net যে কেউ দেখলে মনে হবে ইসলামেরই একটি web site. কিন্তু শিয়া মতবাদ বিশেষ করে ইমাম খোমেনির চিন্তাধারা প্রচারের জন্য এর সৃষ্টি।

২.৪.১.২. নিজেদের কে তারা প্রকৃত মুসলিম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সুপ্রয়াস পেয়ে থাকে। www.al-islam.org এর মত প্রখ্যাত web site এ তারা একটি কর্ণারে -sunnah শিরোনামে তাদের জাতে উঠার চেষ্টা লক্ষ্যনীয়। আরেক মজার বিষয় হলো এখানে তারা একাধিক বড় বড় পন্ডিতের প্রবন্ধ একত্রিত করেছে যার একজন হলেন ড. মুহাম্মদ তিজানী আল সামাওয়ী। এসব প্রবন্ধে শিয়া মতবাদ ইসলামের একটি সঠিকমতবাদ বলে চালিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা লক্ষনীয়।

২.৪.১.৩. কিছু কিছু web page এ তারা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তাদের খোলস ছেড়েছে। তবে সেখানেও আছে মুনাফেকীর প্রমান। অর্থাৎ এই page গুলোতে তারা এমন দিক নিয়ে কোন আলোচনা করে না যা ইসলাম বিরোধী। বরং সেখানে আধুনিক বিশ্বের রাজনৈতিক ইস্যু হলো প্রধান আলোচ্য বিষয়। যেমন দেখুনঃ
www.letsstudy.co.uk
www.islamicweb.com
www.shia.org

---

[৯] শিয়াদের তাকিয়া নীতির অর্থ হলো যখন তারা কোন আহলুস সুন্নাহ এর সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজে থাকবে তখন তাদের মতোই জীবন যাপন করবে এবং তাদের আক্বীদা গোপন রাখবে। ইহসান ইলাহী যহীর,**শিয়া ওয়া আস্ সুন্নাহ,** (মদীনা:ইসলামিক ইউনিভার্সিটি,১৯৯২),পৃষ্ঠা-৩৭

২.৪.২. ইসমাঈলী মতবাদঃ

শিয়াদের রয়েছে আরো অনেক উপদল। তন্মধ্যে ইসমাঈলী শিয়া অন্যতম। এরা অনেক প্রাচীন উপদল। এদের আধুনিকতম দল হলো আগাখানী উপদল। বর্তমানে এদের প্রধান আধ্যাত্মিক পুরুষ প্রিন্স করিম আগাখান।[১০] এদের web page দেখার মত। মূলতঃ এদের অনেকগুলো site এর মধ্যে ismaili web নামে home page টি খুবই আধুনিক এবং updated.

২.৪.২. বোহরাঃ

এদের আরেকটি উপদল আছে যার বাংলাদেশেও আছে দারুন তৎপতা। এরা হলো বোহরা গোষ্ঠী। এদের ৮ টি web page এর মধ্যে হতে www.mumineen.org site টি খুবই উন্নত।

২.৪.৩. বাহাঈঃ

বাতেনী ফেরকাহদের মধ্যে বাহাঈ এক গুরুত্বপূর্ণ দল। এরা ইসলামের দল বললেও মূলতঃ ইসলাম বিরোধী। মির্যা হুসায়ন আলী আলবাহা এর নামানুসারে এ দলের নাম।[১১] এই বাহা ছিলেন নবুওয়াতের দাবিদার। অত্যন্ত মনোরম ৩৬ টি web site তাদের দখলে। এরা অত্যন্ত সুশিক্ষিত। তাদের

www.salamiran.org
www.irib.com

ইত্যাদি site visit করলে বুঝা যাবে তারা কতখানি এগিয়ে।

২.৪.৪. ইবাদীয়্যাহঃ

খারেজী নামে এক উপদল ছিল ইসলামের ইতিহাসে। যারা সাহাবাদের অনেককে কাফের মনে করত। এমনকি কোন মু'মিন কবিরা গুনাহ করে ফেললেই সে হয়ে যেত তাদের নিকট কাফির। এদের চিন্তা ধারা পুষ্ট হয়ে পরবর্তীতে আত্মপ্রকাশ করে ইবাদিয়্যাহ নামে আরেক বাতিল উপদল।[১২] এদের ৮ টি web site এর সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যেঃ

www.webpages.marshall.edu , www.rafed.net খুবই তথ্য বহুল।

২.৪.৫. বেরলভীঃ

আমাদের উপমহাদেশে তথাকথিত আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত নামে একটি গ্রুপের সন্ধান মেলে। যারা আলা হযরত (!) আহমদ রেজা খান বেরলভী কে ইমাম মনে করে। ছুফিপন্থী হলেও এরা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্কিত এমন কিছু ধারণা সমাজে ছড়িয়ে দিচ্ছে যার কারণে ফাটল ধরছে মুসলিম মিল্লাতে। yahoo search এর মাধ্যমে তাদের ২৪৩০ টি web page এর সন্ধান পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে যেগুলো উল্লেখ করার মত তাহলোঃ

www.islamiacademy.org
www.trueteaching.com
www.dawateislami.net
www.sbia.net

২.৪.৬. কাদিয়ানীঃ

---

[১০] **আল মাওসুআহ আল মুয়াসসারাহ,**(রিয়াদঃ ওয়ামী,২য় প্রকাশ,১৯৮৯),পৃষ্ঠা-৪৯

[১১] পূর্বোক্ত,৬৩

[১২] পূর্বোক্ত,১৫

... ৩০ টি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ সর্বপ্রথম তারাই করেছে। তারাই প্রথম আন্তর্জাতিক ক্যাবল চ্যানেলে ইসলামিক TV প্রতিষ্ঠা করেছে। আর আশ্চর্যজনক ভাবে হাজার হাজার web site তারা খুলেছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ গুলো হলোঃ

www.islamguiden.com
www.ahmadiyah.com
www.godulike.co.uk

এদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তাদের web page গুলো বহু ভাষার। ফলে প্রায় একই ধরনের web page তারা করে অনেক ভাষাতে দিতে পেরেছে। yahoo search এ তাদের ৫২৬ টি home page এর সন্ধান পাওয়া গেছে। google তে পাওয়া গেছে ১৩২০ টি home page

উল্লেখ্য, এটাই একমাত্র বিভ্রান্ত দল যাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারনা আছে। yahoo তে পাওয়া হিসেবে তাদের বিরোধিতা করে web page ডিজাইন করা হয়েছে ২০২ টি। এছাড়াও google ৫২০ টি web page আছে বলে জানিয়েছে। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ ও পূর্নাঙ্গ হলোঃ

www.islamweb.net
www.islamland.org.
www.iiie.net
www.khatmenubuwwat.org

২.৪.৭. সুফীবাদঃ

সুফীমতবাদ যদিও সামগ্রীকভাবে ইসলাম বিরোধী নয়। তথাপিও সুফীমতবাদে এমন কিছু দর্শন আছে যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। যেমনঃ

- সর্বেশ্বরবাদ
- ধর্মসমূহের ঐকমত্য
- অবতারবাদ

এসব দর্শনের জন্যে মুসলিম সমাজে অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো বর্তমান বিশ্বে যখন মুসলমানরা কুরআন ভিত্তিক এক জাতি তত্ত্বের ছায়া তলে আসার প্রানান্ত চেষ্টা করছে, সে সময় সুফী মতবাদীরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে ঈমান লুটের বিরাট কাফেলা তৈরীতে ব্যস্ত। যা হোক এজন্যই বোধকরি সুফী মতবাদের ধারকদের রয়েছে অসংখ্য web page. www.goldensufi.org site visit করলে দেখতে পাব তাদের একটি স্বতঃসিদ্ধ দর্শন। তাদের বক্তব্যঃ

wers of the religion of Islam. Some sufis are involved with other religion, or no formal religion . . .. as directed by the higher source of wisdom within the human heart.

এই site এ sufi releted resources গুলো বিস্তারিত উল্লেখ আছে। বিভিন্ন নামে তাদের ৪৫ টি সচল ও পূর্নাঙ্গ web page রয়েছে যার অনেকটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক। কিছু আছে বড় বড় প্রফেসর কর্তৃক পরিচালিত। নিম্নে কয়েকটি web page উল্লেখ করা হলোঃ

www.ias.org
www.sufismjournal.org
www.bmf.org
www.islaam.org
www.sufimovement.org

২.৪.৮. আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতঃ

site আছে সম্পূর্ণ আধুনিক মানের ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, যেখানে সঠিক ইসলাম পালনকারীদেরই পদচারণা। নিম্নের web page গুলো ভিজিট করার মত।

www.muttaqun.com
www.shell.spqr.net
www.muslimer.com
www.darulhadith.com
www.philtar.ucsm.ac.uk

ইসলামকে জানা ও বুঝার অসংখ্য web site আলহামদুলিল্লাহ এখন আমাদের দোরগড়ায়। Discuss Islam শিরোনামে প্রায় এক লক্ষ বার হাজার web site এর সন্ধান yahoo আমাদের দিল। দু'একটি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

www.rameez.net
www.islam.about.com
www.muslims.org
www.muslimunited.org
www.myforum.net

ইত্যাদি web page থেকে শিক্ষা নেয়ার মত। তবে এক্ষেত্রে দুঃখজনকভাবে বাস্তব যে, এই লক্ষাধিক web page এর অধিকাংশ হয়ত অপূর্ণাঙ্গ নতুবা browse করা যায় না অথবা মান খুবই নিম্ন।

২.৫. ইসলামী লাইব্রেরীঃ

বেশকিছু digital লাইব্রেরী এখন ইসলামী জ্ঞান বিতরনে এগিয়ে এসেছে। এর মাধ্যমে বিশাল ইসলামী বই ভান্ডারের সন্ধান পাওয়া যায়। যে সব বই আমাদের কেনার নাগালের বাইরে তা আজ আমাদের হাতের নাগালে। যে সব বই বিরাট লাইব্রেরীতে স্থান দেয়া যায় না, তা ছোট্ট একটা কম্পিউটারের মধ্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা পাচ্ছি। এর মধ্যে শিয়াদের দুটি লাইব্রেরীর web site প্রসিদ্ধ অর্জন করেছে তা হলোঃ

www.geocities.com এর Ahlul bayt 14 page ঈসমাইলীদের First Islamaili Electronic Library and Database এর web site হলো www.ismaili.net

তবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের কয়েকটি ইসলামিক লাইব্রেরী এক্ষেত্রে উল্লেখ যোগ্য। যাদের web page এর address হলোঃ

www.nlm.nih.gov
www.cbl.ie
www.iiim.org
www.islamicculturalcentre.co.uk
www.muhaddith.com
www.library.thinkquest.org

২.৬. ইসলামী গবেষণাঃ

ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে লেখা মাস্টার্স, এম.ফিল ও ডক্টরেটের ডেজার্টেশান সমূহের উপরে পাওয়া যাবে অনেক web page । তাছাড়া বিভিন্ন নামীদামী লেখকের বই এর বিশাল ভান্ডরের উপরেও আছে অনেক গুলো। yahoo search এর মাধমে প্রাপ্ত ১১৮০০ web page পাওয়া গেছে যার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ইসলামী গবেষনার পরিচয় আমরা লক্ষ্য করতে পারব। এসব web page খুজতে যেয়ে কয়েকটি বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে, তা হলো ঃ

২.৬.১. অধিকাংশ গবেষণা কর্মগুলো বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে করা। এ সংক্রান্ত তথ্য সে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে পাওয়া যায়। যেমন yale বিশ্ববিদ্যালয় uk ও আয়ারল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে কৃত গবেষণা সমূহ একত্রিত করেছে।

পাওয়া যাবে। দেখুন ঃ www.library.yale.edu আরো দেখুন ঃ
www.lib.unc.edu,www.pitts.emory.edu

২.৬.২. কিছু কিছু গবেষক মুসলিম ব্যক্তিত্বও এদিকে মুখ দিয়েছেন। তারা ইসলামের নানা বিষয়ের উপর কৃত গবেষনার মোটামুটি তালিকা তৈরী করে web page এর মাধ্যমে ইন্টারনেটে ছেড়েছেন। এক্ষেত্রে প্রফেসর ডঃ আবুল হাসান সাদেক, V.C. এশিয়ান্ ইউনিভার্সিটি, ধন্যবাদার্হ হবেন। তিনি www.asiabookhouse.com এর মাধ্যমে ৭০০০ প্রকাশিত ইসলাম বিষয়ক গবেষনার একটি কমপ্রিহেন্সিভ তালিকা তৈরী করেছেন।

২.৬.৩. কিছু বাতিল মতাদর্শের লোকেরাও এক্ষেত্রে এগিয়ে এসে মানুষকে চিন্তার জগতে সমস্যা সৃষ্টি করার চেষ্টাও করে যাচ্ছে। যেমন দেখুন: www.bahai-library.org এরা বাহাঈ সম্প্রদায়ের যারা কদিয়ানীদের মতই ইসলামের জন্য ক্ষতিকারক। ভাল ও মন্দ মিশিয়ে এই থিসিস ও ডেজারটেশান web page গুলো ইসলাম গবেষকদের নিশ্চয় সাহায্য করবে।

২.৭. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ঃ

পৃথিবীতে ইসলামিক ইউনিভার্সিটির সংখ্যা খুব বেশী না। ইন্টরন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটিও হয়েছে কয়েকটি। । এদের অনেকেরই আছে নিজস্ব web page কিন্তু একমাত্র International Islamic University Malaysia ছাড়া পূর্ণাঙ্গ একটি home page কারোরই নেই।

এরপরেও পৃথিবীর নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের web page এর তুলনায় মালয়েশিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের web page খুব সমৃদ্ধ বলা যাবে না। কারণ যেমন ধরুন Harverd বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বিভাগের web page হলো ১৭টিরও বেশী, অথচ মালেয়েশিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাটাগরিক্যালি web page সন্ধান করে আমরা একটি মাত্র পেয়েছি। আর তা হলো www.iiu.edu.my এটাও আল্লাহর রহমত বলতে হবে কারণ এ web page টি পূর্ণাঙ্গ বর্ণাঢ্য ও তথ্য বহুল। যদিও তার সর্বশেষ Update করা ১৯৯৯ সনে।

www.studyislam.com web page এর মাধ্যমে মহা সমারোহে একটি Internet Islamic University খোলার ঘোষনা দিয়ে তুলকালাম কান্ড ঘটিয়েছে বসিয়ে ছিলেন কতিপয় উদ্যোক্তা। তারা উচ্চ শিক্ষার সমস্ত প্রোগ্রাম খুলতে চাচ্ছিলেন। তিন বছর পর আজ যখন এ web page খুলি তখন দেখি school পর্যায়েও তারা পৌছাতে পারেনি আজো।

যা হোক এ ক্ষেত্রে আমরা আশার আলো দেখতে চাচ্ছি আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের আধুনিক বিজ্ঞান অনুষদের সমস্ত শিক্ষকগণের কাছ থেকে।

২.৮. ইসলামী সংস্কৃতিঃ

ইসলামিক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের প্রচারনার বেশ কয়েকটি web page পরিদৃষ্ট হয়। তন্মধ্যেঃ

www.nlm.nih.gov
www.islamcpo.com
www.islamicart.com
www.dahuk.org
www.nabik.org

বিভিন্ন ধরনের জার্ণাল, ম্যাগাজিন, ডাইজেষ্ট এবং নানান ক্যালিগ্রাফী আরকিটেকচার প্রচার ও প্রকাশই এই web site গুলোর কাজ। dahuk এর মাধ্যমে সাইমুমের ইসলামী গান, আল্লামা সাঈদীর ক্যাসেট ও বিভিন্ন নাটক প্রচারিত হচ্ছে। এদের মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতির খুব নগণ্য কিছু প্রচার হচ্ছে। কিন্তু হলিউড, বলিউড, সনি, enternainment সংস্থার web site সমূহের কাছে এসব প্রচেষ্টা সাগরের মাঝে একটা বুদবুদের মত।

৩. ইসলামী সংগঠন ও সংস্থাঃ

মুসলমানদের বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের রয়েছে এক হাজারের মত web page। অন্যান্য সকল web page এর তুলনায় এগুলো অধিকতর সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ।

এদের মধ্যে আছে অনেক সরকারী সংস্থা, যারা হয় কোন সরকারের অধীনে অথবা মুসলমান দেশ সমূহের একতাবদ্ধ কোন সংস্থা। যেমন OIC এর রয়েছে বেশ কয়েকটি web site তন্মেধ্যে www.oic-oci.org একটি পূর্ণাঙ্গ web site.

www.oic-un.org ও তাদের আরেকটি Home page। www.fiqhacademy.org.sa রাবেতা আলম আল ইসলামীর একটি বিভাগ "ইসলামিক ফিক্হ এ্যাকাডেমী"র নিজস্ব web site. কাতারের Ministry of Endowments and Islamic Affairs এর একটি উন্নত মানের ইসলাম প্রচারকারী web site রয়েছে। যার address হচ্ছেঃ www.islam.gov.qa . সিঙ্গাপুরের ইসলামিক Religious council এর ইসলাম প্রচারের Home page হলো : www.muis.gov.sg

সরকারী অর্থপুষ্ট সংগঠন IKIM মালয়েশিয়াতে অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের কাজ করে থাকে। এদের web site হলো: www.ikim.gov.my

সৌদি আরব সরকারের অর্থপুষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থা World Assembly of Muslim Youth এর web site হলো: www.wamy.co.uk

৩.২. ইসলামী আন্দোলনঃ

বর্তমান বিশ্বের নামকরা ইসলামী আন্দোলন গুলোর নিজস্ব web site রয়েছে।

৩.২.১. ইখওয়ানঃ

মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমুন তথা Muslim Brotherhood এর নিজস্ব web site আছে কয়েকটি। তম্মোধ্যে তথ্যবহুল ও পূর্ণাঙ্গ হলো: www.jannah.org

৩.২.২. জামায়াতে ইসলামী পাকিস্থানঃ

জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের web site খুবই সমৃদ্ধ। তাদের web site হলো: www.jamaat.org এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিভাগ হলো যুগ জিজ্ঞাসার জবাব। যে কোন প্রশ্ন করা যেতে পারে। একদিন পরেই মাওলানা মাওদুদী (রা) এর লেখা কোন উত্তর কিংবা সরাসরি কাজী হুসাইন আহমদের উত্তর পাওয়া যাবে। তাদের web site প্রতি দিন update করা হয়।

৩.২.৩. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশঃ

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর একটা web page আছে শুনেছি বছর খানেক আগে। www.jamaat-e-islami.org তাদের address। আনন্দ নিয়ে মাস দুয়েক আগে খুলতে যেয়ে দেখলাম সম্পূর্ণ নগ্ন কয়েকটি পর্ণগ্রাফী। এনিয়ে যায়যায়দিন বেশ রসাল ফিচার লেখে। সম্ভবত জামাআত এ সাইট withdraw করেছে, আর তা কিনেছে কোন যৌন ব্যবসায়ী। এখন জানি না তারা এটাকে তাদের অধীনে নিয়ে আসছে কিনা।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর বহির্বিশ্বের তৎপরতা কম নয়। তাদের কিছু web site আছে যা খুবই প্রাণবন্ত। যেমন:

কানাডার : www.icna.org

আমেরিকার: www.dahuk.org

জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরেরও একটি website এর সন্ধান পাওয়া যায়,তা হলো :

http://www.shibir.org

৩.২.৪. হামাসঃ

ফিলিস্তিনের ইসলামী আন্দোলন হামাস, তাদের web site হলো: www.fas.org

৩.২.৫. হিযবে ইসলামীঃ

আফগানিস্তানের হিযবে ইসলামীর web site হচ্ছেঃ-

www.hezb-e-islami.org

ইন্দোনেশিয়ার লশকরে জিহাদের Home page হচ্ছে www.laskarjihad.or.id

৩.২.৭. PPP:

ইন্দোনেশিয়ার parti persatuan pembanguan (PPP) এর site হলো : www.ppp.or.id

৩.২.৮. সূফি আন্দোলন:

সারা বিশ্বের সুফিদের আছে ব্যাপক আন্দোলন। এদের একটি সংস্থার নাম International Sufi Movement এদের কারুকার্যময় একটি web site এর নাম www.sufimovement.org এতে sufism এর সার্বিক তথ্য ও ব্যক্তিত্বদের বিস্তারিত জীবনী, সূফীদের বিভিন্ন কার্যকলাপের দৈনন্দিন রিপোর্ট এখানে update করা হয়।

৩.২.৯.দারুল আরকাম:

সিংগাপুরের একটি সংস্থা দারুল আরকাম। যারা নতুন ইসলাম গ্রহন করে তাদের জন্য সার্বিক সহযোগিতার হাত প্রশস্ত করে দেয় এই সংস্থা। তাদের website হলো www.darul-arqam.org.sg

৩.২.১০. আহলে হাদীস:

অধুনা বিশ্বে লামাযহাবী বা কোন মাযহাবের জন্য অন্ধ গোড়ামী পরিহার করে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক জীবন চলার বহু আন্দোলন রয়েছে। তাদেরই একটি site হলো www.muhammadiyah.org.sg

৩.২.১১. আবিম:

মালয়েশিয়ার ইতিহাসে ইসলামী আন্দোলনের জন্য আনোয়ার ইব্রাহীম কিংবদন্তীতুল্য। তার প্রতিষ্ঠিত ABIM এর website উপভোগ্য। আপনি নিজেই visit করতে পারেন
www.abim.com website এ।

৩.২.১২. ফাতিহা ফাউন্ডেশন:

এক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য রকমের এক webpage এর আলোচনা করে আমার এ প্রসংগে আলোচনার ইতি টানতে চাই তাহলো আজ মুসলিম সমাজে নৈতিকতার নেমেছে প্রচন্ড ধস। আমাদের মুসলিমদের অনেক সন্তান আজ শেষ হয়ে যাচ্ছে। এরকম শেষ হয়ে যাওয়া একদল তরুন কিসের নেশায় জানি এক হয়ে আল ফাতেহা ফাউন্ডেশন নামে এক আন্তর্জাতিক অর্গনাইজেশন খুলেছে, যাদের সদস্য সংখ্যা ১০ হাজারের বেশী।যাদের web page visit করেছে আজ পর্যন্ত(২৫/০৭/২০০২) এক মিলিয়নের বেশী visitor। এরা lasbian,gay, bisexual এবং transgender মুসলিম। এদের মাধ্যমে মুসলিম যুবকরা হচ্ছে ধ্বংষের একশেষ। এদের web site হলো www.al-fatiha.org

আমরা ইসলামী সংস্থা সমূহের একহাজারের মত website এর সন্ধান পেয়েছি। যার ৬৫% প্রায় অকেজো, অসম্পূর্ণ, অথবা site বিক্রী হয়ে গেছে। অথচ আমাদেরই সমাজের মধ্যে আমাদের বিরূদ্ধে এসব website কিভাবে উন্নত হয় আজ তা ভাবার বিষয়। আরেকদল মুসলমান সন্তানেরা একত্রিত হয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে আন্তর্জাতিক একটি অর্গানাইজেশন।ISIS যার সংক্ষেপিত রূপ। International Society for Islamic Secularization যাদের নাম। তাদের উদ্দেশ্য লক্ষ্য হলো দ্বীন থেকে দুনিয়া, মসজিদ থেকে রাষ্ট্র সম্পূর্ন আলাদা করা । তাদের website হলো: www.secularislam.org

৩.৩. মুসলিম মহিলা:

মুসলিম মেয়েরাও আজ খুব পিছিয়ে নেই। তারা Muslim Womens' League(MWL) এর ব্যানারে আন্ত র্জাতিক একসংস্থা দাঁড় করাতে পেরেছে। তাদের website হলো

www.mwlusa.org

তাছাড়া www.karamah.org

www.connect.ab.ca

http://wluml.org

www.muslimmom.org

world web page সমূহে মুসলিম ব্যক্তিত্বদের প্রসংগ আজকের জেনারেশন তুলে ধরেছে।

৩.৪.১. মহানবী (সা:):

মহানবী(সা:) এর উপর নানা দিকের আলোচনা সমৃদ্ধ অনেক web page বিদ্যমান রয়েছে । Muhammad (sws), Prophet of Islam, Rasulallah,Nabi, ইত্যাদি নামের Search Result অত্যন্ত আশা প্রদ। yahoo এর মাধ্যমে পাওয়া গেছে প্রায় বিশহাজার website. তবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নিজস্ব website ও যখন মহানবী (সা:) এর প্রসঙ্গ এনেছে সেখানে তাঁকে ভীষন ভাবে কলংকিত করার প্রয়াস পাওয়া হয়েছে। প্রতিটি ইসলামিক web page এ মহানবী (সা:) এর আলাদা কর্ণার থাকলেও শুধুমাত্র তাঁকে কেন্দ্র করে তৈরী web site এর সংখ্যাও কম নয়। যেমন দেখুন:

www.prophet of islam.org
www.al-huda.com
www.erols.com ইত্যাদি

৩.৪.২. অন্যান্য নবী রাসুল (আ:):

মুসলমানরা অন্যান্য নবীদের জীবনকেও ইসলামের আলোকে তুলে ধরেছেন বিভিন্ন site এ যেমন:-

দাউদ (আ:) www.angelfire.com
আদম (আ:) www.islam101.com এই website টি ইসলামের সকল নবী (আ:) এর জীবনী তুলে ধরেছে।

৩.৪.৩. সাহাবা:

সাহাবায়ে কিরামের জীবনের উপর তৈরী করা webwsite যত বেশী আনা যাবে ততই ইসলাম প্রচার সহজ হবে। নবী গণের জীবনের সাথে সাথে তাদের ও পরিচিতি জানা গেলে মুসলিম উম্মাহর সুবিধা বেশী। "সাহাবী" শব্দের Yahoo Search দিয়েছে ২৯৪০ টি website এর সন্ধান।

এর মধ্যে চার সাহাবী হযরত আবুবকর, উমার, উসমান ও আলী (রা:) এর উপর The Haq Char Year Services এর নিজস্ব web page www.Kr-hcy.com এ তাদের জীবন ও কর্মের বিশদ আলোচনা রয়েছে। হযরত উমারের বর্নাঢ্য জীবনের নানান ইতিহাস নিয়ে তৈরী হয়েছে web page www.umr.edu যেখান থেকে তাকে ব্যাপক ভাবে জানার সুযোগ পাওয়া যাবে।

সাহাবা গণের উপর গুরুত্ব মুসলিমগণ মোটামুটি দিলেও ইসলামী ব্যাক্তিত্ব অনেকের কথা Internet এ আনা যেতে পারে। হয়ত আল্লাহর কোন বান্দা এগিয়ে আসছে বা আসবে। আমরা শুধু তাদেরই পানে তাকিয়ে আছি।

৩.৪.৪. ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক:

আধুনিক বিশ্ব ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক দের ও website এ দেখতে পারেন।

৩.৪.৪.১. হাসান আল বান্না:

মিশরের হাসান আল বান্না যিনি আধুনিক কালের মুসলিম মানসের প্রাণ পুরুষ হিসেবে স্বীকৃত, web site এ তার যথেষ্ঠ পরিচিতি নিয়ে আসা হয়েছে। তার জীবন ও কর্ম, তার সাধনা ধর্ম, তার তাজদীদের কাজ, তার গড়া মুসলিম ব্রাদার হুড সব, সব নিয়ে web page তৈরী হয়েছে। যেসব web site design করা হয়েছে তার সংখ্যা ১১৫০ টি। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধতম গুলো হলো:

www.jannah.org
www.witness-pioneer.org
www.arabies.com
www.isnet.org

টি web page yahoo র কাছে আছে।
www.islamvision.org
www.islamway.com
www.islamhispania.com
www.diacritica.com
www.ahlen.de
www.iet.org.it বেশতথ্য বহুল।

৩.৪.৪.৩. মাওলানা মওদুদী:
পাক ভারত উপমহাদেশের উজ্জল নক্ষত্র, ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত সাইয়েদ আবুল আ'লা আল মওদুদী (রা:) এর উপরে পাওয়া যায় ২০১১ টি Internet Web page । তন্মধ্যে www.alinaam.org site টি মাওলানা মাওদুদীর চিন্তাধারা তার লেখনী সমূহ ও তার কর্মকান্ডের ব্যপক তথ্যসমৃদ্ধ। তাছাড়া
http://members.tripod.com
http://www.danielpipes.org
http://muslim-canada.org
http://www.sunnah.org
http://www.islam-ophile.org
গুলিতেও মাওলানার জীবন ও কর্মের উপর সার্বিক আলোচনা রয়েছে।

৩.৪.৪.৪. আবুল হাসান নদভী:
মাওলানা আবুল হাসান নাদভী(র:) এর উপর ও রয়েছে প্রায় ৯২৫ টির মত web site: তবে
http://www.irshad.org
http://www.youngmuslims.com
ইত্যাদিতে তার জীবনী ও কর্ম, বিশেষ করে, তার লেখনীর সার সংক্ষেপ পাওয়া যাবে।

৩.৪.৪.৫. উসামা বিন লাদেন:
বর্তমান শতাব্দীর আলোড়ন সৃষ্টিকারী মুসলিম যোদ্ধা উসামা বিন লাদেনকে ঘিরে ডিজাইন করা হয়েছে অনেক home page । এক্ষেত্রে লক্ষনীয় যে, তার বিরূদ্ধেই লেখা হয়েছে বেশী ।
www.ict.org.il site টি তার বিরূদ্ধে অগ্নি উদগীরন করার জন্যই। তবে তাকে যারা ভালবাসে তারাও সৃষ্টি করেছে অনেক webpage । তন্মধ্যে www.fas.org তথ্যবহুল ।

৪. ইসলাম বিরোধী webpage:
web page সমূহে ইসলাম ও মুসলমানদের অবস্থান সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা এতক্ষনের আলোচনায় মোটামুটি স্পষ্ট। তবে ইসলামের পক্ষে যতগুলো web page আমরা অন্বেষন করে পেয়েছি তার বহুগুণ বেশী web page ইসলাম বিরোধিতার জন্য তৈরী হয়েছে। ইসলামের শিক্ষা , ইসলামের মূল দর্শন, তার প্রচারক, ইসলামী দেশ ইত্যাদির বিরূদ্ধে যে সব web page আছে তা আরো গবেষনা যোগ্য। শুধু মাত্র ইসলামের বিরূদ্ধে সমালোচনা কারী web site গুলোর সংখ্যা হলে ৬৬৯০০। আরেকটি মজার ব্যাপার হলো ইসলামের পক্ষের web site গুলোর ৬৫% প্রায় অকেজো, browse করা কষ্টকর, কিংবা খুব ধীর নতুবা নষ্ট। অথচ ইসলাম বিরোধী web page গুলো প্রায় সবই সচল, updated এবং খুবই সুন্দরভাবে সাজানো। এর মধ্য থেকে কয়েকটির site নিচে দেয়া হলো:
http://www.arabicnews.com
http://www.islamic.org.uk
http://www.rationalist.org.uk

http://www.hinduunity.org
http://www.metimes.com
এতক্ষন ধরে আলোচনা করা হলো world wide web এ ইসলাম ও মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে।

৫. Electronic Mail:

ইন্টারনেটের দ্বিতীয় পর্যায় হলো Electronic Mail.এক্ষেত্রে মুসলিম সমাজ খুব পিছিয়ে সন্দেহ নেই। কারন E-mail ব্যবহারের যারা host এ পর্যন্ত কোন মুসলিম নেতৃত্ব সেখানে যেতে পারেনি। অনেকগুলো host E-mail সুযোগ দেয় তন্মধ্যে Yahoo সবার শীর্ষে যা নিখাদ ইয়াহুদীদের মালিকানায়। আছে Hotmail কিংবা ছোট খাট আরো কয়েকটি। জানিনা মুসলিমরা এগিয়ে আসবে কিনা।

৬. IRC:

IRC বা ইন্টারনেট রিলে চ্যাট ইসলামী দাওয়ার ক্ষেত্রে এক আশ্চর্য মাধ্যম হতে পারে। চ্যাটের মাধ্যমে মানুষের খুব কাছে যাওয়া যায়, কারন চ্যাটের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই বন্ধুত্বের ভাব নিয়ে বসে আড্ডা দেয়। প্রতিটি প্রসিদ্ধ web page এ মুসলমানরা চ্যাটের কর্নার রাখলেও তা নামে মাত্র। যেমন ধরুন www.al-islam.com কিংবা www.dahuk.org কিংবা www.discuss-islam.org এই web page এ কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামের নানা বিষয় নিয়ে চ্যাট করার সুযোগ আছে। এছাড়া ভাষা ভিত্তিক, মুসলমানদের দেশ ভিত্তিক যে chat host পাওয়া যায় ইসলামকে নিয়ে তাদের না আছ কোন চিন্তা, না আছে কোন পদ্ধতি। Yahoo এর Chat Room যদি কেউ visit করে তবে সেখানে অনেক গুলো room এর মধ্য থেকে religion বলে একটা room আছে। সেখানে Islam,Christian,judism ইত্যাদি সব ধর্মেরই আলাদা আলাদা রুম আছে। আমি Islam room এ যতদিন ঢুকেছি কোন দিন ভাল কোন মুসলমান সন্তানের সন্ধান পাইনি যে ইসলাম প্রচার কল্পে এখানে এসেছে। বরং হিন্দু ধর্ম বাদ দিয়ে অন্যান্য ধর্মের চ্যাট রুমের অধিবাসীদের চেয়ে এরা আরও বেশী আদিরস প্রিয় কিংবা ইসলাম বিরোধী। অথচ Chat এর মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের সৌন্দর্য বোঝানো অত্যন্ত সহজ।

এখানে আর একটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করে আমার আলোচনা শেষ করছি। তা হলো Yahoo কিংবা hotmail এ chat করার সময় মাঝে মাঝে নানা web com এসে আপনাকে প্রলোভন দেখাবে। তার room visit করার জন্য আবেদন জানাবে। আপনি গেলেই দেখবেন নগ্ন মেয়ের ছবি । কিছু software যদি আপনার PC তে Install করা থাকে তবে আপনি দেখতে পাবেন Live sexual video show । এর মাধ্যমে আমাদের চরিত্র, ইসলামি ব্যক্তিত্ব, মনন ও নৈতিকতাবোধ সর্বোপরি ঈমান ধ্বংস করছে তার বিকল্প কিছু কি দেওয়া যায়না?

৭. উপসংহার:

ইন্টারনেটে ইসলাম ও মুসলমান দের যে আশা নিরাশার কথা এতক্ষন আলোচনা করা হলো তার মূল কথা হলো:
(১) আল্লাহর তা'লার বাণী:

(أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن)

ইসলামের অনেক খেদমত করতে পারি।

(২) ইসলামী প্রতিষ্ঠান গুলোই এখন বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে এই মাধ্যমকে ইসলামী স্তরে উন্নীত করতে। কিন্তু দু:খজনক ভাবে তারাই বেশী পশ্চাদপদ। আমাদের IIUC এর অন্তত: ১ ডজন ছাত্র আমার কাছে আসে এ অংগনে খেদমত করার জন্য, দু:খ শুধু আমাদের কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ শিক্ষক গণের ব্যস্ততার জন্য ইসলামের এ ময়দানে আমরা পা রাখলামনা।

অধুনা বিশ্বের ইন্টারনেট মেলায় মুসলিম তরুন তরুনীদের ভীড় দেখে আমার রীতিমত চমক লেগে গেছে। এই বিশাল গ্রাহক কিংবা User দের ৯০% এর বেশী চারিত্রিক রোগে ভুগছে। এদের বাঁচানোর জন্য কোন পথ কি খোলা নেই? যারা ওয়াজের মঞ্চে ওয়াজ করতে করতে নিজের সন্তানদেরও খোঁজ রাখার সুযোগ পাচ্ছেন না, তারা কি এই ময়দানের এক মঞ্চে বসে যুবকদের জন্য কিছু করতে পারবেন না? আল্লামা ইউসুফ কারযাভীর শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও দৈনিক দুই ঘন্টা সময় তিনি এখানে দিচ্ছেন।

(৪) এ ময়দান ইসলামে ভরপুর করতে যারা এগিয়ে এসেছে আমার জানা গন্ডিতে তাদের অত্যন্ত নগন্য অংশ আলেম। বাকী সাহসী সন্তানেরা ইসলাম প্রিয়, ওরা কোরআন ভালবাসে, মহানবীকে ওদের নেতা মনে করে, তারা পরকালে মুক্তি পাগল। এজন্য জীবনের মূল্যবান সময় তারা ব্যয় করে এ ময়দানে কাজ করে যাচ্ছে। এজন্যই বোধ করি এত web page আমরা পেলাম। ওরা কিন্তু আলেমদের দিকেই তাকিয়ে আছে। আমাদের কি সে সময় হবে?

আমি নিরাশ বাদী নই, আশা করছি ধর্মহীনতার সয়লাবে ভেসে যাওয়া ইন্টারনেটে মুসলিম ও ইসলামের উপস্থিতি নূহের কিশ্তীর মত কাজ করবে একদিন। তার জন্য প্রয়োজন নিরেট কমিটমেন্টের, দরকার একদল তারুন্যে ভরপুর দায়ী ইলাল্লাহ তথা আল্লাহর পথের পথিকের।

---

[১৩] সূরা আল নাহল:১২৫

প্রাক কথাঃ

ইসলাম বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পৃথিবীর সর্বযুগের এবং সর্বকালের মানবতার জন্য প্রদত্ত একমাত্র সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা। কিন্তু খোদ আমাদের মুসলিম সমাজে ইসলাম বিভ্রান্তি ও ধুম্রজালের আবর্তে। কেউ একে শুধুমাত্র মুহাম্মদ (সাঃ) এর আনীত জীবন বিধান মনে করেন। আবার কেউ একে নির্দিষ্ট কিছু আচার-অনুষ্ঠান ও উপদেশাবলীর সমষ্টি হিসেবে মানেন; জীবনের প্রতিটি অনুষঙ্গে ইসলামের বিধি-বিধান মানতে নারাজ। ইসলামের আসল পরিচয় তুলে ধরে চিন্তাক্ষেত্রে অমানিশার এ বিধ্বংসী ঘোর কাটাতেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

ইসলাম কি?

'ইসলাম' আরবী শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ- আত্মসমর্পন করা।[১] নত হওয়া, আনুগত্য স্বীকার করা, নিজের ইচ্ছায় নিজেকে কারো নিকট সোপর্দ করে দেয়া।[২]

কুরআনের পরিভাষা 'ইসলাম' এর সংজ্ঞায় বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তানায়ক আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মাওদুদী (রঃ) বলেন- "আল্লাহ তায়ালা নিজেই নিজের রাসুলের মাধ্যমে মানুষের জন্য যে চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি নাযিল করেছেন, সম্পূর্ণভাবে তা-ই গ্রহণ করা এবং নিজের চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা, অন্যকথায়, চিন্তা ও কর্মের বিশিষ্টতা পরিত্যাগ করে উহার আনুগত্য গ্রহণ করাই আল্লাহর মনোনীত ও মনঃপুত পন্থা। একথাই কুরআন 'আল-ইসলাম' শব্দ দ্বারা বুঝিয়েছে।"[৩]

আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রঃ) এর ভাষায়ঃ "আল্লাহর সামনে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সোপর্দ করা ও শর্তহীন ভাবে পেশ করার নাম ইসলাম।"[৪]

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাঃ

আল্লাহ মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে জীবন যাপনের পন্থা নির্দেশ করেছেন। যেমনঃ ইরশাদ হচ্ছে-

ربنا الذي أعطي كل شيء خلقه ثم هدى

অর্থাৎ, "আল্লাহ সকল কিছু অস্তিত্বে এনেছেন, অতঃপর পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।"[৫]

আর, ইসলামই হচ্ছে মানবতার জন্য আল্লাহর পছন্দ করা সেই জীবন প্রণালী বা Giude Line । কুরআনে এসেছে-

ورضيت لكم الإسلام دينا

অর্থাৎ -"আর ইসলামকেই তোমাদের দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা হিসেবে পছন্দ করলাম।"[৬]

সুতরাং, ইসলাম হচ্ছে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকেই মানবজাতির জন্য নাযিলকৃত জীবনব্যবস্থার নাম।

ইসলাম একমাত্র জীবন ব্যবস্থাঃ

অনেকে মনে করে থাকেন যে, ইসলামের পূর্বে আল্লাহ তায়ালা আরো বিভিন্ন জীবন ব্যবস্থা বা দ্বীন পাঠিয়েছেন, যথা- ইয়াহুদী-খৃষ্টান ধর্ম ইত্যাদি। এটা নিতান্তই ভুল। কেবল ইসলামই হচ্ছে এক আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত পৃথিবীর সর্ব-কালের একমাত্র 'দ্বীন' বা জীবন ব্যবস্থা। যেমন- কালামে হাকীমে এসেছেঃ

إن الدين عند الله الإسلام[৭]

লক্ষ্যনীয় যে, কুরআন এখানে (دين) 'দ্বীন' না বলে (الدين) আদ্-দ্বীন বলেছে। ইংরেজী ভাষায় "This is a way" (এই একটি পথ) এর পরিবর্তে "This is the way" (এই একমাত্র পথ) বলায় অর্থের দিক দিয়ে যতখানি পার্থক্য হয় (دين) 'দ্বীন' এবং (الدين) 'আদ্-দ্বীন' শব্দের মধ্যে ও অর্থের দিক দিয়ে ঠিক ততখানি পার্থক্য হয়ে থাকে।"[৮]

---

* লেখক : ৬ষ্ঠ সেমিস্টার, দাওয়াহ্ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

হচ্ছে সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে শুরু ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা। অতঃপর শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত এসে কালজয়ী জীবনাদর্শ ইসলামরূপ এ সৌধটি পূর্ণতা পেয়েছে মাত্র। এ দিকেই ইঙ্গিত করছে আল-কুরআনের বাণী-

اليوم أكملت لكم دينكم

অর্থাৎ- আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ করলাম।"[১০]

অতএব, মানব সৃষ্টির সূচনা থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ইহাই একমাত্র 'দ্বীন' বা জীবন ব্যবস্থা। অতঃপর দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন নবী ভিন্ন ভিন্ন শরীয়ত নিয়ে এসেছিলেন। দুনিয়ায় বহু শরীয়ত এসেছে, বহু বদলে গেছে। কিন্তু শরীয়তের এ পরিবর্তনের কারণে দ্বীন বা জীবনব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন হয়নি। দ্বীন চিরকাল এক ছিল, এক আছে এবং চিরকাল এক থাকবে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর দ্বীন যা ছিল হযরত নূহ (আঃ) এর দ্বীন ও তা-ই ছিল। হযরত মুসা (আঃ), হযরত শুয়াইব (আঃ), হযরত সালেহ (আঃ), হযরত হুদ (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) এবং শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দ্বীন ও ঠিক তা-ই। কিন্তু এই নবীগণের প্রত্যেকেরই শরীয়তে কিছু না কিছু পার্থক্য বর্তমান ছিল। সালাত এবং সিয়ামের নিয়ম একেক শরীয়তে একেক রকম ছিল। হারাম ও হালালের হুকুম, পাক-পবিত্রতার নিয়ম, বিয়ে ও তালাক্ব এবং সম্পত্তি বন্টনের আইন বিভিন্ন শরীয়তে বিভিন্ন রকম ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা সকলেই মুসলমান ছিলেন এবং তাদের সবার উম্মতগণ ও মুসলমান ছিলেন, আর আমরাও মুসলমান। কেননা, সকলের 'দ্বীন' এক। যেমনঃ

হযরত নূহ (আঃ) বলেছিলেন- وأمرت أن أكون من المسلمين

অর্থাৎ- "আর আমি মুসলমান হতে আদিষ্ট হয়েছি।"[১১]

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) এ বলে প্রার্থনা করেছিলেন- ربنا واجعلنا مسلمين لك.

অর্থাৎ- হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে মুসলমান করে নিন।"[১২]

হযরত ইয়াকুব (আঃ) স্বীয় সন্তানদের উপদেশার্থে বলেছিলেন-

إن الله اصطفي لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون

অর্থাৎ- আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্বীন (ইসলাম) কে মনোনীত করেছেন, অতএব, মুসলমান না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ করোনা।"[১৩]

সুলাইমান (আঃ) বিলকিসকে লেখা পত্রে এ বলে সম্বোধন করেন- وائتوني مسلمين অর্থাৎ ..... আমার কাছে এসো মুসলমান হয়ে।"[১৪]

ইউসুফ (আঃ) প্রার্থনা করেছিলেন এই বলে- توفني مسلماً অর্থাৎ- আল্লাহ হে! আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দিন।"[১৫]

অবশ্য একথা সত্য যে, হযরত মুসা (আঃ) এর অনুগামীগণ পরবর্তীকালে অসংখ্য মতবাদের সংমিশ্রনে "ইহুদী" নামে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম রচনা করে নিয়েছে এবং ঈসা (আঃ) এর অনুবর্তীগণ ও তদ্রুপ খৃষ্টধর্মের উৎপত্তি করে নিয়েছে। এরূপ ভারতবর্ষ, ইরান, চীন ও অন্যান্য দেশে প্রেরিত পয়গাম্বরের উম্মতগণ বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয়ে 'হিন্দু', 'বৌদ্ধ' ইত্যাদি নামে পৃথক পৃথক ধর্ম রচনা করে নিয়েছে, কিন্তু মুসা (আঃ) ঈসা (আঃ) এবং অন্যান্য জ্ঞাত-অজ্ঞাত সকল নবীই সম্মিলিত ভাবে ইসলাম এর দিকেই আহবান জানিয়েছেন; অন্য কোন কিছুর দিকে নয়। এদিকেই ইঙ্গিত করছে কুরআনের বাণী-

شرع لكم من الدين ما وصى به والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه

যারা নবীদের আনীত 'দ্বীন' ইসলামকে পরিবর্তন করে নিজেদের মনগড়া মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিল কুরআন তাদের মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

ইরশাদ হচ্ছে- ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه অর্থাৎ- যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা অনুসন্ধান করবে তা কখন ও গ্রহণ যোগ্য হবে না।"[১৭]

আল্লাহ বলেন-

وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

অর্থাৎ- তারা বলে, তোমরা ইহুদী অথবা খৃষ্টান হয়ে যাও, তবেই সুপথ পাবে। আপনি বলুন কখনই নয়; বরং আমরা ইব্রাহীমের ধর্মে আছি যাতে বক্রতা নেই। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না।"[১৮]

আল-কুরআনের দৃপ্ত ঘোষনা-

ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما

অর্থাৎ- ইব্রাহীম (আঃ) ইহুদী ছিলেন না, নাসারা ও ছিলেন না, বরং তিনি সত্যনিষ্ট মুসলমান ছিলেন।"[১৯]

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধানঃ

ইসলাম স্রেফ কিছু আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি নয়, মূলতঃ এটা হচ্ছে "A complete code of life" তথা একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। যারা ইসলামকে শুধুমাত্র কালেমা, সালাত, সিয়াম, হজ্ব আর যাকাতের সমষ্টিই বুঝে থাকেন তারা মুর্খতার অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে এ পাঁচটি হচ্ছে ইসলামের ভিত্তিমাত্র। এসবকে Building বা প্রাসাদের Foundation এবং Pillar এর সাথে তুলনা করা চলে। আর বিবেকবান মাত্রই একথা স্বীকার করবে যে, শুধুমাত্র Foundation আর কয়েকটি Pillar এর সমষ্টিকেই Building বা প্রাসাদ বলে না।

সুতরাং কালেমা হলো ইসলাম রূপ সৌধের Foundation, আর সালাত, সিয়াম, হজ্ব, যাকাত হলো তারই ৪টি Pillar বা খুঁটি; পূর্ণাঙ্গ ইসলাম নয়। একথারই প্রতিধ্বনি রাসুল (সাঃ) এর হাদীস-

بني الإسلام على خمس شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلواة وإيتاء الزكواة والحج وصوم رمضان ـ

অর্থাৎ- ইসলামরূপ সৌধটি ৫টি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে; শাহাদাত, সালাত প্রতিষ্ঠা, যাকাত দান, হজ্ব এবং রমযানের সিয়াম।"[২০]

বস্তুতঃ যে ধর্মের মিশন এত ব্যাপক ও সুবিস্তৃত, যার লক্ষ্য এত সুদূর প্রসারী তা কি কখনো সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধি কিংবা আচার আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যম হতে পারে? আর তাইতো মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ইসলাম কে 'দ্বীন' বলা হয়েছে। এ দ্বীনের গন্ডি কেবল আক্বীদা-বিশ্বাস ও ইবাদত-বন্দেগীর ভেতরই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা পারিবারিক সম্পর্ক-অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য, আইন, সমাজ-সভ্যতা, সংস্কৃতি; রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি সকল পরিমন্ডলকে বেষ্টন করে আছে। মানব জীবনের সবকিছুই এর মধ্যে শামিল। জীবনের কোন একটি দিক ও কোন একটি ব্যাপার ও তার বাইরে নয়। আর জীবনের প্রতিটি অনুসঙ্গে রাসুল মুহাম্মদ (সাঃ) ই হবেন Model বা নমুনা। যেমন আল্লাহ বলছেন-

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

অর্থাৎ- তোমাদের জন্য রাসুলের জীবনেই রয়েছে উত্তম আদর্শ।[২১]

সকল ক্ষেত্রে রাসুল (সাঃ) কেই আদর্শ হিসেবে অনুসরণ করা হবে। কেননা, আল্লাহ বলেছেন-

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني

যদি সালাত, সিয়াম, হজ্ব আর যাকাতের নাম ইসলাম হয়, তাহলে জীবনের বাকী অনুসঙ্গ কি ইসলামের বাইরে? বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সমাজনীতি, সমর নীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি কি তাহলে ইসলাম বহির্ভূত?? তবে কি ما فرطنا في الكتاب من شيء বা "এই কিতাবে আমি কোন কিছু বাদ দেইনি" আল্লাহর এ বাণী বৃথা? (নাউযুবিল্লাহ) فماذا بعد الحق إلا الضلال তবে সত্যের পরে গোমরাহী ছাড়া আর কি থাকতে পারে?"[২৩] ইসলামের পরিপূর্ণতার কথা বলতে গিয়ে কোন এক মনীষী বলেছিলেন- "ইসলামে নাই শব্দটি নাই, আর সব আছে।"

ইসলাম একটি সার্বজনীন জীবনাদর্শঃ

পৃথিবীতে সাধারণতঃ বর্ণ, গোত্র, ভাষা, কিংবা ভূখন্ডকে কেন্দ্র করে এক একটি জাতির অবয়ব নির্মিত হয়। পক্ষান্তরে ইসলামই একমাত্র ধর্ম-যা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ঘোষনা করেছে যে, ধর্মের ভিত্তি জাতীয়তা কিংবা গোত্র-বর্ণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং তা আন্তর্জাতিক মানবতাকেন্দ্রিক। বর্ণ, গোত্র, ভাষা ও ভূ-খন্ডের কৃত্রিম ভেদ রেখার উর্ধ্বে এটি একটি বিশ্বজনীন চেতনা। যে কোন মানুষ (لا إله إلا الله...) কালেমার উপর ঈমান আনলে সর্বপ্রকার অধিকার সহকারে মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে দাখিল হতে পারে। সেখানে গোষ্ঠী, ভাষা দেশ, বর্ণ কোন কিছুর বৈষম্য থাকবেনা। এখানকার শ্রেষ্ঠত্বের মাপ-কাঠি হচ্ছে "তাক্বওয়া"- إن أكرمكم عند الله أتقاكم অর্থাৎ- "তোমাদের মধ্যে সে শ্রেষ্ঠতর যে সর্বাধিক তাক্বওয়াবান।"[২৪]

সমগ্র মানবজাতিকে সকল প্রকার প্রকৃতিগত বৈষম্য সত্ত্বেও একই জীবন বিধানের অধীনে সংঘবদ্ধ করাই ইসলামের লক্ষ্য। এক আল্লাহর অকৃত্রিম দাসত্ব ও অখন্ড মানবিক সমতা হচ্ছে এই আদর্শের ভিত্তিভূমি। আর এজন্য এর জাতীয় নাম ও বিশ্বজয়ী উপাধি ইহুদী, নাসারা সহ অন্যান্য ধর্মের ন্যায় কোন বংশ কিংবা গোত্র, ধর্মীয় নেতা, মাযহাব প্রতিষ্ঠাতা ও দেশের পরিবর্তে এমন এক শব্দ থেকে উদ্ভূত ও উদ্ধৃত যা নির্ধারিত আক্বীদা-বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। কুরআন মাজীদ এবং সমস্ত ধর্মীয় গ্রন্থ, ইতিহাস ও সাহিত্যে ঐ আক্বীদা-বিশ্বাসীদেরকে "মুসলিমুন" ও "উম্মতে মুসলিমা"২ উপাধিতে স্মরণ করা হয়েছে এবং আজ অবধি পৃথিবীর প্রত্যেক অঞ্চলে তারা 'মুসলিম' নামে চিহ্নিত, যা একটি স্থায়ী ও চিরন্তন ফয়সালা, একটি সুনির্দিষ্ট রীতি-নীতি, জীবন পদ্ধতি। সঙ্গত কারণেই ইসলাম সকল সীমারেখার গন্ডি পেরিয়ে বিশ্বজনীন আদর্শের একক উদ্বোধক। তাইতো আল্লাহ স্বীয় পরিচয় দিয়েছেন 'রাব্বুল আলামীন' বলে। যেমন- ইরশাদ হচ্ছেঃ الحمد لله رب العالمين. অর্থাৎ- "সকল প্রশংসা কেবল বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই।"[২৫]

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও শুধু আরবের কিংবা কোন চিহ্নিত সীমানার নন; বরং স্থান- কালের সীমানা পেরিয়ে গোটা বিশ্ববাসীর রাসুল। আল্লাহ বলছেন- وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين অর্থাৎ- (হে রাসুল!) আমি আপনাকে গোটা বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।"[২৬]

আর প্রিয়নবী (সাঃ) এর উপর অবতীর্ণ আল-কোরআন ও শুধু মুসলমানদের নয়, নয় কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর; বরং গোটা জগতবাসীর হেদায়াত বা পথ-নির্দেশিকা,

ইরশাদ হচ্ছে- هدىً للناس অর্থাৎ- (এই কুরআন) তাবৎ বিশ্বের সকল মানবমন্ডলীর জন্য হেদায়াত বা পথ-নির্দেশিকা।"[২৭]

মুসলমান কে?

যে ব্যক্তি রাসুল (সাঃ) কে শুধু ধর্মীয় দিক থেকে নয়, মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতঃ আল্লাহর সম্মুখে আনুগত্যের মস্তক অবনত করবে, সে-ই হচ্ছে প্রকৃত মুসলমান।

বা আকাশ এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তার স্রষ্টা। তিনই প্রতিপালক, রিযিকদাতা, আইন দাতা, বিধান দাতা। কল্যাণ-অকল্যাণ একমাত্র তার পক্ষ থেকেই, এতে অন্য কারো হাত নেই। সকল কিছুর মালিক তিনিই। এমনকি আমার নিজের দেহের মালিক ও আমি নিজে নই। সবকিছুই আল্লাহর আমানত এবং এ আমানত থেকে ব্যয় করার যে স্বাধীনতা আমায় দেয়া হয়েছে, আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তা প্রয়োগ করাই হচ্ছে আমার কর্তব্য। এক দিন আল্লাহ আমার কাছ থেকে এ আমানত ফেরত নেবেন এবং সে দিন প্রত্যেকটি জিনিসের হিসাব দিতে হবে।"[২৮]

জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানঃ

একজন মুসলিম ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুবিধ শাখায় তার গবেষণা ও কর্মতৎপরতায় কাফেরের পিছনে পড়ে থাকবে না, তবে দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গি হবে স্বতন্ত্র। নির্ভুল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মুসলিম প্রত্যেক জ্ঞানের চর্চা করবে। তার সামনে থাকবে এক মহান লক্ষ্য এবং সে পৌঁছবে এক নির্ভুল সিদ্ধান্তে।[২৯]

ইতিহাস চর্চায় মুসলমানঃ

ইতিহাসে মানব জাতির অতীত দিনের পরীক্ষা থেকে সে গ্রহণ করবে শিক্ষা; খুঁজে বের করবে জাতিসমূহের উত্থান-পতনের সঠিক কারণ; অনুসন্ধান করবে তাদের তাহযীব-তামাদ্দুনের কল্যাণকর দিক। ইতিহাসে বিবৃত সৎ মানুষের অবস্থা আলোচনা করে সে উপকৃত হবে। যে সব কারণে অতীতের বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে, তা থেকে বেঁচে থাকবে।[৩০]

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানঃ

অর্থনীতির ক্ষেত্রে অর্থ উপার্জন ও ব্যয়ের এমন অভিনব পন্থা সে খুঁজে বের করবে যাতে সকল মানুষের কল্যাণ হতে পারে। কেবল একজনের কল্যাণ ও অসংখ্য মানুষের অকল্যাণ তার লক্ষ্য হবে না।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানঃ

রাজনীতির ক্ষেত্রে তার পুরোপুরী মনযোগ থাকবে এমন এক লক্ষ্য অর্জনের দিকে যাতে দুনিয়ার শান্তি, ন্যায়-বিচার, সততা ও মহত্বের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে; কোন ব্যক্তি বা দল আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজের বান্দায় পরিণত করতে না পারে। শাসন ক্ষমতা ও সম্পূর্ণ শক্তিকে আমানত মনে করবে এবং তা ব্যবহার করবে আল্লাহর বান্দাহদের কল্যাণে।

আইন ও বিচার ক্ষেত্রে মুসলমানঃ

আইনের ক্ষেত্রে সে বিবেচনা করবে যাতে ন্যায় ও সুবিচারের সাথে মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং কোন জুলুম না হতে পারে।[৩১]

চারিত্রিক ক্ষেত্রে মুসলমানঃ

সর্বোপরী মুসলিম চরিত্রে থাকবে-

(১) আল্লাহ ভীতি (২) সত্য নিষ্ঠা (৩) ন্যায়পরায় নতা (৪) আমানত দারী (৫) আল্লাহর পথে আহবান। (৬) সত্যবাদিতা (৭) ধৈর্য্যশীলতা (৮) প্রেম-ভালোবাসা (৯) উদারতা (১০) দয়াদ্রতা (১১) পরোপকারীতা (১২) বদান্যতা (১৩) ভ্রাতৃত্ববোধ (১৪) লজ্জাশীলতা (১৫) অপরের অধিকারের ব্যাপারে সচেনতনতা। (১৬) ভাল কাজ করার মানসিকতা (১৭) হিতোপদেশ (১৮) নম্রতা (১৯) শালীনতা (২০) ক্ষমাশীলতা (২১) উত্তম ব্যবহার ইত্যাদি উন্নত গুনাবলীর সমাহার।

মুসলমানদের সেকাল ও একালঃ

ইসলামের এ নান্দনিক আদর্শের বলে বলীয়ান হয়ে, আল-কুরআনের দ্বীপ্ত মশাল হাতে নিয়েই গোটা বিশ্ব নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আমাদের পুর্বসূরীরা। জ্ঞান-চর্চা, জীবন সাধনা, রাষ্ট্রশাসন সর্বত্রই মুসলমানদের হাতে ছিল 'আলাদীনের যাদুর চেরাগ'। ইউরোপীয় ইতিহাসের যে অধ্যায়টি গির্জা ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্বের ফলে 'অন্ধকার যুগ' বলে চিহ্নিত, সেই যুগে

দর্শনশাস্ত্রে আল-কিন্দি; জ্যোতির্বিজ্ঞানে ইয়াইয়া বিন-আল্-মানসুর, সিন্ধ বিন আলী; বীজগণিত শাস্ত্রে ইবনে কুরা, আল্-ফারাজি, ওমর খৈয়াম, জাবির ইবনে আদলার, আল-হুসাইন রুমী, আল-বিরুনী প্রমুখ মনীষী যুগান্তকারী অবদান রাখেন-যা ৭ম শতাব্দী থেকে ১১তম শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হয়। গোটা ইউরোপ তখন সভ্যতা-সংস্কৃতির জন্য অক্সফোর্ড ছেড়ে কর্ডোভার দিকে ছুটেছিল।[৩২]

তাছাড়া, কালেমার বিপ্লবী আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বময়। হিজরী প্রথম শতকে ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ঘটে পশ্চিমে আফ্রিকার আটলান্টিক অববাহিকা থেকে পূর্বে চীনের গ্রেটওয়াল পর্যন্ত, আফ্রিকার ভূমধ্য সাগরের বেলাভূমি থেকে সাহারা পর্যন্ত এবং ইতোমধ্যে তা আন্দুলুসিয়া হয়ে পীরিনিজ পর্বতমালা এমনকি পরিব্রাজকের বেশে ফ্রান্স পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সম্পূর্ণ "জাজিরাতুল আরব, ইরান, আফগানিস্তান, সিন্ধু, পাঞ্জাব হয়ে কয়েক শতকের মাঝে তা গোবী হয়ে ছড়িয়ে পড়ে মধ্য এশিয়ায়।[৩৩] কোন বর্ণ, গোত্র, ভাষা বা অঞ্চলের কারণে নয়, শুধুমাত্র ইসলামের যাদুস্পর্শেই এই অভাবনীয় বিপ্লব সংঘটিত হতে পেরেছিল। এমনকি প্রথম তিন দশকের সংক্ষিপ্ত পরিসরে তৎকালীন দূনিয়ার বড় বড় রাজা-বাদশাহ এবং রোম ও পারস্যের ন্যায় দু'টি পরাশক্তি তাদের পদতলে এসে লুটিয়ে পড়েছিল।[৩৪]

কিন্তু কি হবে? আমাদের শৌর্য-বীর্য আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সে কীর্তিগাঁথা আজ কালের অতল তলে হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে সেই সোনালী অতীতের সোনালী দিনগুলো। আমরা নিজেরাই নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি হারিয়ে ফেলেছি। অমুসলিম জাতিগুলোর করুণার পাত্রে পরিণত হয়ে গেছি। অবস্থা দাঁড়িয়েছে এমন-আমাদের ভাগ্য-উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির কথা উঠলেই আমরা পাশ্চাত্যের জ্ঞানার্জনের কথা ভাবি। আমরা আজ অশিক্ষার অমানিশায় হাবুডুবু খাচ্ছি; অথচ আমরাই ছিলাম জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতির উদ্ভাবক।

OIC এর সদস্যসংখ্যা অনুযায়ী মুসলিম বিশ্বের ৫৭ টি দেশের লোকসংখ্যা প্রায় ১২৫ কোটি-যা সমস্ত বিশ্বের লোকসংখ্যার (৬০০ কোটি) প্রায় এক পঞ্চমাংশ। বাজারমূল্যে এদের ডিজিটির (মোট জাতীয় আয়) পরিমাণ প্রায় ১ (এক) ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং মোট আন্তর্জাতিক মজুদের পরিমাণ ১৪৫ বিলিয়ন ডলার। এই মুসলিমদেশগুলো একযোগে বিশ্বের তেল মজুদের ৬৬%, প্রাকৃতিক রাবারের ৭০%, পাটের ৪০%, পাম তেলের ৫০%, কোপেকের ৮০% এবং সিনকোনার ৯০% উৎপন্ন করে থাকে। এছাড়াও রয়েছে বিপুল পরিমাণে টিন, কয়লা, আকরিক, লোহা, বক্সাইট এবং ফসফেট। তুলা, চামড়া ও কোকের মত শিল্পের কাঁচামালেও এরা সমৃদ্ধ। তাছাড়া, মুসলিম বিশ্বের সার রফতানীর পরিমাণ সারা বিশ্বের মোট পরিমাণের প্রায় ৬৫% এবং রেডিমেড গার্মেন্টিসের ৯%।"[৩৫] এই বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ থাকা সত্ত্বে ও মুসলিম বিশ্বের অবস্থা একক মানে বা পশ্চিমা বিশ্বের তুলনায় মোটেও ভাল নয়। এত পরিমাণ সম্পদ থাকার পরও আমরা আজ দারিদ্রের কষাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত।

আমরা আজ পৃথিবীর দিকে দিকে নির্যাতনের শিকার। আমরা আজ পদানত; গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ। অথচ অর্ধ-পৃথিবী শাসনের ইতিহাস তো কেবল আমাদেরই। আফগানিস্তান, কাশ্মির, ফিলিস্থিন, চেচনিয়া, উইগুর প্রভৃতি স্থানে স্বাধীনতা কামীরা আজ সন্ত্রাসী বাহানায় মার খাচ্ছে। কারণ ওরা মুসলমান। আর পুর্বতিমুরের গেরিলা যোদ্ধারা স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাদেরকে জাতিসংঘ বাহিনী এসে ইন্দোনেশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং স্বাধীনতা দেয়। কারণ ওরা খৃষ্টান। এভাবেই কেটে যাচ্ছে বছরের পর বছর। মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যা বেড়েই চলছে; OIC এর কলেবর স্ফীতই হচ্ছে; কিন্তু সারা দুনিয়া জুড়ে মুসলমানরা ডুবে যাচ্ছে রসাতলে।

আর এমনতো হবেই। কারণ মুসলিম জাতির আদর্শিক বৈশিষ্ট্য ও নৈতিক গুণাবলী বহুলাংশেই লোপ পেয়েছে। আমরা ইসলামের মূল চেতনা থেকে দূরে সরে গিয়েছি; অনেক দূরে। আমাদের পূর্বসূরীরা যে কালেমার বলে বলীয়ান হয়ে শ্রেষ্ঠত্বের সূউচ্চ মার্গে আরোহন করেছিলেন, কালেমার সেই স্পিরিট (Spirit), সেই সঞ্জীবনী শক্তি আর আমাদের নিকট নেই। ইসলামের সুমহান আদর্শের পরিবর্তে আমরা আজ বর্ণ, ভাষা, অঞ্চলের ভিত্তিতে খন্ড-বিখন্ড হয়ে পড়েছি। কালেমা ভিত্তিক ভ্রাতৃত্ববোধের বন্ধন থেকে খসে পড়েছি। যা আমাদের জাতিসত্ত্বাকে খান-খান করে দিয়েছে। আমরা নিজস্ব স্বকীয়তা হারিয়ে পাশ্চাত্যের মধ্যে একাকার হয়ে গেছি। পাশ্চাত্যের বাজার অর্থনীতি, ডিশ সংস্কৃতি আর কনজুমারিজমের স্রোতের টানে খড়-কুটোর মত ভাসছি। আমাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে নির্মল সৌন্দর্য্যবোধের পরিবর্তে উৎকট নগ্নতা ও

ادخلوا في السلم كافة

"তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হও।"[৩৬] আর আমরা ইসলামকে কেউবা ধর্মীয় সীমারেখায় মসজিদের চার-দেয়ালে; কেউবা খানকায় নির্দিষ্ট কতক আচার-অনুষ্ঠানে; আবার কেউ সংকীর্ণ জাতীয়তার বেড়াজালে আবদ্ধ করে রেখেছি; সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি অঙ্গন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে পরিণত করেছি ডানাবিহীন পাখিতে। ফলে, সমাজ-সংস্কৃতি হয়ে পড়েছে লাগামহীন, উশৃঙ্খল এবং প্রবৃত্তি ও স্বার্থপরতার হাতিয়ার। আর আমাদের উপর নেমে এসেছে করুণ পরিণতি, যে দিকে ইঙ্গিত করছে মহান আল্লাহর বাণী

أفتئمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذالك منكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلي أشد العذاب.

অর্থাৎ- তোমরা কি আল-কুরআনের কিছু অংশ মানো আর কিছু অংশ মানো না? তবে জেনে রাখো, যারা এভাবে করে তার পরিণতি হচ্ছে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা আর পরকালে থাকছে কঠিন শাস্তি।"[৩৭]

শেষকথাঃ

বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসা সংকট উত্তরণ আজ সময়ের দাবী। আর আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না নিজেরা তাদের ভাগ্য উন্নয়নে সচেষ্ট হয়।[৩৮] তাই আসুন, সকল তন্দ্রাচ্ছন্নতা কাটিয়ে এক্ষুণি জেগে উঠি; অন্ধকার মাড়িয়ে আবার ও ফিরে যাই সেই শাশ্বত মুক্তির ঠিকানা ইসলামের পতাকাতলে। একে গ্রহণ করি শুধু ধর্ম হিসেবে নয়, একটি পরিপূর্ণ আদর্শ হিসেবে। আল কুরআনের দীপ্ত মশাল আবার ও হাতে নিই। বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত হয়ে হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, আবু বকর আর উমরী চরিত্র নিয়ে নতুন এক পৃথিবী গড়ার প্রত্যয়ে নব উদ্যমে পথচলা শুরু করি সম্মুখপানে। বিশ্বময় মেলে ধরি পাক কালেমার সুমহান দাওয়াত। আর ফিরিয়ে আনি মোদের সেই সে সোনালী অতীত। বিগত দিনের সব পাপ-পঙ্কিলতা, কদর্যতা, ভুল-অশুদ্ধতা আর ব্যর্থতার উপর গড়ি সত্য-সুন্দর-শুদ্ধতার ইমারত। সকল অপসংস্কৃতি আর বেলেল্লাপনাকে পদদলিত করে রচনা করি অনিন্দ সুন্দর সুস্থ সংস্কৃতির বুনিয়াদ। তবেই গোলামীর জিন্দান থেকে পাব আজাদী। ফিরে পাব হারানো সম্মান, আর শান্তি নেমে আসবে মোদের জীবনে, যেমনটি এসেছিল মক্কা-মদীনার উষ্ণ মরুর বুকে।

তথ্যসূত্রঃ

১। ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, মার্চ ২০০১, পৃষ্ঠা-৭১।
২। সাইয়েদ আবুল আ'লা মাওদুদী (অনুবাদ) মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, একমাত্র ধর্ম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৫ তম সংস্করণ, আগষ্ট ২০০০, পৃষ্ঠা-০৯।
৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০।
৪। আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, (অনুবাদ) এ, এস, এম ওমর আলী; ইসলাম ঃ ধর্ম; সমাজ; সংস্কৃতি, জমিয়তে শাহ ওয়ালী উল্লাহ একাডেমী বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৯৯ পৃষ্ঠা ১৭।
৫। সুরা ত্বা-হাঃ ৫০।
৬। সুরা আল মায়েদাহ ঃ ৩।
৭। সুরা আলে-ইমরান ঃ ১৯।
এখানে (دين) শব্দটি জীবন ব্যবস্থা অর্থে এসেছে।
৮। সাইয়্যেদ আবুল আলা মাওদুদী, (অনুবাদ) মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, একমাত্র ধর্ম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৫তম সংস্করণ, আগষ্ট ২০০০, পৃষ্ঠা-০৭।
৯। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-০৭।
১০। সুরা আল-মায়েদাহ ঃ ৩।
১১। সুরা ইউনুস ঃ ৭২।
১২। সুরা বাক্বারাহ ঃ ১২৮।
১৩। সুরা বাক্বারাহ ঃ ১৩২।
১৪। সুরা নামাল ঃ ৩০-৩১।
১৫। সুরা ইউসুফ ঃ ১০১।
১৬। সুরা শুরা ঃ ১৩।
১৭। সুরা আলে-ইমরান ঃ ৮৫।

২১। সুরা আল-আহযাব ঃ ৬১।
২২। সুরা আলে-ইমরান ঃ ৩১।
২৩। সুরা ইউনুছ ঃ ৩২।
২৪। সুরা হুজরাত ঃ ১৩।
০ ইয়াহুদ "শব্দটিঃ (يهوذا) শব্দের দিকে নিসবত বা সম্বন্ধ করা হয়েছে। আর এ (يهوذا) হচ্ছে ইয়াকুব (সাঃ) এর একজন পুত্র।
০ "নাসারাঃ এ শব্দটি ফিলিস্থিনের (ناصرة) নাসেরাহ নামক গ্রামের দিকে সম্বন্ধকৃত। এবং এ থেকেই এ নামটি উদ্ভূত।
২৫। সুরা ফাতেহা ঃ ০১।
২৬। সুরা আম্বিয়া ঃ ১০৭।
২৭। সুরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৫।
২৮। সাইয়্যেদ আবুল আলা মাওদুদী (রঃ) (অনুবাদ) সৈয়দ আব্দুল মান্নান, ইসলাম পরিচিতি, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৮তম সংস্করণ, আগষ্ট ২০০১, পৃষ্ঠা - ১৫।
২৯। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১৫।
৩০। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১৬।
৩১। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১৬।
৩২। ডায়েরী ২০০২, বা,ই,ছা,শি, প্রকাশনী, ঢাকা; আ.জ.ম. ওবায়দুল্লাহ (প্রবন্ধ) বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান।
৩৩। প্রাগুক্ত।
৩৪। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম; শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি; খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা; ১ম সংস্করণ, জুন ২০০০, পৃষ্ঠা-৩।
৩৫। খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক) 'প্রেক্ষণ' সাহিত্য ত্রৈমাসিক, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি সংখ্যা; জুলাই-আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ২০০১; এম.এ.হামিদের প্রবন্ধ; পৃষ্ঠা - ৪৯।
৩৬। সুরা বাক্বারাহ ঃ ২০৮।
৩৭। সুরা বাক্বারাহ ঃ ৮৫।
৩৮। সুরা রা'দ ঃ ১১

READ THE NAME OF ALMIGHTY; WHO CREATED YOU.

RENAISSANCE SCHOOL & COLLEGE

রেনেসাঁ স্কুল এন্ড কলেজ

(আবাসিক ও অনাবাসিক)

প্লে-গ্রুপ হতে নবম শ্রেণী
পর্যায়ক্রমে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত

আমাদের বৈশিষ্ট্যঃ

- ❒ নিজস্ব ভবনে পরিচালিত সম্পূর্ণ ক্লাশ নির্ভর প্রতিষ্ঠান
- ❒ ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়
- ❒ সমৃদ্ধ কম্পিউটার ল্যাব ও বাধ্যতামূলক কম্পিউটার শিক্ষা
- ❒ ইংরেজী ভাষার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ
- ❒ নিয়মিত টিউটোরিয়াল পরীক্ষা গ্রহণ
- ❒ পাঠোন্নতি নিয়ে অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময়
- ❒ অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা তত্ত্বাবধান
- ❒ নিয়মিত মেডিকেল চেক-আপ
- ❒ আধুনিক সুবিধা সম্বলিত আবাসিক (হোষ্টেল) ব্যবস্থা
- ❒ নিজস্ব পরিবহণ ব্যবস্থা

৯২১, আরকান হাউজিং সোসাইটি, বাদুরতলা, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ৬৫৫৪০১
E-mail: renaissance@spctnet.com

কোরআনে হাকীমের আলোকে বিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণা ও চিন্তাধারা

অধ্যাপক হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ*
রূপান্তর: মাহমুদুল হাসান*

বর্তমান যুগে বিজ্ঞান অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধন করেছে। বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের অন্তহীন ধারা আজও চালু আছে। প্রত্যেক নতুন দিন নিয়ে আসছে নতুন কোন আবিষ্কারের সু-সংবাদ। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানুষ উপকৃত হয়েছে সীমাহীন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের মেধা যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে, তা সত্যিই গৌরবময়। বিজ্ঞানের কল্যানেই মানুষের জন্য সম্ভব হয়েছে পৃথিবী ছেড়ে মহাশূন্যের পথে ছুটে যাওয়া। ইতিপূর্বে মানুষ চাঁদের দেশে পৌঁছে গেছে । মহাশূন্যের অন্যান্য জ্যোতিষ্কে পৌঁছার প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে। মানুষের এ প্রত্যাশা কতটুকু পূরন হবে তা শুধু ভবিষ্যতই বলতে পারে। তবে ইতোমধ্যে যতটুকু অর্জন করেছে তাও অনন্য, বিস্ময়কর ,অসাধারণ।
মুসলমানরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে। আজকের বিজ্ঞানীরা যে সব মূলসূত্র ধরে এগিয়ে যাচ্ছেন , তা মুসলিম বিজ্ঞানীদেরই আবিষ্কৃত।

পবিত্র কোরআন মূলত কোন বিজ্ঞান গ্রন্থ নয়। এটি জীবনের পথ নির্দেশনা, মানবতার গাইড লাইন। তবে এ কথাও সত্য যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান, মেধা-মনন ও মানুষের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে কোরআন মজীদ যে ভূমিকা পালন করেছে অন্য কোন গ্রন্থ তা পারেনি। কোরআন মানুষকে একটি দর্শন পেশ করেছে। যার ফলেই বিজ্ঞানের চূড়ান্ত উন্নতি সাধিত হয়েছে। বিজ্ঞান সার্বজনীন হয়েছে। বিশেষ মহলের হাত থেকে মুক্ত হয়েছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের এ ব্যাপৃতির কারনেই আজ মানুষ সৃষ্টির রহস্যের অবগুণ্ঠন সরাচ্ছে। আর এ ধারা রয়েছে অব্যাহত। কোরআন বারবার চিন্তা ও গবেষণার আহ্বান জানিয়েছে। বক্ষমান নিবন্ধে কোরআনের আলোকে আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণাকে উপস্থাপন করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। এটা নিতান্ত নগণ্য প্রয়াস হলেও তা ভাবুক মহলের জন্য একটি নতুন পথ , নতুন দিগন্ত উম্মোচন করবে। দোয়া করছি, আল্লাহ বিজ্ঞানকে মানুষের জন্য কল্যাণকর করুন। আর বিজ্ঞানের নেতিবাচক প্রভাব থেকে মানব জাতিকে মুক্ত রাখুন। আমীন।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলছেন - "নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে । আর আল্লাহ তা'লা আকাশ থেকে যে পানি অবতরণ করেছেন , তদ্বারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সব রকম জীবজন্তু। আর আবহাওয়ার পরিবর্তনে এবং মেঘমালায় যা তারঁই হুকুমের অধীনে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে নিশ্চয়ই সে সকল বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে।[১]

আলাহ তায়ালা মানুষকে তার পরিপার্শ্বস্থ এবং সৃষ্টির মাঝে যা কিছু মানুষ দেখে বা অনুভব করে , সে সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার আহ্বান জানিয়েছেন । এ চিন্তা-গবেষণা ও অভিজ্ঞতার অন্য নামই সাইন্স বা বিজ্ঞান ।

---

* পাকিস্তানের বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক
* প্রভাষক, কোরআনিক সায়েন্সেস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

[১] সূরা বাকারা ঃ ১৬৪

শুভ সূচনা। আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা, গবেষণা-বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষা মানুষকে রাব্বুল আলামীনের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমানের পথ প্রদর্শন করে । এটাকেই প্রমান প্রসূত বিশ্বাস অথবা 'ইলমূল ইয়াকীন' বলা হয় ।

সৃষ্টির অপরূপ নিপুণতা ও বিবর্তন দেখে একজন বিশ্বাসী ভাবুক থমকে দাঁড়ায় । আর তার বুদ্ধি প্রসূত ঈমানের বহিপ্রকাশ করে এ শব্দগুচ্ছ দিয়ে "রাব্বানা মা খালাকতা হাজা বাতিলা । সুবহানাকা ফাকিনা আজাবান্নার।"[২]

"প্রভূ ! তুমি এ জগত অনর্থক সৃষ্টি করনি । তুমি পবিত্র । তুমি অগ্নির শাস্তি থেকে আমাদের পরিত্রাণ দাও ।"

এর বিপরীতে যে সব লোক প্রকৃতির দৃশ্যাবলী থেকে প্রভাবিত হয় না বা কোন বুদ্ধির প্রখরতা অর্জন করে না, তাদের সম্পর্কে মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন নিম্মের শব্দ দিয়ে গভীর বিস্ময় প্রকাশ করেছেন-"যে লোক সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিস্মিত হয়ে থমকে দাড়ায় না এবং তার মধ্যে কোন ভাবান্তর ঘটে না, সে আসলেই প্রাণহীন, মৃত।"[৩]

অথচ আইনস্টাইনের বহু পূর্বেই কোরআন এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছে –"তারা কি আকাশ ও পৃথিবীর রাজ্য নিয়ে এবং যা কিছু সৃষ্টি করেছেন আলাহ তা'আলা বস্তু সামগ্রী থেকে তা নিয়ে ভাবেনি । সম্ভবত মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়ে এসেছে। বস্তুতঃ এরপর তারা কিসের উপর ঈমান আনবে ?"[৪]

এ কারণে পবিত্র কোরআন প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীকে 'আল্লাহর নিদর্শন বলে অভিহিত করেছে [৫] এবং এসব নিয়ে চিন্ত াভাবনার জন্য সকল মু'মিন কে নির্দেশ দিয়েছে। ১৯৭৪ সনে এক খৃষ্টান পোপ ভ্যাটিকানে কয়েকজন সৌদি মুসলিম বিজ্ঞানীর সাথে আলোচনার পর একটি ইশতিহার জারি করে বলেছিলেন-" ইসলাম ধর্ম মানবিক উন্নতি (বিশেষতঃ) বিজ্ঞানের বাহক।"[৬]

বস্তুত ঃ ব্যক্তি জীবনে কোরআনে মজীদ থেকে শিক্ষা গ্রহনকারী একজন ব্যক্তি প্রাকৃতিক নিয়মনীতির যত গভীরে প্রবেশ করবে ,ততই তার ঈমান পরিপক্ক হবে।

বিজ্ঞান বা সাইন্সের সংজ্ঞা :

ল্যাটিন শব্দ **Scientia** থেকে সাইন্স শব্দটি গৃহীত। এর অর্থ হল বিজ্ঞান।[৭] বিশ্ব মন্ডলের প্রকৃতির কার্যাবলী কোন না কোন প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে হয়ে থাকে। তাই অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অর্জিত সৃষ্টি জগতের প্রাকৃতিক নিয়ম নীতির জ্ঞানকেই সাইন্স বা বিজ্ঞান বলা হয় ।

ধর্ম ও বিজ্ঞান :

মানুষ প্রথম বারের মত যখন বাস্তব জগতে পদচারনা শুরু করল, তখন সে নিজেকে বস্তু (অর্থাৎ উদ্ভিদ ,পদার্থ ও প্রাণী) দ্বারা বেষ্টিত পেল। মানুষ জগতের সব কিছু যাচাই করে দেখতে শুরু করল এবং সেগুলো থেকে উপকৃত হতে লাগল। কিন্তু মানুষ যখন কিছুটা এগিয়ে বিজ্ঞানের উপর ধর্মের নিয়ন্ত্রণ দেখতে পেল তখন তা তার পছন্দ হল না। কাজেই সে প্রত্যেক বস্তুকে ধর্মের নির্দেশনা অমান্য করে মন মত ব্যবহার শুরু করল। যার ফলে জলে-স্থলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তা হারিয়ে ফেলল। পরিশেষে এটিই তার আত্মার সংহারক হয়ে দাঁড়াল।
তাই রাণী ভিক্টোরিয়ার যুগের বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক জর্জ কেসিংকে স্পষ্ট লিখতে হল- আমি বিজ্ঞানকে ঘৃণা করি। কারন তা মানুষের নিষ্ঠুর চিরশত্রু হয়ে থাকবে এবং তার ঘাম ঝরা সব কর্মতৎপরতা কে বিশৃঙ্খলার রক্ত সাগরে ডুবিয়ে দিবে ।[৮]

---

[২] আলে ইমরান ঃ ১৭৯
[৩] কোরআন আওর সাইন্স পৃঃ ৩৯
[৪] সূরা আ'রাফ ঃ ১৮৫
[৫] ইসলাম আওর সাইন্স
[৬] সাইয়ারা ডাইজেষ্ট-পৃঃ ৩৩৩
[৭] ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকা

তিনি বলেছেন -"রাসায়নিক ল্যাবরটরিতে মানুষে মানুষে সৃষ্ট সৃষ্টিগত ও সাংস্কৃতিক বিভেদ ঘোচানোর মত কোন প্রতিষেধক পাওয়ার আশা নিতান্তই নিরর্থক । হ্যাঁ , এসব সমস্যার সমাধান ধর্মের কাছেই আছে । "[৯]

বিজ্ঞানের স্থান :

গ্রীসের পতনের পর প্রায় হাজার বছর বিজ্ঞান যখন লা-পাত্তা ও নিখোঁজ ছিল, মুসলমানরাই তাকে খুজেঁ বের করে নব জীবন দিয়েছে । তখন সৃষ্টি সম্পর্কে তথ্য বের করা পুরো জাতির জন্য গৌরবের উপাদান সাব্যস্ত হল । এ কারনেই সেই যুগের বিজ্ঞানীদের 'শায়খুর রায়িস ' বা গুরু প্রধান বলা হত। বিজ্ঞান চর্চা তাদের জীবিকার উপকরন বা পেশা ছিল না । এটা ছিল একান্ত আবেগ ও শখ। কিন্তু আজ মুসলিম সোসাইটিতে বিজ্ঞান চর্চায় পূর্বের সে উৎসাহ উদ্দীপনা অনুপস্থিত। অথচ বর্তমান যুগে মানবাত্মা বিজ্ঞানের ময়দানে অগ্রসর হতে দিশেহারার মত ছুটছে।

ঈমান ও সৎ কর্মপরায়ন হয়ে একজন বিজ্ঞানীকে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক আবেগ অনুভূতি নিয়ে বিজ্ঞানের সকল দিককেই মানুষের কল্যান ও সেবায় নিয়োজিত করার অদম্য প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া উচিৎ । তাই দার্শনিক হার্ভাট স্পেন্সার তার ধর্মীয় দৃষ্টিকোনকে সামনে রেখে বলেছেন -"বিজ্ঞান বিমূখতা ধর্মহীনতার শামিল। বিজ্ঞানের ভালবাসা একটি প্রচ্ছন্ন ইবাদত।[১০]

বিজ্ঞানের গুরুত্ব :

জ্ঞানের মত বিজ্ঞান ও মৌলিক মর্যাদার অধিকারী। বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত উপাদান মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রাকে সহজ করেছে। ইসলাম মানুষের অত্যাবশ্যকীয় বস্তু সামগ্রী যোগানের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণকে সমাজ, মহল ও ব্যক্তির উপর ফরজে কেফায়া সাব্যস্ত করেছে। সে প্রয়োজনের মধ্যে বিজ্ঞানও অন্তর্ভূক্ত । তা শিখা মানুষের জন্য আবশ্যক। কারণ, তার সাথে দেশ ও জাতী সম্পৃক্ত।

'ইসলাম বিজ্ঞান বিরোধী' এ ধরনের ধারণা পোষণ করা নিতান্তই বোকামী ও অজ্ঞতার পরিচায়ক । বরং বিজ্ঞান ইসলামের কাছে ঋণী। যদি এ বিশ্বে ইসলামের আবির্ভাব না ঘটত তাহলে বিজ্ঞানের উপর অন্ধকারের পর্দা আজও ঝুলে থাকত । মানুষ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও গবেষণার সাথে চির অপরিচিত থেকে যেত।

বিজ্ঞান মূলত আয়াতুল্লা বা আল্লাহর নিদর্শন। তিনি মিশরে ফিরাউনদের কাছে এর উৎপত্তি ঘটিয়েছেন, নাস্তিকদের কাছেই তার লালন পালন করিয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি স্রষ্টা ও স্রষ্টা-প্রেমের প্রতি তাদের কে দাওয়াত দিয়েছেন। দৈব মতবাদসমূহের সত্যতা স্বীকার করিয়েছেন। যারা কুফর ও অস্বীকারে অনঢ় , তাদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকে পূর্ণ দলীল তৈরী করে রেখেছেন। কেয়ামতের দিন তাদের বিজ্ঞানের আবিস্কার গুলোই তাদের ফাঁসানোর জন্য যথেষ্ট হবে।[১১]

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ইতিকথা :

৬০০ খৃষ্টাব্দকে বিজ্ঞানের প্রাচীন যুগ মনে করা হয়। সে যুগে প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা নয়, দর্শণে ও যুক্তিতে অভ্যস্ত ছিল । গ্রীক দার্শনিকরা বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বা তাত্ত্বিক বিষয় হিসেবে পেশ করেছিল। প্রায়োগিক বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ তখনই ঘটে , যখন আরব দিগন্তে ইসলামের সূর্য উঁকি দেয়।

পৃথিবীতে কোরআন মজীদই গ্রন্থ যা জ্যোতিবিদ্যার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মানুষ কে প্রকৃতির নিদর্শণাবলী পর্যবেক্ষন ও প্রত্যক্ষ করার আহ্বান জানিয়েছে। যদিও প্রাচীনকাল হতেই তারকারাজি মরুবিয়াবানে ,অথৈ সমুদ্রে মানুষকে দিক নির্দেশ করে আসছে। কিন্তু কোরআন মজীদ চন্দ্র-সূর্য ও তারকা নিয়ে ভাবনাকে ইবাদত সাব্যস্ত করে

---

[৮] কিয়া সাইন্স হামে বাচা সেকতী হ্যায় পৃঃ ১৩৬

[৯] প্রাগুক্ত- পৃঃ ১৯৩

[১০] Education

[১১] ইসলাম কা নেজামে তা'লীম- পৃষ্ঠাঃ ১০

জ্যোতিবিদ্যা ও গণিতে অধিক মনোযোগ দিয়েছিল।"

মুসলমান দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরাই এলজেব্রা (বীজগণিত) ও কেমিষ্ট্রীর (রসায়ন) এমন সূত্র ও ফর্মূলা আবিস্কার করেছে , যা ছাড়া আজকের বিজ্ঞানীরা এক পাও এগুতে পারবেনা।[১২] ড: লীব্যন বলেন, ইসলামের উদয়ের পরপরই ১৩২ হি: সনে বাগদাদে জ্যোতিবিদ্যার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা সাতশ বছর ধরে চালু ছিল ।[১৩]

মোসিউসিদিউরের মতে, সে স্কুল এর বিজ্ঞানীদের বৈশিষ্ট্য হল তারা দূরবীন ও এষ্ট্রোল্যাব (Astrolab) মানমন্দির ছাড়াই জ্যোতিবিদ্যা সম্পর্কে পূর্ণ ধারনা অর্জন করে ফেলেছিল।[১৪]

ইসলামী যুগে প্রথম 'জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র বা মানমন্দির ২১৪ হি: সনে দামেস্কে স্থাপিত হয়েছিল । ইউরোপেও প্রথম জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষন কেন্দ্র মুসলমানরাই স্থাপন করেছিল। ড: ডেরিফরের উক্তি মতে , মুসলমানরাই আকাশে দৃশ্যমান সব জ্যোতিষ্কের তালিকা প্রণয়ন করেছিল। বড় বড় জ্যোতিষ্কের নামও মুসলমানরাই রেখেছিল ।[১৫] প্রায় শতকরা নিরানব্বইটি তারকার আরবি নাম সামান্য পরিবর্তিত হয়ে আজও প্রচলিত আছে । সে সব তারকার অবস্থান সম্পর্কে মুসলিম বিশেষজ্ঞরা যা বলেছিলেন , এখনও তা মেনে নেয়া হচ্ছে । আজকের আধুনিক যুগের দূরবীন তাদের বক্তব্যের অকুণ্ঠ সমর্থণ যুগিয়ে যাচ্ছে। এ সব জ্ঞান-বিজ্ঞান আরবী ভাষা হতে অনূদিত হয়ে অন্যান্য পশ্চিমা ভাষায় স্থানান্তরিত হয়েছে।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হতে ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিজ্ঞানের ইসলামী যুগ। এ যুগে দর্শন, চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতিবিদ্যা ইত্যাদির ব্যাপক গবেষণার ফলে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হয়। মুসলিম বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কল্যাণেই পৃথিবী আধুনিক বিজ্ঞানের আলোয় আলোকপ্রাপ্ত হয়েছে। কাজেই মুসলমানরাই আধুনিক বিজ্ঞানের স্থপতি । ইউরোপীয়দের বিষয়টি অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। পরে যখন মুসলমানরা বিজ্ঞানের প্রতি অমনোযাগী হয়ে গেল, পশ্চিমারাই তাকে আপন করে এগিয়ে চলল। যার ফলে তারা শুধু চাঁদেই পৌঁছে যায়নি বরং তারও উর্ধ্বে দ্রুত ছুটে চলছে।[১৬]

কোরআন ও বিজ্ঞান :

পবিত্র কোরআনে প্রায় সাড়ে সাতশ আয়াত এমন আছে যা কোন না কোন ভাবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের প্রতি ইঙ্গিত করে । কিন্তু আমরা আজো আমাদের বিদ্যার দৈন্যতার ফলে তা অনুধাবন করতে অক্ষম রয়েছি। এ নিবন্ধে বিজ্ঞানের সমূহ গবেষণা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের ভবিষ্যত বাণীগুলো আলোচনা করার চেষ্টা করা হবে।

আপেক্ষিকবাদ :

মানুষ যখন চাঁদে পৌঁছে গেল , ধর্মের জগতে এক তোলপাড় সৃষ্টি হল। মনে হল 'নিষিদ্ধ বৃক্ষের মত এটাও কোন নিষিদ্ধ পাথর যা ছুয়ে মানব জাতি বিরাট ভুল করে বসেছে। অথচ কোরআন মানুষকে চাঁদে যেতে নিষেধ করেনি। বরং আল্লাহর ঘোষনা হল-"চন্দ্রের শপথ, যখন তা পূর্ণরূপ লাভ করে, নিশ্চয় তোমরা এক সিঁড়ি থেকে আরেক সিঁড়িতে আরোহণ করবে। "[১৭] এ আয়াত দ্বারা প্রাচীন দার্শনিকদের এ মতবাদও দৃঢ়তা পেল যে , গতির দ্রুততার কোন সীমা নেই। তাছাড়া মহানবীর (স:) মিরাজের ঘটনার আরেকটি যুক্তি সামনে ধরা পড়ল । গ্যাগারিন যদি চব্বিশ

---

[১২] খোদা কাঁহা হ্যায়?, পৃঃ ৭২

[১৩] কোরআনে কারীম আওর উলূমে ফালকিয়্যাত, পৃষ্ঠা: ৩

[১৪] তামাদ্দুনে আরব

[১৫] তারীখে আরব

[১৬] মা'রাকায়ে মাজহাব আওর সাইন্স

[১৭] সূরা ইনশিকাক: ১৮-১৯

পারে না?

সাধারণতঃ মুসলিম সমাজে প্রসিদ্ধ হল মে'রাজের সময় প্রত্যেক বস্তুই স্ব-স্ব স্থানে থেমে ছিল। কথাটির সত্যতা আলবার্ট আইনস্টাইনের নিম্নোক্ত উক্তি দ্বারা প্রমানিত হয়। তিনি বলেন -"আলোর গতির চেয়ে অন্য কোন কিছুর গতি অধিক হতে পারে না। যদি আলোর গতির চেয়ে অন্য কোন কিছুর গতি অধিক হয় তাহলে তার জন্য সময় থেমে যায়।"[১৯]

চাঁদে আরব ফাটল :

মার্কিন নভোচারী চাঁদে অবতরণ করে যখন চাঁদের মাঝে অস্বাভাবিক ধরণের ফাটল দেখলেন, তখন তিনি বিস্মিত হলেন। কারণ, প্রাচীন দার্শনিকদের মতে চাঁদে জোড় ও ফাটল সম্ভব নয় । কিন্তু যখন জানতে পারলেন মুসলমানদের নবীর (সঃ) দৈব ঘটনা হিসেবে চাঁদ দ্বি-খন্ডিত হয়েছিল, এ কারণে চাঁদে ফাটল পড়েছে , তখন তিনি আরো হতবিহ্বল হলেন। এবং তুললেন। পরে তা আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[২০] এ কারণে মার্কিন মহা শূন্য কেন্দ্র 'নাসা' এ ফাটলের নাম 'আরব ফাটল ' রেখেছে।[২১] পবিত্র কোরআন চন্দ্রের এ ফাটলের কথা বর্ণনা করে বলেছে-"কেয়ামত আসন্ন , চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। "[২২]

জ্যোতিষ্ক :

গ্রীক দার্শনিক বলত , আকাশে তারকারাজি আংটির সাথে তার পাথর বা রত্ন যেভাবে যুক্ত থাকে সেভাবে যুক্ত আছে। কিন্তু আধুনিক যুগে নভোচারীরা চাঁদের চতুষ্পার্শে চক্কর কেটে দেখে এবং চাঁদের উপর উঠে চতুর্দিকে স্ব-চক্ষে দেখে এ সম্পর্কে বলেছে যে , তারকারাজি আকাশের নীচে এভাবে বিচরণ করছে যেভাবে পৃথিবী শূন্যে বিচরণ করছে।[২৩] তাদের বক্তব্য গ্রীকদের মতবাদ খন্ডন করেছে আর কোরআনের নিম্নোক্ত বানী -" আমরা সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি "[২৪]- এর সত্যতা ফুটিয়ে তুলেছে। সেসব তারকা সাধারণ ভাবে বিচরন করছে না বরং তা বৈজ্ঞানিক নিয়মেই করছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলেছে-"সূর্য ,চন্দ্র ও তারকা তাঁর (আল্লাহর) নির্দেশের অধীন।"[২৫] অন্যত্র বলেছে -প্রত্যেকেই স্ব-স্ব কক্ষপথে সন্তরণ করছে। আজকের আধুনিক যুগেও অনেক মহাশূন্যযানের পথ পরিক্রমা তারকা দিয়ে নির্ধারিত হয়।[২৬] যার উল্লেখ রয়েছে কোরআনে । "তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্রপুঞ্জ সৃজন করেছেন -যাতে তোমরা স্থল ও জলপথের অন্ধকারে পথ প্রাপ্ত হও।"[২৭]

ধুমকেতু :

সৌরজগতে এমন জ্যোতিষ্কও প্রকাশিত হয় যা নীরবে এসে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। পরিভাষায় এগুলোকে ধুমকেতু বলা হয়। হ্যালির ধুমকেতু নামক একটি ধুমকেতু কয়েক বছর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি প্রায় ৭৬ বছর পর পর

---

[১৮] কোরআনে কারীম আওর ফলকিয়্যাত

[১৯] মুজিযা কিয়া হ্যায়? পৃঃ ৪৮

[২০] কোরআন আওর সায়েন্সী উলূম

[২১] পাকিস্তান টাইমস- ১৭ই আগস্ট ১৯৬৯

[২২] সুরা ক্বামার :২৯

[২৩] ইসলাম আওর সায়েন্স, পৃষ্ঠাঃ ১৫৩

[২৪] সূরা মুলকঃ ৭

[২৫] সূরা আরাফ

[২৬] কোরআন আওর সায়েন্স, পৃষ্ঠাঃ ৭

[২৭] সূরা আনআমঃ ৯৮

যেগুলো প্রকাশিত হয়, অত:পর কোন বাধা ছাড়া চলমান হয় ও অদৃশ্য হয়। "[২৯]

সৌর জগতের অব্যাহত বিস্তৃতি :

আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীদের ধারণা হল সৌরজগতের সম্প্রসারণ হচ্ছে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মতে , ত্রিশ কোটি বছর পর এ জগতের আয়তন দ্বি-গুন হয়ে যায়।[৩০] এ ধারণা কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও সমর্থিত হয়। "আমরা কুদরতের হাত দ্বারা নভোমন্ডল তৈরী করেছি এবং আমরা তা সম্প্রসারিত করি। "[৩১]

নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল :

নভোমন্ডল, ভূ-মন্ডল সম্পর্কে প্রাচীন দার্শনিকদের ধারণা হল, নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের উপাদান প্রথমে মিলেমিশে ছিল। পরে তা বিকট শব্দে ফেটে যায় এবং একটি অংশ গ্রহ হয়ে শূন্যে বিচরণ করতে শুরু করল। কোরআনে পাকও এ বক্তব্য এভাবে চিত্রায়ণ করেছে- "অস্বীকারকারী লোকেরা কি ভেবে দেখেনা যে, নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল যুক্ত ছিল অত:পর আমরা তা বিচ্ছিন্ন করেছি।"

ভূ-তত্ত্ববিদগনের গবেষনা মতে প্রথমে যখন ভূ-মন্ডল সূর্য হতে বিচ্ছিন্ন হল তখন তার তাপমাত্রা সূর্যের তাপমাত্রার মতই ছিল। পরে তা উপর থেকে ঠান্ডা হয়ে সংকুচিত হতে লাগল। আজও যদি কোন ভূমিকম্পের কারণে ভূ-লাভা বের হয়ে আসে তার তাপমাত্রা তা-ই হয় যা সূর্যের হয়।[৩২] কোরআন অবতরণের পূর্বে ভূ-সংকোচনের চিন্তাধারা শুধু মক্কায় নয় পুরো পৃথিবীর কোথায়ও ছিল না। কিন্তু কোরআন ঘোষনা করেছে যে, " তারা কি দেখছেনা আমরা ভূ-মন্ডলকে চতু:প্রান্ত হতে সংকুচিত করে আনছি।"[৩৩]

খনিজ সম্পদ :

কোরআন অবতরনের পূর্বে কারো ধারণাও ছিল না যে , মানুষের ব্যবহার্য সম্পদ মাটির উপর যে পরিমাণ আছে , সে পরিমাণ বরং তার চেয়েও অনেক বেশী মাটির অভ্যন্তরে রক্ষিত আছে। সে গোপন খনিজ সম্পদ সম্পর্কে সর্বপ্রথম কোরআনে কারীম সংবাদ জানিয়ে বলেছে -"তোমরা কি দেখনা , আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু আছে, সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামত সমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।" আমরা আজ মাটির অভ্যন্তর হতে বহু মূল্যবান খনিজ সম্পদ আবিস্কারের সংবাদ শুনছি। কয়লা, স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা-পান্না, তেল, গ্যাস, পেট্রোল ইত্যাদি নানা জাতের সম্পদ আহরণের ধারাবাহিক সংবাদ পাচ্ছি।

প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ :

পৃথিবীর প্রাচীন বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কে বিজ্ঞান নতুন ও আকর্ষণীয় তথ্য দিচ্ছে। তম্মধ্যে মিশরের ঐতিহাসিক পিরামিড উল্লেখযোগ্য। যার নির্মান কৌশল আজো এক ধাঁধাঁ , পৃথিবীর এক বিস্ময়। পিরামিডে ব্যবহৃত পাথর এতই প্রকান্ড , যা এক জায়গা হতে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা বেজায় কঠিন। একজন রুশ লেখকের ধারনা যে, চল্লিশ হাজার মানুষ ধরলেই সে পাথর বহু কষ্টে নড়াতে পারবে। এরপর লেখকের জিজ্ঞাস্য তাহলে এ ভূতুড়ে পাথর কে কেটেছে ? কখন, কিভাবে, কি উদ্দেশ্যে তা ব্যবহৃত হয়েছে? এ সম্পর্কে একজন রুশ পদার্থবিদ Master Agrest এ মতবাদ পেশ করেছেন যে, "এ বড় বড় পাথর গুলো সে সব লোক কেটেছে, যারা কখনো বৃহস্পতি গ্রহ থেকে ভূ-পৃষ্ঠে

---

[২৮] কোরআন আওর সাইন্স

[২৯] সূরা তাকভীর: ১৫

[৩০] সাইয়ারা ডাইজেষ্ট: ৩৩৪

[৩১] সূরা জারিয়াত: ৪৭

[৩২] সাইয়ারা ডাইজেষ্ট ১৪ তম সংখ্যা, পৃষ্ঠা: ৩৩৪

[৩৩] সূরা আম্বিয়া: ৩০

পারাহত ব্যক্তির সাথে সাদৃশ্যময়। কিন্তু কোরআন মজীদ এ বাধার সুন্দর সমাধান করে দিয়েছে।

"আমি তার জন্যে গলিত তামার এক ঝরনা প্রবাহিত করেছিলাম। কতক জিন তার সামনে কাজ করত তার পালনকর্তার আদেশে। তাদের যে কেউ আমার আদেশ অমান্য করবে , তাদের আমি পরকালে জ্বলন্ত -অগ্নির শাস্তি আস্বাদন করাব। তারা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ, ভাস্কর্য, হাউজসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত।"[৩৫]

বস্তুর উৎস :

পৃথিবীর সামনে বিজ্ঞান এ মূলতত্ত্ব সরবরাহ করেছে যে, "বস্তুর উৎস সূক্ষ একটি শক্তি। তা স্থূল নয় আর দৃষ্টিতেও ধরা পড়েনা। বরং তার ক্রিয়া ও প্রভাব দ্বারা তা পরিচিত হয়।" এর দ্বারা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে , এ সূক্ষ শক্তির স্রষ্টাও তার অকল্পনীয় সূক্ষতার কারণে আমাদের মত স্থূল নয় এবং দৃষ্টিগ্রাহ্যও নয়। এ প্রসঙ্গে কোরআন বলে -" চক্ষুগুলো তাকে দেখতে পায় না। তিনি সূক্ষ ও সচেতন। "[৩৬]

মার্কিন নভোচারী জন গ্যালেন লিখেন যে," বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও মাপকাঠি দিয়ে স্রষ্টাকে মাপা অসম্ভব। (উ) আধ্যাত্মিক ও ঈমানী শক্তি দ্বারা দেখা যায়না, শুকাও যায়না ,ছোঁয়াও যায় না। তা ইন্দ্রীয় ও অনুভূতি বহির্ভূত। অনুরূপ, আমাদের জাহাজের সামূদ্রিক কম্পাসকে যে শক্তি সচল রাখে , তাও আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের জন্য একটি খোলা চ্যালেঞ্জ। কারণ তা আমরা দেখতে, শুনতে, ছুঁতে ও শুকতে পারিনা। অথচ ফলাফল একথাই বলে যে , এখানে কোন অদৃশ্য শক্তি আছে।"[৩৭]

মোটকথা, বিজ্ঞান আল্লাহর গুণাবলীর বাস্তব দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছে। যা চৌদ্দশ বছর পূর্বেই কোরআন বলে এসেছে। বলা হয়েছে -তিনিই আল্লাহ নভোমন্ডলে ও ভূ-মন্ডলে। তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন। এবং তোমরা যা কর তাও অবগত।[৩৮] এ কারনেই প্রাণী ও কীট বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড লথারসল লিখেন, মুক্ত চিন্তায় বিজ্ঞান চর্চা করলে মানুষের জন্য আল্লাহতে বিশ্বাস ছাড়া গত্যন্তর নেই। বিশ্বের বিখ্যাত পদার্থবিদ লর্ড ক্যলভি এ সিদ্ধান্ত-এ পৌঁছেছেন যে, "আপনি যত সুচিন্তিত কর্মতৎপরতা চালাবেন ততই বিজ্ঞান আপনাকে আল্লাহতে বিশ্বাসে বাধ্য করবে। "[৩৯]

বিশিষ্ট রসায়নবিদ ওয়াইন বোল্ট বলেন - "এ বিশ্ব , মন্ডলের একটি লক্ষ্য ও দাবী আছে। তার সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রবল ছোঁয়া আছে। এর শৃঙ্খলা প্রকৃতির কাছে ঋণী হতে পারে না। জগতের এ বিরাট কারখানায় যে বিরাট যোগসূত্র ধরা পড়ে, তা এ সত্য কথারই দর্পণ যে, তার স্রষ্টা প্রজ্ঞাপূর্ণ এক সত্ত্বা। তিনি এ সৃজন কর্ম কোন প্রকৃতির স্রোতে ছেড়ে দেননি।" জগত নিয়ে বিজ্ঞানের গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা কোরআনের নিম্মের বক্তব্যগুলোরই সমর্থন যুগাচ্ছে। " আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা, আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক , সবই তারই অনুগত এবং তাঁরই দিকে ফিরে যাবে। "[৪০]

প্রেটাপ্লাজম ঃ

আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা ও প্রাণীবিদ্যার (Biology) প্রভূত উন্নতির ফলে এ তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যে, সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ একই উপকরণ থেকে গঠিত। অনুবীক্ষণযন্ত্রের দ্বারা প্রত্যক্ষণের ফলে জানা গেছে

---

[৩৪] On the Rack of Dicovery

[৩৫] সূরা সাবা': ১২-১৩

[৩৬] সূরা আনআম

[৩৭] টেরিভিটন, ১৭ ই অক্টোবর, ১৯৭৪ইং

[৩৮] সূরা যুমার: ৬২

[৩৯] খোদা মজুদ হ্যায়? পৃষ্ঠা: ৩৪৯

[৪০] সূরা আল ইমরান: ৮৩

গঠন একটি উপকরণে পরিপূর্ণ। যাকে Proto Plasm নামকরণ করা হয়েছে। রাসায়নিক বিশ্লেষণের পর বোঝা যাচ্ছে যে, এ উপকরণের প্রায় অংশই পানি।[৪১]

এ গবেষণার ফলে পবিত্র কোরআনের অবিস্মরণীয় মু'জিযা নিম্নোক্ত শব্দ মালা হতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে, কোরআনের উক্তি **"প্রত্যেক বস্তুকে আমরা পানি থেকে জীবন দিয়েছি"**।

ক্যারিসি মুরসন বলেন-মানবাত্মাই মানব পরিণতির কর্তা। আত্মা মানুষকে চরিত্র-নীতি দান করেছে। আত্মা তার সম্পর্ক আল্লাহর ইচ্ছার সাথে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এটাই ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য। এটাই মানুষের মনের সুপ্ত বাসনার রহস্য যে, সে উচ্চতর বস্তুর সাথে মিলিত হতে চায় এবং এটাই ধর্মের প্রতি উৎসাহদাতা। বরং আত্মাই ধর্ম।[৪২]

ইসলামের জীবন-দর্শনও এ কথা বলে যে, পার্থিব জীবন তার পরীক্ষাকাল। এর মাধ্যমেই তার কর্মকান্ডের হিসাব হবে এবং এ কর্মকান্ডই তার পরিণতি নির্ধারণ করবে। যেমন আল্লাহ বলেন- **"তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ?"**[৪৩]

সৃষ্টি জগতের ধ্বংস ও কিয়ামত সংঘটন ঃ

সৃষ্টি জগতের ধ্বংস সম্পর্কে বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদদের নানা মতবাদ রয়েছে। এখানে সবগুলো লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তবুও কয়েকটি মন্তব্য এখানে উল্লেখ করছি। একটি মতবাদ হল, ভূ-অভ্যন্তরের শক্তিগুলো বেরিয়ে আসার ফলে ভূ-পৃষ্ঠ ফেটে যাবে আর পুরো পৃথিবী অসংখ্য অগ্নি শিখায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু এর পূর্বেই সূর্য হঠাৎ প্রচন্ড তাপে ফেটে নিথর হয়ে যাবে। কারণ পরমাণূ সম্পর্কিত গবেষণা থেকে বুঝা যায় যে, সূর্যের উপাদান হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণুগুলো তার মাঝে প্রচন্ড তাপ ও তীব্র চাপের কারণে Helium Gas- এ পরিণত হয়। যতই হাইড্রোজেনের পরিমাণ হ্রাস পায় ততই সূর্যের শিখা দাউ দাউ করে উঠে। যখন হাইড্রোজনের পরিমাণ অর্ধেকে এসে যাবে তখন তার তেজ ও তাপ শতগুণ বেড়ে যাবে। ফলে প্রচন্ড উত্তাপের প্রভাবে পানির আধার সমূহ শুষ্ক হয়ে যাবে। পৃথিবীতে জীবনের চিহ্ন তিরোহিত হয়ে যাবে। আর এ মাটির গ্রহ জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে মহাশূণ্যে ছড়িয়ে যাবে। এমনও হতে পারে যে, সূর্য এ করুণ মুহূর্তে একবারেই ফেটে যাবে। সৌরপৃষ্ঠ হতে গ্যাসের কুন্ডলী ফুঁড়ে বের হবে। আর তার ঠিক কয়েক মিনিট পর পৃথিবী জ্বলন্ত কুন্ডের জ্বালানি হয়ে শিখায় পরিণত হবে এবং মহাশূন্যে ধূলো-বালির একটি মেঘছাড়া তা আর কিছুই থাকবেনা।[৪৪]

অন্য মতবাদ অনুসারে, সূর্যের আলোর মজুদ সীমিত। এটা এমন একটি অগ্নি গোলক, বাহির থেকে যার জ্বালানী সরবরাহ হয়না। ঐ-Shapley-র অনুমান মতে, সূর্যের আলোক কণা বিকিরণের মাধ্যমে প্রতি মিনিটে প্রায় পঁচিশ কোটি টনের কাছাকাছি তার ওজন হ্রাস করছে।[৪৫]

জর্জ গেমোর (George Gamow) মতে সূর্য তার শেষ মূহুর্ত গুলোতে চন্দ্রকে এত কম আলো সরবরাহ করবে যে, তা খুব কষ্টে দৃষ্টিগোচর হবে। সূর্য শেষবার সঙ্কুচিত হবার পূর্বে এবং প্রলয়ের সাথে আলিঙ্গনের বহু পূর্বে তার প্রচন্ড তাপে মানব বংশ জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাবে।[৪৬]

---

[৪১] কোরআন আওর সায়েন্স, পৃষ্ঠাঃ ১৩৮

[৪২] সূরা আম্বিয়াঃ ৩০

[৪৩] সূরা মুলকঃ ২

[৪৪] কোরআন আওর সায়েন্স

[৪৫] খোদা কাহা হ্যায়? ১৬৯

[৪৬] সূরজ কী মওত ওয়া পয়দায়িশ, পৃষ্ঠাঃ ২১৩

পর্বতমালা অপসারিত হবে, দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীসমূহ উপেক্ষিত হবে, বন্য পশুরা একত্রিত হয় যাবে, সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, আত্মা সমূহকে যুগল করা হবে, জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হল ? যখন আমলনামা খোলা হবে, আকাশের আবরণ অপসারিত হবে, জাহান্নামের অগ্নি প্রজ্বলিত করা হবে, জান্নাত নিকটবর্তী হবে, তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি (আমল) উপস্থিত করেছে?"[৪৭]

অন্যত্র বলা হয়েছে- "করাঘাতকারী, করাঘাতকারী কি ? করাঘাতকারী সম্পর্কে আপনি কী জানেন ? যে দিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙীন পশমের মত।"[৪৮]

বৃটেনের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, অভিজ্ঞ জ্যোতির্বিদ ও পদার্থবিদ (Sir James) বলেন- তাপ গতিবিদ্যা (Kinrtic) এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, প্রকৃতি তার শেষ স্তরে পৌছার পূর্বে এমন এক কাজের ভেতর দিয়ে যাবে যাকে (Incread of Emtorpy) বা নিষ্ক্রিয়তা বৃদ্ধি বলে। Emtorp বরাবরই প্রবৃদ্ধ হতে থাকে। কারণ, তা কোন বিন্দুতে গিয়ে নিথর হয়ে থেমে থাকতে পারেনা। তা অব্যাহতভাবে বাড়তে থাকে। যতক্ষণ আর বিস্তৃত হবার সুযোগ না থাকে। যখন এ স্তর এসে যাবে তখন আর বেড়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। এবং সৃষ্টি জগত নিস্প্রাণ হয়ে যাবে। কারণ তাপ গতিবিদ্যা সমাপ্তি ছাড়া অন্য কোন কিছুর থামার ও স্থির হবার অনুমতি দেয়না।

কাজেই কিয়ামতের ধারণা কোন খেয়ালী কাব্য নয় বরং তা বৈজ্ঞানিক ও প্রমাণিত সত্য। কোরআন তাই বলে, "কিয়ামত অবশ্যই আসবে ; তাতে কোন সংশয় নেই। অথচ অধিকাংশ মানুষ তা বিশ্বাস করেনা।"[৪৯]

পরকালীন হিসাব বনাম বর্তমান আবিস্কার ও গবেষণা ঃ

প্রত্যেক সরকার ও আদালতের কর্মচারীদের যেমন সার্ভিস বুক থাকে যাতে তার কর্ম-মেয়াদের হিষ্টরী শীট তৈরী হয় এবং এর ভিত্তিতে তার উন্নতি ও অবনতি নির্ধারিত হয়, অনুরূপ ফেরেশ্তাদেরও একটি দল আল্লাহতালার নির্দেশে প্রত্যেক মানুষের চব্বিশ ঘন্টার কর্মকান্ড লিপিবদ্ধ করতে থাকে। বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে একমত যে, ইথারের (যা বিদ্যুৎ ও আলো থেকেও সুক্ষ)স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরার মত হয়। এই ইথারিক প্লেটের বিস্ময়ন এত উন্নত যে, এটি ধারণাজাত বস্তুরও ফটো তুলতে পারে। কণ্ঠ ও নড়া-চড়ার ফটো পর্যন্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারে। এভাবে ইথার জগতের প্রত্যেক মানুষের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব কাজ কর্মের ফিল্ম তৈরী হতে থাকে। মানুষের আত্মা যখন দেহ ছেড়ে উড়াল দেয়, তখন ইথারের ফটোগ্রাফী ও সাথে নিয়ে যায়।[৫০]

আর তার ভিত্তিতেই মানুষের সারা জীবনের কাজকর্মের Audit হবে।

বর্তমান যুগে রাডার সিষ্টেম আবিস্কৃত হয়েছে। রাডার ফটোও নেয় এবং তা প্রচারও করে। রাডার থেকে বিদ্যুতের তীব্র আলোক রশ্মি হাজার মাইলব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে, স্থল ও শুণ্যকে তার আয়ত্বে নিয়ে আসে এবং তার অভ্যন্তরে অবস্থিত সব কিছুর ছবি নিয়ে পর্দায় প্রতিবিম্বিত করে। বিদ্যুতের রশ্মিকণা যে দিকে যায় তার সাদা-কালো সব কিছুর হুবহু ছবি তুলে নেয়। ইতমধ্যে জার্মান পুলিশ অপরাধে জড়িত হওয়ার সময় অদৃশ্য রশ্মির ব্যবহার শুরু করে দিয়েছে। এর মাধ্যমে পুলিশ অন্ধকারে তিন শ' গজ পর্যন্ত দেখতে

---

[৪৭] সূরা তাকভীর: ১-১৪

[৪৮] সূরা আল-কারিয়া: ৫-১০

[৪৯] সূরা মু'মিনুন: ৫৯

[৫০] খোদা কাহা হ্যায়, পৃষ্ঠা: ৬৬

IIUC CENTRAL LIBRARY
ACC. NO:-

বিরুদ্ধে আদালতে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা যায়।[৫১]

আধুনিক গবেষণা থেকে জানা গেছে যে, যে কোন জিনিষ তা অন্ধকারে হোক বা আলোতে হোক, যেখানে যে অবস্থায় হোক, নিজের থেকে অব্যাহতভাবে তাপ বের করে। যে তাপ বস্তুর আকার হিসেবে এমনভাবে বের হয় যে তা হুবহু সে বস্তুর প্রতিবিম্ব হয়। যেভাবে ধ্বনির তরঙ্গ সে বিশেষ অনুরণন ও কম্পনের প্রতিবিম্ব হয় যা কারো মুখ থেকে ধ্বনিত হয়। এমন ক্যামেরাও আবিস্কৃত হয়েছে, যা কোন কিছু থেকে বের হওয়া Heat waves ধারণ করে সে বিশেষ অবস্থার ছবি তৈরী করতে পারে যে অবস্থায় সে তরঙ্গ তার থেকে বেরিয়েছে।[৫২]

এ ধরনের ক্যামেরাকে Evaporagraph বলা হয়। এ ক্যামেরায় ইনফ্রারেড বা অদৃশ্য রশ্মি দ্বারা কর্ম সম্পন্ন করা হয়। তাই এটি আলো ও অন্ধকারে একই ধরনের ফটো নিতে পারে। কয়েক বছর পূর্বে এক রাতে নিউইয়র্কের উপর দিয়ে রহস্যময় একটি বিমান চক্কর কেটে চলে যায়। এর একটু পরেই উক্ত ক্যামেরা দ্বারা শুন্য থেকে তার তাপ তরঙ্গের ফটো নেয়া হয়। যা থেকে ধারণা করা গেছে যে, বিমানটি কোন আকৃতির ছিল।[৫৩]

কাজেই এ বিস্ময়কর তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্ব জুড়ে প্রত্যেক মানুষের জীবন ফিল্মবন্দী হচ্ছে। সব কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা ব্রহ্মাণ্ডের পর্দায় অঙ্কিত হচ্ছে। যেভাবে ফিল্ম ষ্টুডিও-তে ধারণকৃত কাহিনী অনেক দিন পর, অনেক দূরে স্ক্রীনের উপর হুবহু দেখা যায়, অনুরূপ প্রত্যেক মানুষ যা করেছে এবং যেসব কাজের ভিতর দিয়ে জীবন কাটিয়েছে তার পূর্ণ চিত্র একদিন তার সামনে সেভাবেই এসে যাবে এবং সে তা দেখে চিৎকার করে বলবে- "এটা কেমন দফতর, যাতে ছোট বড় সবই ধারণ করা আছে!"[৫৪]

অন্যত্র আল্লাহ মানুষকে তার আমলের ব্যাপারে এভাবে হুঁশিয়ার করেছেন যে, "কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে।[৫৫]

টেপ রেকর্ডার একটি বৈজ্ঞানিক আবিস্কার। আমরা তার সামনে যেসব শব্দ মুখ থেকে বের করি, সে অবিকল তা-ই ধারণ করে রাখে।[৫৬]

পবিত্র কোরআন চৌদ্দশ' বছর পূর্বেই এ ধারণা মানুষের চেতনায় স্থাপন করতে চেয়েছে। "সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তা-ই ধারণ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী (সচেতন ফেরেশ্‌তা) রয়েছে।"[৫৭]

ইরানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডঃ মুসাদ্দেক হুসাইন ১৯৫৩ সনে যখন এক মামলায় নজরবন্দী ছিলেন তখন তার কক্ষে একটি গোপন রেকর্ডিং মেশিন ফিট করা হয়েছিল, যা সব সময় সচল থাকতো। যেন তার মুখ নিসৃত সব শব্দ রেকর্ড করে প্রয়োজনে আদালতে পেশ করা যায়। এটি এখন খুবই ব্যাপক হয়ে পড়েছে যা প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা। ঠিক এভাবে প্রত্যেক মানুষের সাথে আল্লাহর পক্ষ হতে নিয়োজিত ফেরেশ্‌তা রয়েছে। তিনি তার সব কথাকে অত্যন্ত সঠিক ও শুদ্ধভাবে লিখে নেন বা অন্য শব্দে বলা যায়, Invisible Recorders প্রত্যেক মানুষের আশে পাশে লাগানো আছে যা তার মুখ নিসৃত সব শব্দ ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকৃত সব কর্ম সংরক্ষণ করে রাখে। পবিত্র কোরআনে এক স্থানে আল্লাহ তায়ালা বিষয়টি এভাবে

---

[৫১] প্রাগুক্ত: ৬৬

[৫২] ইসলাম আওর সাইন্স: ১০৫

[৫৩] রীডার ডাইজেষ্ট, নভেম্বর ১৯৬০

[৫৪] সূরা কাহফ: ৪৯

[৫৫] সূরা যিলযাল: ৭-৮

[৫৬] ইসলাম আওর ইনসান, পৃষ্ঠা: ১৭৪

[৫৭] সূরা ক্বাফ: ১৮

যা তোমরা কর।"[৫৮] এমন কি মানুষের হাত-পাও কেয়ামতের দিন তার কাজ-কর্ম, কথাবার্তার টেপ রেকর্ডারের ভূমিকা পালন করবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন-"আজ (কেয়ামতের দিন) তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব। তাদের হাত কথা বলবে। তাদের পা সাক্ষ্য দিবে যা তারা অর্জন করেছিল।"[৫৯]

বর্তমানে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার পরকালীন হিসাবের সত্যতার স্পষ্ট দলিল যা বিজ্ঞানীরাও স্বীকার না করে পারেনি। উইলিয়াম লেকী লিখেন-যদি বাস্তবেই কোন মানুষ মনে করে যে, তার কৃত কর্মের বিনিময়ে স্থায়ী শান্তি বা পুরস্কার কোন সর্ব জ্ঞাত বিচারকের আদালতে দেয়া হবে তাহলে তার এ চেতনা সৎকর্মের এমন উৎসাহদাতা হবে যার ফলে তার অপরাধ সংঘটনের কোন সম্ভবনাই থাকেনা।[৬০]

পরকালীন হিসেবের একটি অংশ আমলের পরিমাপ। আধুনিক উন্নতযুগের হাওয়া, তাপ ইত্যাদি অদৃশ্য বস্তুর পরিমাপের ব্যবস্থা কোরআনের দ্ব্যর্থহীন উক্তির- "আজ আমল পরিমাপের বিষয়টি বাস্তব"[৬১] সত্যায়ন করছে। যার ব্যাখ্যায় তখন আলেমদের নানান বক্তব্য পেশ করতে হয়েছিল। বৃটেনের বিশিষ্ট দার্শনিক বার্কলি বলেছেন। "বস্তুর যতগুলো গুণই মেনে নেয়া হয়েছে তার মূল হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা।"[৬২]

মোট কথা, আধুনিক বিজ্ঞান আমলের (ভাল-মন্দ) মত অদৃশ্য বস্তু পরিমাপের বিষয়টি প্রমাণ করে দিয়েছে।

টেলিভিশন ঃ

বর্তমান যুগের আরেকটি আবিস্কার টিভি, বা দুর দর্শন। টিভি হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত মানুষের সম্পূর্ণ নড়াচড়াকে ঘরে বসে ছবি করে সর্বসাধারণকে প্রদর্শন করছে এবং সংরক্ষণ করছে (দীর্ঘদিন পর দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার, চতুর্থবারও দেখানো যায়) এ বিষয়টিও পরকালে মানুষের আমলকে হুবহু ছবি করে দ্বিতীয় বার প্রদর্শনের সম্ভাব্যতার ধারণাকে সমর্থন যোগায়।

যোগযোগ ও প্রচার মাধ্যম ঃ

আজকের বিজ্ঞানের যুগে প্রচার ও যোগাযোগ মাধ্যম অর্থাৎ রেডিও, টিভি, ভিসিআর, টেলিফোন, ওয়ারলেস, টেলিগ্রাফ ইত্যাদির আবিষ্কার ও তার ব্যবহার কোরআনের বিভিন্ন কাহিনীর সত্যতার আরেকটি প্রমাণ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। এসবের ফলে ঈমানদারদের বিশ্বাসের ভিত আরো সুদৃঢ় হয়েছে। যেমন আল্লাহর হুকুমে তাঁর বান্দা ও অন্তরঙ্গ বন্ধু বিশিষ্ট সম্মানিত নবী হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন বাইতুল্লাহর কাছে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর সকল মানুষকে বাইতুল্লাহর হজ্ব ও যেয়ারতের আহবান জানিয়েছিলেন তখন আল্লাহ তাঁর এ বান্দার আওয়াজ কুদরতী বেতার তরঙ্গ দ্বারা সারা পৃথিবীর কোণে কোণে পৌছিয়ে দিয়েছিলন। কোরআন বলছে- "মানুষের মাঝে হজ্বের জন্যে ঘোষণা প্রচার কর। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত হতে।"[৬৩]

প্রিয় নবীজী (সঃ) জাহেলী যুগে কাফেরদের সম্মুখে যখন কোরআনের নিম্ন ঘোষণা শুনালেন "জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদের ডেকে বলবে" আর জাহান্নামবাসীরা জান্নাতবাসীদের ডেকে পানি চাইবে"[৬৪] তখন তারা নবীজীর (সঃ) সাথে বিদ্রুপ করেছিল। কিন্তু আজ এ সম্পর্কে বিজ্ঞান সন্দেহের সামান্যও অবকাশ রাখেনি। হযরত ওমর (রাঃ) বহুদূর থেকে "ইয়া সারিয়াতুল জাবল" বলে, যে সতর্ক করেছিলেন তার এ অলৌকিক

---

[৫৮] সূরা ইনফিতারঃ ১০-১১
[৫৯] সূরা ইয়াসীন
[৬০] তারীখে আখলাকে ইউরোপ
[৬১] সূরা আ'রাফঃ ১৮
[৬২] ত্রৈমাসিক নিশানে মঞ্জিল, পৃষ্ঠাঃ ২৫
[৬৩] সূরা হজ্বঃ ২৭
[৬৪] সূরা আ'রাফ ৪৪--৪৫

ঘটনার সম্ভাব্যতাও এসব প্রমাণ থেকে সংশয়মুক্ত হয়। নিকট অতীতে এক নভোচারী চাঁদে আজানের আওয়াজ শুনে পরে যখন মুসলমান হলেন কোরানের পবিত্র আয়াতটিরই সত্যতা ফুটে উঠল যে, "তারই দিকে আরোহণ করে সৎ বাক্য।"[৬৫]

আধুনিক কালের যানবাহন ঃ

প্রাচীনকালে মালবাহন ও যানবাহন হিসেবে সাধারণতঃ ঘোড়া, খচ্চর, গাধা, উট, গরু প্রভৃতি ব্যবহৃত হত। নদী ও সমুদ্র পথে নৌকা, জাহাজ ব্যবহার করা হত (বর্তমানেও এসব ব্যবহৃত হচ্ছে)। আধুনিক কালের যানবাহন-সাইকেল, মোটর সাইকেল, রিক্শা, টেক্সী, কার, রেল এবং বিমান ইত্যাদির কথা প্রাচীন যুগে ধারণা করাও সম্ভব ছিলনা।[৬৬]

কিন্তু সে যুগেও পবিত্র কোরআন আধুনিক যানবাহন ও মানুষের নানান যোগাযোগ মাধ্যমের কথা অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ শব্দে ইঙ্গিত করে বলেছে,

"আল্লাহ ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা তোমাদের বাহনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি এমন বাহনও সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জাননা এবং আমরা নৌকার মত আরো কিছু সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করবে।"[৬৭]

প্রাচীন দার্শনিকদের মতানুসারে দ্রুতগতির কোন সীমা নেই। এ কারণে আজ রকেট, আকাশযানের মত বস্তু আবিস্কৃত হয়েছে। যার ফলে একদিনের সফর এক/দু' ঘন্টায় সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে এবং মানুষ চাঁদেও পৌছতে সক্ষম হচ্ছে। তবে কোরআনে পাক এর চেয়েও বহুগুণ গতি সম্পন্ন যোগাযোগ মাধ্যমের কথা উল্লেখ করেছে। যে সবের ফলে সাড়া জাগানো অনেক ঘটনা ঘটেছে। হযরত সুলাইমান (আঃ)-র মন্ত্রী আসেফ বিন বরখিয়ানা সাবার সম্রাজ্ঞী বিলকিসের হাজার মাইল দূরে পড়ে থাকা সিংহাসন সম্পর্কে বলেছে- "আমি তা আপনার কাছে এক পলকে নিয়ে হাজির হব।"[৬৮] বাস্তবেও তাই হয়েছে। কয়েক সেকেন্ডের ভেতর বিলকিসের সিংহাসন হযরত সুলাইমানের কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল। চাঁদের দেশে গিয়ে বরং তার চেয়েও উপরে গিয়ে কুদরতের দৃশ্য পরিদর্শন করার আহবান বহু পূর্বেই কোরআন দিয়েছে। আপনি বলুন, "তোমরা নভোমন্ডলে-ভূমন্ডলে কুদরতের দৃশ্য অবলোকেন কর।"[৬৯]

ফেরাউনের পরিণতি ও তার লাশ প্রাপ্তি ঃ

হযরত মূসার (আঃ) প্রতিপক্ষ ফেরাউন শাহীর অবাধ্যতা ও হঠকারিতার পরিণামে সমুদ্রে ডুবিয়ে তাকে নিঃশেষ করা হয় এবং তার মৃতদেহকে কেয়ামত পর্যন্তের জন্য সংরক্ষণ করে সকল প্রজন্মের উপদেশ গ্রহণের উপায় করা হয়েছে।

কোরআন ঘোষণা করেছে- "আজ আমরা তোমার দেহকে (পানি থেকে রক্ষা করে) সংরক্ষণ করলাম। যেন তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য উপদেশ হও।"[৭০] এ দাবীকে নিয়ে সে যুগের কাফির মুশরিক এবং বর্তমানের ইসলাম বিদ্বেষীরা বিদ্রূপ করেছিল। তারা বলেছিল- "কোরআনের এ দাবী তখনই সত্য হবে ফেরাউনের লাশ চিহ্নিত করা যাবে।"

আল্লাহ সব কিছুর একটা সুনির্দিষ্ট সময় রেখেছেন। তাই ১৮৮১ সনে মিসরের পিরামিডের নিকট মিসরীয় প্রাচীন এক কবরস্থান খননের সময় ইংল্যান্ডের বিশেষজ্ঞরা পাথরের বাক্সে পাঁচটি মৃত দেহ পেয়েছিল যা

---

[৬৫] সূরা ফাতির: ১০
[৬৬] ইসলাম আওর ইনসান: ১৭১
[৬৭] সূরা নাহল: ৮
[৬৮] সূরা নামল: ৪৫
[৬৯] সূরা ইউনুস: ১০১
[৭০] সূরা ইউনুস: ৯২

ফলে কোরআনের দাবীর সত্যতা সুস্পষ্ট হয়ে গেল। অথচ ঘটনাটি ঘটেছিল কোরআন অবতরণের বাইশ শ বছর পূর্বে।

জোড়া নীতি ঃ

প্রাচীন বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞদের গবেষণা মতে, আল্লাহ শুধু মানুষ ও প্রাণীকে জোড়া (নর-নারী) করে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা ও বিশ্লেষণ এ ধারণা নাকচ করে দিয়ে প্রমাণ করেছে-উদ্ভিদ, জড়পদার্থ ও বস্তুর অনুকণাতেও জোড়া (নর-নারী), (নেগেটিভ পজেটিভ) পাওয়া যায়।[৭২] যেমন- গাছের নর ও নারীর মিলন (পরাগায়ন) বাতাসের মাধ্যমে হয়। কোরআন পূর্বাহ্নেই বলেছে:

"আমি বৃষ্টিগর্ভবায়ু পরিচালনা করি।"[৭৩]

অনুরূপ, আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা মতে, বিদ্যুত ও আলোতে নেগেটিভ-পজেটিভ জোড়া আছে এবং এ দু'টির মিশ্রণ ব্যতীত সুষ্ঠু ও উপকারী ফলাফল বের হবেনা। এভাবে কোরআনের পূর্বে বলা বক্তব্যগুলো পরিপূর্ণভাবেই সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে। চৌদ্দশ' বছর পূর্বে আল্লাহ তাঁর নবীর জবানীতে এ তথ্য সর্ব সাধারণকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, **" প্রত্যেক বস্তুকেই আমরা জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।"**[৭৪] **"পবিত্র তিনি, যিনি যমিন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদকে, তাদের থেকেই এবং যা তারা জানেনা, তার প্রত্যেককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন।"**[৭৫]

এ আয়াতের শেষাংশের আলোকে বলা যেতে পারে যে, না-জানি আগামী দিনে এমন কত বিষয় মানুষের জ্ঞানে আসবে যেগুলো সম্পর্কে আজ আমাদের কোন ধারণাই নেই। সাইন্সের এ উন্নতির যুগে যা হওয়াটা খুবই সম্ভব।

অদৃশ্য সৃষ্টি ঃ

আল্লাহ তায়ালা যেমন তাঁর পবিত্র সত্ত্বাকে গুণাবলীর আবরণে রেখেছেন অনুরূপ তিনি কিছু মাখলুককে শরীর ও আত্মা থাকা সত্ত্বেও আমাদের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রেখেছেন। যেমন, ফেরেশ্‌তা ও জিন। মানুষের স্বভাবজাত স্থূলতার কারণে দৃশ্যমান হয়না। কোরআন শয়তানের মানব-শত্রুতার কথা সুস্পষ্ট করে বলেছে- "সে (শয়তান) ও তার স্ব-গোত্রীয়রা তোমাদের দেখে অথচ তোমরা তাদের দেখনা।"[৭৬]

অনেক নাস্তিক ধরনের লোক এসব প্রাণীকে বিশ্বাস করেনা। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান আরেকটি অদৃশ প্রাণীর কথা উদ্‌ঘাটন করে এ সত্যটি সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এ বিশ্ব চরাচরে এমন অসংখ্য প্রাণী আছে যাদের শরীর ও আত্মা থাকা সত্ত্বেও দৃশ্যমান হয়না।

বিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণা মতে ইলেকট্রন ও প্রোটনের মিশ্রণের ফলে সৃষ্ট উপকরণকে সেল Cell বলা হয়। এ প্রাণী অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ, দেহ বিশিষ্ট, তীব্রগতিশীল ও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সচেষ্ট। এগুলোকে মানুষ শুধু অনুবীক্ষণযন্ত্র দিয়েই দেখতে পায়। স্যার চার্লস ডারউইনের বর্ণনা মতে Bacterias এতই ক্ষুদ্র যে একটি পিনের মাথায় লাখ লাখ এ ধরনের প্রাণী ও জীব দেখা যায়। মানুষ নিজেই দুই হাজার কোটি কোষ দ্বারা গঠিত এবং বিশাল জগতে তা আরেকটি ছোট জগত। কাজেই কোরআনের বিভিন্ন স্থানে

---

[৭১] ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকা, পৃষ্টাঃ ১৭-১৮

[৭২] কারওয়ানে সায়েন্স: ৪

[৭৩] সূরা হিজর: ২২

[৭৪] সূরা জারিয়াত: ৪৯

[৭৫] সূরা ইয়াছিন: ৩৬

[৭৬] সূরা আ'রাফ: ২৭

সবের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা হয়েছে।[৭৮]

মস্তিস্ক রোগ ঃ

বিশ্বের সকল মনস্তত্ত্ব বিশারদ এ বিষয়ে একমত যে, সব মস্তিস্কজাত রোগের সূচনা Frustration হৃদযন্ত্রের ভারসাম্যহীনতা থেকেই হয়। এর ভিত্তিতেই কিং এওয়ার্ড কলেজের মনোবিদ্যা বিভাগের প্রধান প্রফেসর আই এ কে থেরীন বলেন- **"মানসিক চাপ প্রতিরোধের কার্যকর চিকিৎসা হল ফজরের নামায।"** উক্ত বিভাগ পরিচালিত এক গবেষণা জরীপে বলা হয়েছে যে, তাহাজ্জুদের নামায এ রোগের কার্যকর চিকিৎসা।[৭৯]

অর্থাৎ তিনি একথা বলতে চাচ্ছেন যে, এসব রোগের চিকিৎসা ও অন্তরের (হৃদযন্ত্রের) প্রশান্তি অর্জনের জন্য আল্লাহর স্মরণ ও জিকির অপরিহার্য। এ বক্তব্য বহু পূর্বেই কোরআন দিয়েছে। "স্মরণ রেখো, আল্লাহর স্মরণ দ্বারা অন্তর প্রশান্ত হয়।"[৮০]

ডাঃ সৈয়্যদ মোবারক আলী আল জিলানী বলেন- "মস্তিস্ক রোগের চিকিৎসালয়ে (তায়েফ, সৌদি আরব) আমার কোরআনী চিকিৎসা পদ্ধতি বিভিন্ন দেশের মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞরা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং এ বিষয়ে রীতিমত বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য Religious Therapy প্রতিষ্ঠিত করেছেন তারা। তাতে কয়েকটি রোগ বিশেষতঃ উম্মাদনা, মৃগী ও চিত্ত বিকার প্রভৃতি রোগীদের কোরআনী সফল চিকিৎসা করে বর্তমান বস্তুবাদী বিজ্ঞান ও ফ্রয়েডের মতবাদ খন্ডন এবং কোরআনের প্রভাব বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করেছেন।"[৮১] এ প্রসঙ্গটি আল্লাহ তায়ালা এভাবে স্পষ্ট করেছেন, " আমরা কোরআনে এমন বিষয় অবতীর্ণ করি যা বিশ্বাসীদের জন্য চিকিৎসা ও রহমত স্বরূপ।"[৮২]

রক্ত ও শুকরের গোশত ঃ

এ দু'টি জিনিসকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। আল্লাহ বলেছেন- "নিশ্চয় তোমাদের জন্য মৃতপ্রাণী, রক্ত ও শুকরের গোশত হারাম করা হয়েছে।"[৮৩]

শুকরের গোশত হারাম কারণ করার সম্পর্কে একজন জার্মান লেখক বলেছেন, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) শুকরের গোশত ও অন্যান্য যেসব প্রাণীর গোস্ত খাবার থেকে তার উম্মতকে বারণ করেছেন, তাতে নিশ্চয় তিনি কলেরা, টাইফয়েড, জ্বর প্রভৃতি রোগের সন্ধান পেয়েছেন।[৮৪]

রক্ত সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের মন্তব্য হল- রক্তে শরীরের সকল নষ্ট তরল পদার্থ জমাট বাঁধে। কারণেই ইসলাম রক্তকে হারাম ঘোষণা করেছে।

মদ্যপান ঃ

বর্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণা মদের অপকারিতা দিবাকরের ন্যায় সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। প্রসিদ্ধ খাদ্যতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ প্রফেসর শিরলর বিভিন্ন পরিসংখ্যানের কথা উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেছেন যে, পাশ্চাত্যের উন্নত

---

[৭৭] খোদা কাহা হ্যায়?, পৃষ্ঠা: ৬৩
[৭৮] কোরআন আওর সায়েন্স: ১৯৮
[৭৯] দৈনিক জঙ্গ, ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯
[৮০] সূরা রা'দ: ২৮
[৮১] কোরআন আওর সায়েন্স, পৃষ্ঠা: ১৯৮
[৮২] সূরা বনী ইসরাইল: ৮২
[৮৩] সূরা বাক্বারা: ১৭৩
[৮৪] আখবারে ওকীল, ১৮ই জুন,, ১৯১৩

ফুসফুসের ক্যান্সার হবার অন্যতম কারণ। ডাইবেটিস, গলগন্ড ইত্যাদি রোগও মদ্যপানের ফলে সৃষ্টি হয়।[৮৫] এ কারণে চৌদ্দশ' বছর পূর্বেই ইসলাম এর অনিষ্টের কথা বিবেচনা করে তাকে হারাম ঘোষণা করেছে। মদীনায় কিছু সাহাবী নিজেই এ ব্যাপারে নবীজী (সঃ) সমীপে সিদ্ধান্ত চেয়ে বলেছেন-মদ সম্পর্কে আমাদেরকে ফতোয়া দিন। কারণ, তা বুদ্ধি নষ্ট করে, সম্পদ হানি ঘটায়। তখন আল্লাহ এ সম্পর্কে হুকুম অবতরণ করে বললেন- "হে বিশ্বাসী বান্দাগণ, মদ-জুয়া, প্রতিমা, এবং ভাগ্য নির্ধারক শর সমূহ, এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো কিছুই নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক-যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।"[৮৬]

খাঁটি ও নিষ্ঠাবান মুসলমানরা এই নির্দেশের সাথে সাথে এ অসৎ কাজের উৎসকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং নিজের জন্য তা কঠোরভাবে হারাম করে নিয়েছে। একজন গোঁড়া পশ্চিম গবেষক স্যার উইলিয়াম মুর লিখেছেন-ইসলাম গর্বের সাথে বলতে পারে ধর্ম সেভাবে সফল হতে পারেনি।[৮৭]

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজও নামধারী কিছু মুসলমান এ পঙ্কিলতার উৎস থেকে সরে দাঁড়াতে পারেনি।

সংক্ষিপ্ত এ পর্যালোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হল যে, বাস্তবতা নির্ভর বর্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামী শিক্ষা বা কোরআনের বিরোধী নয়। বরং কোরআনের কাছে বিজ্ঞান ঋণী ও কৃতজ্ঞ। বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে আল্লাহ মানুষের মাঝে সত্যকে বলিষ্ঠ করেছেন।

---

[৮৫] ইসলাম আওর মাগরেবী তাহরীকাত: ১৭৭

[৮৬] সূরা মায়িদা: ৯০

[৮৭] ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকা

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সাঃ) এর অবদান

-আইয়ুব আল আনসারী*

ভূমিকা:

পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করে মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। এ সুন্দর নয়নাভিরাম ধরার প্রতিটি সৃষ্টিই তাঁর অধীন ও সেবায় নিয়োজিত। কিন্তু পরিবেশের কারণে সে হতে পারে পতিত অধমেরও অধম। হতে পারে অত্যাচারিত, নির্যাতিত, শোষিত, অধিকার বঞ্চিত। যা দেখে অধম সৃষ্টিও আশরাফুল মাখলুকাতের প্রতি বিদ্রুপের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারে। তাকে এই পতন থেকে বাঁচানোর জন্য, সে যাতে তার মর্যাদার উপযোগী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্ষম হয়, তার শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, মানবিক স্বাভাবিক ঠিকানার জন্য তার মৌলিক অধিকার সমূহের নিশ্চয়তা দেওয়া প্রয়োজন।

এই মৌলিক অধিকারের সমসস্যাটি অত্যন্ত প্রাচীন। মানব সভ্যতার ইতিহাসে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত যেমন রয়েছে তেমনি মৌলিক অধিকার দলনের ইতিহাসও রয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর বড় বড় সমস্যাগুলোর মধ্যে এ সমস্যাটি প্রকট আকার ধারন করছে। বর্তমান পৃথিবীর ছয়শত কোটি লোকের প্রায় অর্ধেক মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সমস্যার শিকার। চরম দারিদ্র, ক্ষুধা, অপুষ্টি, অবিচার, নিষ্ঠুরতা, সন্ত্রাস ও শোষনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে কোটি কোটি মানব সন্তান মানবেতর জীবন যাপন করছে। দুটি বিশ্ব যুদ্ধ, হিরোশিমা-নাগাসাকি, মে দিবেসের ঘটনা আধুনিক জীবনের উদ্ধাস্তু, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর শ্রম শিবির, কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাংগের ব্যবধান, স্বাধীনতাকামীদের গণহত্যা ও ধর্ষন, ভিন্নমতালম্বীদের হত্যা নির্যাতন ও দমন পীড়ন, সর্বোপরি আধুনিক মানবতা বিধ্বংসী মারনাস্ত্রের ব্যাপক উন্নতি ও প্রসার বিশ্বব্যাপী মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের জীবন্ত প্রমাণ হয়ে আছে। জাতিসংঘের Charter on Human Rights ও জাতিসংঘ, এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল, UNDP, UNICEF সহ অন্যান্য মানবাধিকার কমিশন জাতির এ মৌলিক সমস্যার উত্তরনে উন্নত বিশ্বের শোষনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। বলতে গেলে যথার্থ অর্থে এই মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা অতীতে যেমন সুকঠিন ছিল, বর্তমানেও তেমনি কঠিন রয়ে গেছে। কেবল মানবাধিকার হরণের রূপ পরিবর্তন হয়েছে মাত্র।

সামগ্রিক বিচারে মানব সভ্যতার প্রবাহমান ইতিহাসের ধারায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চিরন্তনভাবে এ সমস্যার সমাধান দিয়েছেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যা পৃথিবী ধ্বংসের পূর্ব পর্যন্ত মানবজাতির একান্ত উত্তরাধিকার হয়ে থাকবে। আলোচ্য প্রবন্ধে মানবাধিকারের একমাত্র মহান পথিকৃৎ মানবতার নবী মুহাম্মাদ (সাঃ), মানুষের মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে যে অনন্য অবদান রেখেছেন তার পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে একটি তুলনামূলক আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

ولى الله التوفيق

---

* লেখক, শেষ সেমিষ্টার, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

মানবাধিকার: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

যদি আমরা বর্তমান পৃথিবীর তুলনামূলক জ্ঞান দ্বারা মানবাধিকারকে পর্যালোচনা করি, তবে এর দুটি দিক আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়:

১. পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোন:
২. ইসলামী দৃষ্টিকোন:

পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোন:

পাশ্চাত্য এটা দাবী করতেই অভ্যস্ত যে, সভ্যতার প্রতিটি অবদানই তাদের দ্বারা আবিস্কৃত। যুগে যুগে প্রতিটি উন্নয়ন ও অগ্রগতিকেই মানবতার উদ্দেশ্যে তাদের অবদান বলে চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের দাবি অনুসারে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুপস্থিতি ঘটলে বিশ্বের সামগ্রিক সভ্যতা অন্ধকার ও অজ্ঞতায় ডুবে থাকতো। মানবাধিকারের ক্ষেত্রেও তারা এর ব্যতিক্রম নয়। তাদের দাবী অনুসারে মানবাধিকারের প্রথম আগমন Magna Carta থেকে যা ইসলামের আগমনের ছয়শত বছর পরে বৃটেনে রচিত হয়। তবে সত্য কথা হলো, সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত কেউ জানতোই না যে Magna Carta এমন কিছু অধিকার সন্নিবেশিত করেছে। আজকের যুগে Magna Carta রচনাকারী ব্যক্তিরা যদি বেঁচে থাকতেন, তবে তারা আশ্চর্যই হতেন যে তাদের ম্যাগনাকার্টা এমনকিছু অর্ন্তভূক্ত করে নিয়েছে যা তারা লিখেননি অথবা তার জন্য তাদের কোন ইচ্ছাও ছিল না। যাই হোক মূলত পশ্চিমাদের মানবাধিকারের কোন ধারণাই ছিলনা সপ্তদশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত। সপ্তদশ শতাব্দীতে তাদের দার্শনিক ও পন্ডিতরা তার ধারণা উপস্থিত করে, যা কাগজে কলমে রাষ্ট্রের সংবিধানের রূপ পেতে বিশ্বকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে এবং যা সর্বপ্রথম আমেরিকা ও ফ্রান্সের সংবিধানে লিপিবদ্ধ হয়, অত:পর বিভিন্ন দেশে। তবে মজার ব্যাপার হলো, কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ এসব অধিকারের কথা শুধুই কাগজে সীমাবদ্ধ থেকেছে, মানব জীবনে বাস্তব রূপ লাভ করেনি।[১]

বর্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগে জাতিসংঘ Universal Dicleration of Human Rights নামে একটি প্রস্তাব পাশ করা হয় যা Resolution against genocide নামে পরিচিত। এর জন্য কিছু নীতিমালাও প্রনয়ণ করা হয়। তবে এটাকে মানবাধিকারের সত্যিকারের Resolution না বলে পাশ্চাত্যের শোসন করার একটি কৌশল হিসেবেও নামকরণ করা যায়, যার মাধ্যমে দুর্বল রাষ্ট্রকে শোষন করা যাবে। কিছু লোক দেখানো চমক জাগানিয়া আলোচনা ছাড়া তেমন কোন অর্জন এ সনদ বিশ্ববাসীকে উপহার দিতে পারেনি। যদিও বা মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার নামে মানবাধিকারের জড় কাটা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। সবল কতৃক দুর্বলের প্রতি অত্যাচার ও মৌলিক অধিকারের পদদলিত অবস্থা অবলোকনে জাতিসংঘ শুধুই অর্থহীন পর্যবেক্ষকের (Helpless Spectator) ভূমিকা পালন করছে।

পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে মুসলিমরা মানবাধিকার লংঘনের শিকার হচ্ছে। মানবতা আছাড় খেয়ে মরছে পতনের বেলাভুমিতে। তবু পাশ্চাত্যের সন্ত্রাসের বিরূদ্ধে যুদ্ধের নামে মজলুমের উপর জুলুম চলছেই। যতই মুসলিম বনী আদমের রক্ত ঝরুক না কেন, এটাই যে পাশ্চাত্যের মানবাধিকার বিষয়ক নীতি।

ইসলামী দৃষ্টিকোন:

অপরপক্ষে রাসূল (সা:) মানবাধিকারের যে ধারণা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন তা কোন দেশের আইন সভা অথবা কোন সরকার কতৃক অনুমোদিত নয়। বরঞ্চ তা এই পৃথিবীর সকল সৃষ্টির মালিক কর্তৃক অবতীর্ণ। পৃথিবীর মানুষের তৈরী মানবাধিকার যেমন চিরন্তন সমাধান দেওয়ার যোগ্য নয়, তেমনিভাবে অকাট্যতা না থাকার কারনে তা পরিবর্তন পরিবর্ধনের প্রয়োজন হতে পারে । আর শাসক যদি কোন স্বৈরশাসক হন তবে তার ইচ্ছা এবং মর্জির উপর মানবাধিকারের ভাগ্য নির্ভর করবে। অপর পক্ষে রাসূল (সা:) কতৃক প্রতিষ্ঠিত মানবাধিকারে এ সমস্যা নেই। সরাসরি

[১] HUMAN RIGHTS IN ISLAM 'Allamah Abu al-'A'la Mawdudi www.islam101.com/rights.

প্রয়োজন নেই। আবার, সাধারণ সমাজে মানবাধিকারের জন্য জনগণকে সরকারের কাছে জবাবদিহীতার কঠোরতা নেই। অথচ ইসলাম এ অধিকারকে তার বিধানের অঙ্গীভুত করে নিয়েছে, যা অমান্য বা অস্বীকার করলে মহান রাব্বুল আলামীনের ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। মহান রাব্বুল আলামীনের ঘোষনা: "যারা আমার অবতীর্ন বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করেনা তারা কাফির।"[২]

নিম্নে রাসূল (সা:) এর অবদানে নিশ্চিত মানবাধিকারের বিভিন্ন স্তরকে এভাবে উপস্থাপন করা যায়।

১.মৌলিক অধিকার:

১.১ জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার অধিকার:

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই প্রাণের নিরাপত্তা ও দু'মুঠো অন্নের নিশ্চয়তা চায়। জীবনবিহীনভাবে এ দুনিয়ায় বসবাসের প্রশ্নই উঠে না। আর সম্পদ ও অন্নবিহীন জীবন ধারনের প্রশ্নতো অবান্তর। অতএব এ অধিকারকে রক্ষার জন্য মানবতার একমাত্র আদর্শ পথিকৃৎ রাসূল (সা:) প্রত্যেক ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। জাতির উদ্দেশ্যে তার অমীয় বাণী সমূহ ও তার প্রদত্ত সিদ্ধান্তসমূহে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ আমাদের সামনে আসে:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لن يزال المؤمن فى فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. (رواه البخاري)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা: থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সা: বলেছেন: "মুসলমান সব সময় হেফাযত ও নিরাপত্তার মধ্যে অবস্থান করে যতক্ষণ সে অন্যায়ভাবে রক্ত প্রবাহিত না করে" (কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা না করে)[৩]

عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فى خطبته يوم النحر بمنى فى حجة الوداع : إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا ألا هل بلغت . (متفق عليه)

অর্থাৎ: আবু বাকরা (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা:) বিদায় হজ্বে কুরবানীর দিন মিনা নামক স্থানে তার ভাষনে বলেন: "তোমাদের পরস্পরের রক্ত বা জীবন, ধন-সম্পদ, মান-ইজ্জত পরস্পরের প্রতি হারাম ও সম্মানযোগ্য, যেমনিভাবে আজকের এই দিন, এই মাস এবং এই শহর তোমাদের জন্য হারাম ও সম্মানযোগ্য। আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছি?"[৪]

عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. (متفق عليه)

অর্থাৎ: আব্দুল্লাহ উবনে আমর রা: থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা:) বলেন: "মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার মুখের ও হাতের অনিষ্ট বা ক্ষতি থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। মুহাজির সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিস পরিত্যাগ করে।"[৫]

---

[২] মায়িদা: ৪৪

[৩] সহীহ আল বুখারী

[৪] বুখারী ও মুসলিম, রিয়াদুস সালেহিন ৪র্থ খন্ড, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, পৃ: ৪৮

[৫] বুখারী ও মুসলিম

اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة

" তোমরা জুলুম করা থেকে বিরত থাক। কেননা জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকারাচ্ছন্ন ধোঁয়ায় পরিণত হবে।"[৬]

عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرآ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. (متفق عليه)

অর্থাৎ: আবু মূসা আশআরী রা: থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল সা: বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেমকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখন তিনি তাকে গ্রেপ্তার করেন তখন আর ছাড়েন না। অত:পর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন: "আর তোমার রব যখন কোন জালেম জনবসতিকে পাকড়াও করেন, তখন তা পাকড়াও এমনিই হয়ে তাকে। তার পাকড়াও বড়ই কঠিন, নির্মম ও পীড়াদায়ক। সূরা হুদ: ১০২।"[৭]

عن أبي أمامة أياس بن ثعلبة الحارثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله فقال وإن كان قضبا من أراك (رواه مسلم)

আবু উমামা (রা:) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা:) বলেন: "যে ব্যক্তি (মিথ্যা) শপথের মাধ্যমে কোন মুসলমানের হক আত্মসাত করল, আল্লাহ তার জন্য দোযখের আগুন অনিবার্য করে দিবেন এবং বেহেশত হারাম করে দিবেন। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! যদি সেটা তুচ্ছ জিনিস হয়? তিনি বললেন: তা পিলু গাছের একটা শাখাই হোক না কেন।"[৮]

২.১ সাম্যতা:

পৃথিবী নামক এই সম্পূর্ণ ভূখন্ডের মানুষ মূলত: একই পরিবারের অন্তর্গত। একই সত্ত্বা থেকে সৃষ্ট। মানবিক মর্যাদা এবং মৌলিক দায়িত্ব ও কার্যভারের দৃষ্টিতে সবাই সমান। কেবল মাত্র আল্লাহভীরু ব্যক্তিরা এবং সৃষ্টজীবের উপকারী ব্যক্তিরাই আল্লাহ তায়ালার নিকট অধিক মর্যাদার অধিকারী। রাসূল (সা:) এ বিষয়কেই বিদায় হজ্বের ভাষণে এভাবে ব্যক্ত করেছেন: " হে মানবমন্ডলী। তোমাদের আল্লাহ এক এবং তোমাদের পিতা এক। এখন থেকে যারা আরবী নয় তাদের উপর আরবদের, কৃষ্ণাঙ্গদের উপর গৌরবর্ণ লোকদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে না। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর দরবারে অধিকতর সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া অবলম্বন করে।" অথচ মানব জীবনের এত উৎকর্ষতা সাধনের পরও উন্নত রাষ্টসমূহে সাদা কালোর পার্থক্য , নিম্নবর্ণের হিন্দুর উপর উচ্চবর্ণের হিন্দুর অত্যাচার, নিপীড়ন চলছেই। রাসূল (সা:) এ ক্ষেত্রে বিরল উদাহারণ সৃষ্টি করেছেন। হাবশী ক্রীতদাস বেলালকে মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিনের মর্যাদা দেওয়া, সাধারণ জনগনের সাথে দাসদের সমান করে দেওয়া এসব আজ পর্যন্তও যে কোন মানুষকেই সমতার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহ যোগাবে।

৩.১ স্বাধীনভাবে ধর্মীয় রীতিনীতি পালনের অধিকার:

প্রতিটি মানুষের ধর্মপালনের অধিকার রয়েছে। আর ধর্মে কোন বিদ্বেষের স্থান নেই। সুতরাং ধর্মপালন থেকে কাউকে বঞ্চিত করা অথবা তা থেকে কাউকে বিরত রাখার জন্য জোরপূর্বক প্রচেষ্টা চালানো রাসূল (সা:) নিষিদ্ধ করেন। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রে জিযয়ার বিনিময়ে অমুসলিমদের অধিকার ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ করেন। তাদেরকে স্বাধীনভাবে ধর্ম

---

[৬] সহীহ মুসলিম

[৭] আল কুর'আন, সুরা হুদ :১০২

[৮] সহীহ মুসলিম

ভোগ করে। এ ছাড়া খ্রিষ্টানগণও তার সময়ে স্বাধীনভাবে ধর্মীয় রীতি নীতি পালন করেছে। রাসূল (সা:) অমুসলিমদের সাথে অসদাচারণকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেয়ামতের ময়দানে উকিল হিসাবে দাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

৪.১ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের অধিকার:

সুষম যাকাত ব্যবস্থার প্রচলনের মাধ্যমে গরীব, দু:খী, মিসকিন, দু:স্থসহ সর্বস্তরের মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের অধিকার নিশ্চিত করেন, যার মাধ্যমে সমগ্র মানবতা দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার সুযোগ লাভ করে। এছাড়াও দারিদ্রতা দুরীকরণে রাসূল (সা:) ইসলামী অর্থব্যবস্থার আনুষাঙ্গিক বিধিসমূহ চালু করেন যথা: সাদাকা, ফিতরা, ওশর, খারাজ ইত্যাদি। যার ফল হিসেবে খিলাফাতে রাশেদার যুগে যাকাত ভোগকারী কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। হাদীসে ইসলামী স্বর্ণযুগের এ চিত্রই ভবিষ্যত বানী হিসেবে ফুটে উঠে:

عن حارثة بن وهب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته، فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها (بها)

(رواه البخارى)

অর্থাৎ: হারিসা ইবনে ওয়াহাব (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা:) কে বলতে শুনেছি: "তোমরা দান কর। কেননা তোমাদের ওপর এমন এক সময় আসবে যখন কোন লোক তার যাকাত নিয়ে ঘুরতে থাকবে, অথচ এমন কাউকে খুজে পাবে না যে তা গ্রহণ করবে। লোকে বলবে, যদি গতকাল এটা নিয়ে আসতে তবে অবশ্যই আমি গ্রহণ করতাম, কিন্তু আজ আর আমার এর প্রয়োজন নেই।"[৯]

عن ابن عباس إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. (رواه البخارى)

অর্থাৎ: "আল্লাহ তাদের উপর তাদের ধন-সম্পত্তিতে যাকাত ফরজ করেছেন। ঐ যাকাত তাদের মধ্যেকার ধনীদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়ে তাদের দরিদ্রদের মাঝে বন্টিত হবে।[১০]

عن أبي هريرة، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول ال،له أى الصدقة أعظم أجرا قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر، وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. (رواه البخاري)

অর্থাৎ আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সা:) এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে রাসূলুল্লাহ! কোন ধরনের দান সর্বাধিক পূণ্যের ? তিনি বললেন, তুমি সুস্থ ও অর্থের প্রয়োজন থাকা অবস্থায় (যে দান করবে) এবং দারিদ্র্যের আশংকা করছ, ধনী হওয়ার আশাও পোষণ করছ, এমতাবস্থায় যে দান করবে। আর ঐ সময় পর্যন্ত বিলম্ব করবে না, যখন তোমার প্রাণ হবে কুষ্ঠাগত আর তুমি বলবে, অমুককে এত, অমুককে এত দিলাম। বস্তুত তা তো তখন অপরের হয়ে গেছে।[১১]

৫.১ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস ও তার একত্বের প্রতি স্বীকৃতি:

---

[৯] সহীহ আল বুখারী ১৩১৯ ২য় খন্ড, আধুনিক প্রকাশনী ঢাকা।

[১০] সহীহ আল বুখারী ১৩০৫, ২য় খন্ড, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

[১১] সহীহ আল বুখারী ১৩২৭, ২য় খন্ড, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

জন্য নির্দিষ্টকৃত এবং মুসলিম এর দিকেই পরিচালিত হয়। রাসূল (সা:) তার তাওহীদের বাণীতে মরু আরবের সকল মানুষের চিন্তাকে বিধৌত করে এই ধারণাই প্রতিষ্ঠা করেন যে, মানুষ একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করবে, অন্য কারো নয়। সে স্বাধীন, একমাত্র আল্লাহর নিকটই তার জবাবদিহীতা। এ মৌলিক অধিকার প্রসঙ্গে রাসূল (সা:) যথার্থই বলেছেন:

عن أبي عبد الله طارق بن أشيم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله محمدا رسول الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. (مسلم)

অর্থাৎ: আবু আব্দুল্লাহ তারেক ইবনে উশায়েম রা: থেকে বর্ণিত। "তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা: কে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ (সা:) আল্লাহর রাসূল, এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য যেসব বস্তুর পূজা করা হয়, সে সেগুলোকে অস্বীকার করে, তার জান ও মাল নিরাপদ হয়ে গেল; আর তার হিসাব মহান আল্লাহর উপর সমর্পিত।"[১২]

২.রাজনৈতিক অধিকার:

১.২ স্বৈরাচারের বিরূদ্ধে প্রতিবাদের অধিকার:

শাসক যখন শোষক হিসেবে আবির্ভূত হয়ে সাধারণ জনগণের জীবন ও পরিবেশকে অস্থিতিশীল করে তোলে জনগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো তাকে সংশোধন করে দেয়া, অন্যথায় তার বিরূদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। ইসলামে এ অধিকারকে যথার্থভাবেই মূল্যায়ন করা হয়েছে। রাসূল (সা:) শাসকের উদ্দেশ্যে জনগণের দায়িত্ব সম্পর্কে স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদকে উৎসাহিত করেছেন।

২.২ জনগণের পরামর্শে সরকার পরিচালিত হবে:

মহানবী (সা:) জনগণের পরামর্শ বা শুরার মাধ্যমে জনগণের সুচিন্তিত মতামতকে মূল্যায়ন করেন এবং সকল কল্যাণকামী পরামর্শের ভিত্তিতে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহন করতেন। আহযাব যুদ্ধের প্রাক্কালে সালমান ফারসী (রা:) এর পরামর্শেই খন্দক করেন ও কুরাইশ কাফিরদের পরাজিত করেন-যা আমরা রাসূল (সা:) এর প্রত্যেক কাজেই দেখতে পাই। খিলাফাতে রাশেদার যুগে মজলিসে শুরার কার্যক্রম আমাদের সামনে দিবালোকের মত স্পষ্ট; যার মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাত সমৃদ্ধির চুড়ায় আরোহন করেছিল। বস্তুতপক্ষে, শুরা বা সাধারণ জনগনের ইতিবাচক মতামত ও পরামর্শ যে কোন সরকারের সফলতার জন্য পূর্বশর্ত।

৩. বিচার:

৩.১ শাসকরাও আইনের উর্ধ্বে নন:

পৃথিবীতে শাসকগণ আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে থাকেন। মূল শাসন ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তাই শাসকরাও জবাবদীহিতার বাইরে নন। তাদের কৃত অপরাধের জন্য তাদের অবশ্যই শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। রাসূল (সা:) তার ভাষাতে এই নীতিই সুস্পষ্ট করে দেন:

রাসূল (সা:) বলেন: "তোমাদের পূর্বে বিভিন্ন জাতি এ জন্য ধ্বংস হয়ে গেছে যে তারা জনগণকে তাঁদের অপরাধের কারনে শাস্তি দিত কিন্তু নিজেদের অপরাধের কারনে নিজেদেরকে শাস্তির সম্মুখিন করেনি। সেই সত্তার শপথ যার

[১২] মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, ২য় খন্ড, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, পৃ: ১

দিতাম।"[১৩]

৪. জ্ঞানার্জনের অধিকার:

অক্ষরজ্ঞান অথবা জ্ঞান ব্যতীত একজন মানুষ দৈহিকভাবে মানুষের রূপ লাভ করতে পারে, কিন্তু তা তাকে প্রাণীর সমান স্তরে পৌছে দেয়। যা তার জন্য বিরাট একটা অভিশাপ। পৃথিবী বা সমাজের অগ্রগতির জন্য সে কোন অবদানই রাখতে পারে না। এ পৃথিবীর আদর্শ শিক্ষক রাসূল (সা:) জাহিলিয়াত ও মুর্খতার কবল থেকে মানবতাকে উদ্ধার করে স্রষ্টার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য এ ধরায় আগমন করেন। পৃথিবীর কোন বিদ্যানিকেতনে পড়াশোনা না করলেও স্বয়ং রাব্বুল আলামীন তার শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নবুয়ত প্রাপ্তির পর দারুল আরকামে রিসালাতের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে আবু বকর, ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, যুবাইর ইবনুল আওয়ামের মতো শ্রেষ্ঠতম নেতৃত্ব তৈরী করেন। তার হাত ধরেই আবু হুরায়রা, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের মতো সাহাবীরা জ্ঞানের চুড়ান্ত সোপানে পৌছার সুযোগ পান। জ্ঞানার্জনকে বাধ্যতামূলক করে তিনি ঘোষনা করেন:

طلب العلم فريضة على كل مسلم

অর্থাৎ: "প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর উপর জ্ঞানার্জন বাধ্যতামূলক।"[১৪]

শিশু কিশোরদের শিক্ষা ও আদব কায়দা শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে নবীজি বলেন:

عن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسنول الله -صلى الله عليه- وسلم قال: كنت غلاما فى حجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكانت يدى تطيش فى الصحفة فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتى بعد. وتطيش تدور فى نواحي الصحفة. (متفق عليه)

আবু হাফস উমর ইবনে আবু সালামা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর তত্ত্বাবধানাধীন বালক ছিলাম। আমার হাত (খাবারের) পাত্রের এদিক-সেদিক যেত। রাসূল (সা:) আমাকে বলেন: খোকা! আল্লাহর নাম লও, ডান হাতে খাবার গ্রহণ কর এবং নিকটস্থ খাবার খাও। এরপর থেকে আমি সর্বদা তার শিখানো পদ্ধতিতেই খাবার খাই।[১৫]

৫. সামাজিক ও পারিবারিক অধিকার:

৫.১ ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার:

প্রতিটি মানুষেরই ব্যক্তিগত গোপন বিষয়াদি থাকতে পারে যা তার একান্তই ব্যক্তিগত। রাসূল (সা:) অপর ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখার জন্য স্বীয় উম্মাতকে শিক্ষা দেন এই হাদীসে:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا فى الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة

(رواه مسلم)

অর্থাৎ: আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত। রাসূল সা: বলেন: যে বান্দাই অন্য বান্দার দোষ ত্রুটি এ পার্থিব জগতে গোপন রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন।[১৬]

---

[১৩] HUMAN RIGHTS IN ISLAM 'Allamah Abu al-'A'la Mawdudi www.islam101.com/rights.

[১৪] মুসলিম

[১৫] বুখারী ও মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন ১ম খন্ড, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, পৃষ্ঠা: ২২৭

[১৬] মুসলিম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১৯২

সম্মান ও মর্যাদা সমাজে সুস্থ ও সুন্দরভাবে বাস করার জন্য একটি মাধ্যম। ইসলাম তথা রাসূল (সা:) এর নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা বিধান করার জন্য অসংখ্য তাগিদ ও ব্যবহারিক কর্মের মাধ্যমে মানবজাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষের জান, মাল ও সম্পদের নিরাপত্তার জন্য রাসূল (সা:) গীবত, পরনিন্দা, প্রতারণা, অন্যায়ভাবে গালিগালাজ, উৎপীড়ন, দোষক্রটি তালাশ, হিংসা বিদ্বেষ, ঠাট্টা-বিদ্রুপ, ওয়াদা খেলাপ, গর্ব অহংকার, ইত্যাদি কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন যা নিম্নের হাদীস সমূহে লক্ষ্য করা যায়:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى ههنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم

(رواه الترمذى)

অর্থাৎ: আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: "মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তাকে মিথ্যা বলবে না এবং তাকে হেয় প্রতিপন্ন করবে না। প্রত্যেক মুসলমানের মান- ইজ্জত, ধন-সম্পদ ও রক্ত অন্যসব মুসলমানের উপর হারাম। (তিনি বক্ষস্থলের দিকে ইশারা করে বলেন) : তাকওয়া এখানে। কোন ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করে, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে।"[১৭]

وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ههنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب المرئ منالشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه(رواه مسلم)

অর্থাৎ: আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা:) বলেন: "তোমরা পরস্পরের প্রতি হিংসা পোষণ করো না, তানাজুশ করো না, ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না, তোমাদের কেউ অপর কারো ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় করবে না। আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ভাই ভাই হয়ে থাক। মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তাকে জুলুম করতে পারে না, হীন জ্ঞান করতে পারে না এবং অপমান- অপদস্থও করতে পারে না। তাকওয়া এখানে। এ কথাটা তিনি তিনবার বলেন এবং নিজের বক্ষস্থলের দিকে ইঙ্গিত করেন। কোন ব্যক্তির খারাপ প্রমাণিত হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করে, হীন মনে করে। প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত (জীবন), ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান অন্য সব মুসলমানের জন্য হারাম।"[১৮]

عن أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه (متفق عليه)

অর্থাৎ: আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত। নবী (সা:) বলেন: "তোমাদের কেউই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষন না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।"[১৯]

---

[১৭] তিরমিযি।

[১৮] সহীহ মুসলিম।

[১৯] বুখারী ও মুসলিম

৬.১ শিশু অধিকারঃ

শিশুরাই পরবর্তী প্রজন্মের উত্তরাধিকারী। এদের মাঝে লুকিয়ে আছে মহামনীষীরা। এজন্যই শিশুর জন্য যত্নের সাথে বেড়ে উঠা অত্যন্ত জরুরী। তার ভবিষ্যতকে সোনালী রূপে গড়ে দেয়ার জন্য চাই উপযুক্ত পরিচর্যা। কিন্তু এসব কিছুকে পাশ কাটিয়ে শিশুদেরকে ব্যবহার করা হয় শ্রমজাতীয় কাজে। প্রতি বছর অসংখ্য শিশু অপুষ্টিতে ভোগে। আর অন্ধকার যুগে মেয়ে শিশুদের জীবন্ত প্রোথিত করা হত। মানবতার বন্ধু মহানবী (সা:) শিশুদের মমতার বন্ধনে আবদ্ধ করে তাদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, অন্ন ও নিরাপদ পৃথিবী নিশ্চিত করেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ও আনাস (রা:) বাল্যকাল থেকেই তার একান্ত পরিচর্যায় থেকে কুরআন ও হাদীস শাস্ত্রের অভিজ্ঞ বিশারদ হিসাবে মুসলিম উম্মাহকে পথ দেখান। এতিমদের জন্য পেশ করেন সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেড়ে উঠার নীতিমালা। রাসূল (সা:) ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষন করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়ে বলেন:

عن أبي هريرة عن النبي –صلى الله عليه وسلم– قال اجتنبوا السبع الموبقات..... وأكل مال اليتيم....

(متفق عليه)

অর্থাৎ: "তোমরা ইয়াতীমের মাল ভক্ষন করা হতে বিরত থাক।"[২০]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষনকারীর জন্য কঠোরভাবে হুশিয়ারী উচ্চারন করে বলেন:

(إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا

অর্থাৎ: "যারা ইয়াতীমের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা আগুন দ্বারাই নিজেদের পেট বোঝাই করে। তারা নিশ্চয়ই জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।"[২১]

শিশুদের সম্পর্কে হযরত আনাস রা: বর্ণনা করেন: " আমি একদিন রাসূলুল্লাহর (সা:) সাথে পথ চলছিলাম। পথের পাশে একদল ছেলে খেলা করছিল। রাসূল (সা:) তাদের কাছে থেমে গেলেন এবং সালাম জানালেন। পথ চলার সময় অন্যদেরকে বিশেষ করে শিশুদেরকে সালাম জানানো নবী করিম (সা:) এর অভ্যাস ছিল।"[২২]

৬.২ মাতা পিতার অধিকারঃ

মানুষ হিসেবে প্রতিটি পুরুষ ও নারী পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের অধিকার লাভ করে। অনাগত ভবিষ্যতের জন্য নতুন একটি প্রজন্মকে পৃথিবীতে আলোর মুখ দেখায় তারা। তাই তাদের জন্যও রাসূল (সা:) সন্তানের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন সদাচারণের। রাসূল (সা:) বলেন:

عن عبد الله عمرو بن العاص عن النبي –صلى الله عليه وسلم– قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. (متفق عليه)

অর্থাৎ: আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) থেকে বর্ণিত। নবী (সা:) বলেন: "কবীরা গুনাহ হলো আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কোন মানুষকে হত্যা করা এবং মিথ্যা শপথ করা।"[২৩]

---

[২০] বুখারী ও মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন ৪র্থ খন্ড,বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ঢাকা, পৃষ্ঠা: ১০৭

[২১] আল কুর'আন, সুরা নিসা: ১৮

[২২] ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, শিশু অধিকার ও হযরত মুহাম্মদ (সা:), কিশোর কন্ঠ: মে ২০০৩

[২৩] বুখারী ও মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন ১ম খন্ড, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, পৃষ্ঠা: ২৪৭

হয়েছে:

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا

অর্থাৎ: "তোমাদের প্রতিপালক ফায়সালা দিয়েছেন, তোমরা কেবল তারই ইবাদত করবে এবং পিতা-মাতার সাথে ভলো ব্যবহার করবে। তোমাদের কাছে যদি তাদের কোন একজন কিংবা উভয়ে বৃদ্ধাবস্থায় থাকে তবে তুমি তাদেরকে "উহ" পর্যন্ত বলবে না, তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না এবং তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদা সহকারে কথা বলবে। তুমি বিনয় ও নম্রতা সহকারে তাদের সামনে নত হয়ে থাকবে এবং বলবে: "হে আল্লাহ! তাদের প্রতি রহম কর, যেমন তারা ছোটবেলায় আমাকে লালন-পালন করেছেন"[২৪]

রাসূলে কারীম (সা:) এভাবে পিতা, মাতাকে পরম সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন করেন।

৬.৩ নারী অধিকার:

নারী এই মহা বিশ্বব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। নারীকে বাদ দিয়ে বিশ্ব পরিবারের কোন কিছুই ভাবা যায় না। কখনো স্নেহময়ী মাতা, কখনো জীবনসঙ্গীনী, আবার কখনো পরম আদরের কন্যা হিসেবে নারীর রূপ পরিবর্তিত হয়।তাই এই বিশ্ব জগতে যা কিছু তার অর্ধেক নারীর। রাসূল (সা:) যে সুমহান আদর্শকে সাথে নিয়ে মানবজাতির উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছেন তারও অর্ধেক নারীর জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। মায়ের সম্মান, স্ত্রীর মর্যাদা ও কন্যার অধিকার নারীকে বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। নারী যখন মা অথবা কারো স্ত্রী হন তখন তার ভরন পোষনের দায় দায়িত্ব তার সন্তান অথবা স্বামীর। আর কন্যা হলে পিতাই তার দায় দায়িত্ব বহন করবে। অথচ জাহেলী যুগে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করা হতো। তার কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না। ইসলাম তাকে তার মর্যাদা ফিরিয়ে দিয়ে মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে আসীন করে। নারী সম্পর্কে ইসলামের ধারনা অত্যন্ত ব্যাপক। রাসূল (সা:) কন্যা সন্তানের লালন পালনকে উৎসাহিত করে বলেন:

عن أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه -وجاريتين أى بنتين-. (رواه مسلم)

অর্থাৎ: "আনাস রা: থেকে বর্ণিত। নবী সা: বলেন: যে ব্যক্তি দু'টি মেয়েকে বয়:প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করল, সে কিয়ামতের দিন এরূপ অবস্থায় আসবে যে, আমি ও সে এরকম একত্র থাকব। তিনি তাঁর আঙুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন।"[২৫]

৬.৪ যুদ্ধ বন্দীর অধিকার:

সাম্প্রতিক সময়ে আমেরিকার যুদ্ধ বন্দীর সংজ্ঞায় বিশ্ববাসী বিস্মিত হয়েছে। নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নতুন সংজ্ঞার আবিস্কার যদিও বা আমেরিকানদের পুরনো অভ্যাস। আফগানিস্তান, ইরাক, জার্মানীসহ অসংখ্য দেশে তার যুদ্ধবন্দী হত্যার নজীর ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে। অথচ ১৪০০ বৎসর পূর্বে মরু আরবের বুকে রাসূল (সা:) সর্বপ্রথম যুদ্ধ বন্দীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তাদের হত্যা করা নিষিদ্ধ ঘোষনা করেন। পর্যাপ্ত পরিমানে খাদ্য, পরনের কাপড় ও অন্যান্য সুবিধাদি দিয়ে তাদেরকে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় । বদরের যুদ্ধসহ অন্যান্য যুদ্ধবন্দীদের সাথে রাসূল আকরাম (সা:) এর আচরণ এর দৃষ্টান্ত বহন করে। রাসূল (সা:) যখন কোন বাহিনী কোন যুদ্ধে প্রেরণ করতেন

---

[২৪] আল কুর'আন সুরা বনী ইসরাইল: ২৩-২৪

[২৫] সহীহ মুসলিম

ইরাকি জনগনকে মুক্তির নামে আমেরিকা নির্লজ্জভাবে অসংখ্য বেসামরিক জনগণকে হত্যা করেছে। বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ লাইন ক্ষতিগ্রস্থ করে নাগরিক জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে। নিষিদ্ধ ক্লাস্টার বোমা ফেলে অসংখ্য জীবনকে পঙ্গুত্বের মুখে ঠেলে দিয়েছে। তাদের কাছে যুদ্ধবন্দী বা নাগরিক অধিকার মুখের বুলি বা খেলনার পরিভাষা হিসেবেই মানায়।

৬.৫ বৃদ্ধ, বিধবা ও মিসকিনের অধিকারঃ

ইসলাম বৃদ্ধ, বিধবা ও মিসকিনদের অসহায় অবস্থার পরিবর্তে তাদের জন্য সহায়ের ব্যবস্থা করেছে। অসহায় ও গরীবের শ্রেষ্ঠতম বন্ধু রাসূল (সা:) এর কথাতেই তা বোঝা যায়ঃ

عن أبى هريرة عن النبي –صلى الله عليه وسلم– قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله وأحسبه

قال: وكالقائم الذي لايفتر وكالصائم لا يفطر. (متفق عليه)

অর্থাৎ আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্নিত। নবী আকরাম সা: বলেন: "বিধবা, বৃদ্ধ ও মিসকিনদের (সাহায্যের) জন্য চেষ্টা-সাধনাকারী আল্লাহর পথে জিহাদকারীর সমতুল্য।" (রাবী বলেন), আমার ধারণা, তিনি (নবী সা:) এ কথাও বলেছেন: "সে অবিরাম নামায পাঠকারী ও অনবরত রোযাদার ব্যক্তির সমতুল্য।"[২৬]

উপসংহারঃ কালের ক্রমধারায় আমরা আজ একবিংশ শতাব্দীর সমৃদ্ধতম পৃথিবীর নাগরিক। যদিও এ সমৃদ্ধি যান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যে অনেকটা সীমাবদ্ধ। ১৪০০ বছর পূর্বের মুক্ত বিপন্ন মানবতা আজ পতনের বেলাভূমিতে আছাড় খেয়ে মরছে। যার একমাত্র কারণ এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রেসালাত ও মানবজাতির জীবন বিধানের বাহক মুহাম্মদ (সা:) কতৃক আনীত জীবন ব্যবস্থাকে পরিত্যাগ করা। বিশ্বের প্রতিটি বনী আদমকেই মানবতার প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা:) এর জীবনকে সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করে তার আনীত হিদায়াতের আলোর দিকে ফিরে আসা উচিৎ তবে মুক্তি পাবে মানবতা। প্রতিষ্ঠা লাভ করবে মানুষের মৌলিক অধিকার। যার সম্পর্কে পাশ্চাত্যেরই বিশিষ্ট দার্শনিক জর্জ বার্নাডশ বলেছেন: If the world was united under one leader then Muhammad (sm) would have been the best fitted man to lead the peoples of various creeds, dogmas and ideas to peace and happiness. অর্থাৎ: যদি সমগ্র বিশ্বে ধর্ম, সম্প্রদায়, মতবাদ ও আদর্শের ধারক মানব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে একনায়কের শাসনাধীন আনা হতো, তবে একমাত্র মুহাম্মাদ (সা:)- ই সর্বাপেক্ষা যোগ্য নেতারূপে তাদের শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে পারতেন। তিনি আরো বলেছেন: Sooner or later a time will surely come, when the world will be freed to admit that the only means to end all it's trouble is to follow the perfect teaching and example of the holy prophet.
শীঘ্রই কিংবা বিলম্বেই হোক, নিশ্চিতই এমন এক সময় আসবে যখন সমগ্র বিশ্ববাসী স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, সকল সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় মহানবীর পূর্ণ শিক্ষা ও দৃষ্টান্তগুলির অনুসরণ করা।

---

[২৬] রিয়াদুস সালেহীন ১ম খন্ড, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, পৃষ্ঠা: ২১০

ফিলিস্তিনঃ ফিরে দেখা ইতিহাস

মোহাম্মদ আবুবকর ছিদ্দীক *

১। ভূমিকাঃ

বিশ্ব পরিস্থিতি এবং আধুনিক বিশ্বের গতিপ্রকৃতি বহুদিন থেকেই ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বড় প্রতিকূলে। এই একবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র বিশ্ব সম্প্রদায়ের মুসলিম বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি ও তৎপরতা এতটাই উৎকট ও উগ্ররূপ ধারন করেছে, যাকে কোনভাবেই আর সাধারণ শত্রুতা বলে গ্রহণ বা গণ্য করা যায় না; বলা উচিত, এটা বিশ্ব ইতিহাস ও আবহমান মানব সভ্যতার নিকৃষ্টতম কলঙ্কের কুৎসিত অভিব্যক্তি। একদিন মক্কার কাফের-মুশরিকরা ইসলাম উৎখাতের সংকল্প নিয়ে উন্মত্ত সৈন্যদল সহ ছুটে এসেছিল মদীনার দিকে, বেজে উঠেছিল খসরু কাইজারের হিংস্র রণ দামামা, ক্রুসেডের আহ্বানে প্রভঞ্জনের মত দুর্বার বেগে একদা ছুটে এসেছিল খ্রিষ্টান দুনিয়া বাগদাদের বুকে, পঙ্গপালের মত ধ্বংসযজ্ঞ চালায় হালাকু বাহিনী, দিল্লীর বুকে নৃশংস রক্ত পিপাসায় মেতে উঠে তৈমুর লং, নাদিরশা। এ সবই মুসলিম নির্যাতনের বর্বর ইতিহাস।

কিন্তু সব ইতিহাস ম্লান করে দিয়ে আজ ইসরাঈলের বুলডোজার নামে খ্যাত কট্টরপন্থী প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ ফিলিস্তিনী মুসলমানদের উপর সন্ত্রাস দমনের বাহানায় যেই নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছে ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাসে এমন ভয়াবহ দুঃসময় আর কখনো আসেনি।

সন্ত্রাস, নির্যাতন আর নির্মম মুসলিম গণহত্যা!.... নগ্ন ইয়াহুদী বর্বরতা! চলছে অবিরত এবং প্রতিনিয়ত। এ যেন আর শেষ হবার নয়। যা আজ কারবালার নিষ্ঠুরতা আর নাৎসীবাদের নৃশংসতাকেও হার মানিয়েছে। পাথরের ন্যায় হৃদয়কে করে দিয়েছে খান খান। স্বজন হারার করুণ আর্তনাদে আকাশ-বাতাস আজ প্রকম্পিত। সন্তান হারা বেদনায় জননীর হৃদয়ে নীল রক্তক্ষরণ, বাতাসে লাশের গন্ধ। কান্না আর হাহাকারের করুণ সুর। নিত্য দিন লাশ আর সাদা কফিনের প্রতিবাদ, মৌন মিছিল। হ্যাঁ; আমি সেই ফিলিস্তিন নামক জনপদটির কথাই বলছি। একটি রক্তমাখা প্রান্তর। পীচঢালা কালো পথ আজ রক্তে লাল। গোটা প্রকৃতি শোকে মুহ্যমান। মানবতা আজ ডুঁকরে কাঁদে। বিশ্ব বিবেক আজ স্তম্ভিত ওদের নিষ্ঠুরতা আর পাষণ্ডতায়।

২। ইসরাইলীদের নগ্ন হামলাঃ

ফিলিস্তিনী শহর-নগর, গ্রাম-জনপদ বর্বর ইহুদীদের ট্যাংক, বিমান, রকেট, হেলিকপ্টার, গানশীপ ইত্যাদির হামলায় আজ এক মৃতপুরী। ট্যাংকের গোলায় বিধ্বস্ত প্রেসিডেন্ট হাউজ কমপ্লেক্স। নিরীহ ও অসহায় শান্তিকামী মানুষগুলো আজ নিজভূমে পরবাসী। ওদের বর্বর হামলায় প্রতিনিয়ত রক্ত ঝরছে ফিলিস্তিনী মুসলমানদের। ওরা হোলি খেলায় মেতে উঠেছে ফিলিস্তিনি মুসলমানদের তাজা রক্ত নিয়ে। মুসলিম মা-বোনদের বুক থেকে কেঁড়ে নিচ্ছে তাদের নিষ্পাপ সন্তানদেরকে। আর এই সন্তানহারা মা-দের করুণ আর্তনাদ এবং আহাজারিতে আকাশ যেন ভারী হয়ে আসছে। নিষ্পাপ শিশুদের কান্নায় পৃথিবী আজ কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করেছে।

---

* ৭ম সেমিষ্টার দাওয়াহ এ্যান্ড ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ,

খায় বকা খায়, ধাক্কা সহ্য করে, তবুও ফ্যাল ফ্যাল করে ছল ছল চোখে তাকিয়ে থাকে শেষ করুণার প্রত্যাশায়। ঠিক তেমনি আজ ফিলিস্তিনি মুসলমানদের অবস্থা।

৩। ইসলরাঈলের প্রতি জাতিসংঘের সহযোগিতাঃ

পারমাণবিক শক্তির অধিকারী ইসরাঈল এখন গোটা মধ্য প্রাচ্যের জন্য ক্যান্সারের ন্যায় মারাত্মক হুমকী স্বরূপ। ইসরাঈলের দস্যুপনাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৈধ করার (Ligalise) জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে ব্যবহার করছে অনেকটা নির্লজ্জ পন্থায়। ফিলিস্তিনের মুসলমানদের প্রতি ইসরাঈলী বর্বরতার এক বিশেষ মুহূর্তে ওয়াকার বুশ বলেছিলেন, "শ্যারন একজন শান্তিকামী মানুষ। আত্মরক্ষার জন্য প্রতিরোধ করার অধিকার ইসরাঈলীদেরও আছে।"[১] অথচ শান্তির প্রবক্তা "জাতিসংঘ" আজ নির্বিকার, বাকরুদ্ধ। জেনিন মুহাজির ক্যাম্পে রহস্যজনক নিরবতায় সংগঠিত গণহত্যা তদন্তে একটি "তদন্ত কমিশন" পাঠানোর ঘোষণা দিলেও তথাকথিত বিশ্বসংস্থা 'UN' সন্ত্রাসী ইহুদী রাষ্ট্রের চোখ রাঙ্গাঁনীতে কুপোকাৎ। মহাসচিব কফি আনান বিশ্বের কোটি কোটি শান্তিকামী মানুষকে অবাক করে দিয়ে বাতিল করলেন "জাতিসংঘ মিশন"।

জাতিসংঘের এ সকল কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করলে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এ বিশ্ব সংস্থাটিও ইহুদীদেরই হাতের পুতুল মাত্র। বিশ্ব শান্তির নামে স্থাপিত এ প্রতিষ্ঠানটি এ যাবত ইহুদী স্বার্থেরই হেফাজত করে আসছে। নিউইয়র্কের বিখ্যাত ইহুদী আইন ব্যবসায়ী হেনরী ক্লায়েন (Henry klien) তদীয় পুস্তক Zious rule the world New york, 1984-এর এক স্থানে লিখেছেনঃ

"The United nations is Zionism. It is the super government mentioned many times in the protocals of the Learned Elders of Zion promulgated between 1897-1905."

অর্থাৎ "জাতিসংঘও ইহুদীবাদেরই নামান্তর মাত্র। ১৮৯৭ সাল থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে জারিকৃত বিজ্ঞ ইহুদীবাদী মুরুব্বীদের প্রটোকোল পুস্তকে পুণঃ পুণঃ যে সুপার গভর্নমেন্টের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এটা তাই।"[২]

বিশেষ করে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের উড়ে এসে জুড়ে বসার সুযোগদান, ১৯৪৮ সালে অন্যায়ভাবে জাতিসংঘ কর্তৃক ফিলিস্তিন বিভক্তির প্রস্তাবগ্রহণ এবং ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত আরব ইসরাইল যুদ্ধের পর ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত মুসলিম মুহাজিরদের পুণর্বাসনের প্রতি জাতিসংঘের ঔদাসীন্য ইত্যাদি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, জাতিসংঘ মূলতঃ ইহুদীদেরই কাজ করছে। হায়রে জাতিসংঘ! হায়রে জাতিসংঘ মহাসচিব!!

৪। মুসলিম নিধনে আমেরিকার সহযোগিতাঃ

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ একদিকে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের কথা বলছেন, অপরদিকে তার প্রশাসন ইসরাইলকে আরো বেশী সামরিক সহায়তা প্রদান করা সহ নানা ভাবে মদদ দিয়ে আসছে। প্রেসিডেন্ট বুশ গত ২০০২ সালের জানুয়ারী মাসেই ইসরাঈলকে ২০৪ কোটি ডলার সামরিক ও ৭৩ কোটি ডলার আর্থিক সহায়তা দান সংক্রান্ত বিলে স্বাক্ষর দিয়েছেন। আমেরিকা গোটা বিশ্বে মোট যে সাহায্য দেয় তার পাঁচ ভাগের এক ভাগই যায় ইসরাঈলে। এরপরও ইসরাঈলকে আরো সামরিকভাবে শক্তিশালি করার জন্য আমেরিকা চলতি বছরে আরো ৮০ কোটি ডলার সহায়তা দেবার পরিকল্পনা করেছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, প্রতিবছর ইসরাঈল প্রত্যক্ষভাবে ৩০০ কোটি ডলার এবং পরোক্ষভাবে আরো ৩শ' কোটি ডলার মার্কিন সাহায্য পেয়ে থাকে। এক সময় এরূপ সব সহায়তার ব্যাপারে কিছু শর্ত পালন করলেও এখন শর্ত পালন করার কোন প্রয়োজন হয়না। যার কারণে ইসরাঈল ক্রমশ বেপরোয়া হয়ে উঠছে। পৃথিবীর আর কাউকেই সে পরোয়া করতে চাচ্ছেনা।

ইসরাঈল ১৯৮১ সালে ইরাকের ওজিরাতে একটি পারমাণবিক কেন্দ্র চালু হবার আগে বিমান হামলা চালিয়ে তা বিধ্বস্ত করে দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট পিছনে থাকার ফলে ইসরাঈল এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালানোর দুঃসাহস পেয়েছে।

১৯৯৮ সালে যুক্তরাষ্ট ইসরাইলকে ২ হাজার ২শ' কোটি ডলার মূল্যের এফ-২৫১ অত্যাধুনিক ২৫টি যুদ্ধ বিমান সরবরাহ

সেনাবাহিনী ফিলিস্তিনী জনগনের উপর যে নৃশংস ও বর্বর হত্যাকান্ড চালিয়েছে তার বিরুদ্ধে
পর্যন্ত করেনি।

৫। ইসরাইলী নির্যাতনঃ

"১৯৮৭ সালে ফিলিস্তিনে গণ অভ্যূত্থান (ইন্তিফাদা) শুরু হবার পর থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ১০ বছর ইসরাইলী সেনাবাহিনী ১ হাজার ৪শ ৭৯ জন ফিলিস্তিনীকে হত্যা করেছে এবং বিধ্বস্ত করে দিয়েছে ১ হাজার ৮শ বাড়ীঘর।[৩]

"ফিলিস্তিনী ওয়েবসাইট ডটকম এর একটি পরিসংখ্যান মোতাবেক ইসরাইলী বাহিনী বিগত ১৯ মাসে নৃশংস হামলা চালিয়ে অন্তত ১২,০০০ (বারো হাজার) ফিলিস্তিনী মুসলমানকে হত্যা করেছে। শাহাদাত প্রাপ্ত এই নিরীহ মুসলমানদের মধ্যে শিশুর সংখ্যা ৪০০ এর অধিক। অন্যরা নারী-পুরুষ। অবশ্য এই সংখ্যা ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত। বর্তমানে শহীদের সংখ্যা আরো অনেক বেশী। উল্লেখ্য, ফিলিস্তিনে চলমান ইন্তিফাদা আন্দোলনের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৮০,০০০ (আশি হাজার) মুসলমান শাহাদাত বরণ করেছেন। পরিসংখ্যানটিতে আরো বলা হয় ২০০০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এই সময়ে ফিলিস্তিনী নাগরিকদের ১ শতাংশ ইসরাইলী আক্রমণে আহত হয়েছে। যার ৩ ভাগের এক ভাগই হল শিশু" [৪]

৬। ফিলিস্তিনী শিশুরা অমানবিক নির্যাতনের শিকারঃ

২০০২ সালের সেপ্টেম্বরে ইনতিফাদা শুরুর সময় থেকে ২০০২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত আগ্রাসন চলাকালে আনুমানিক ৭শ' শিশুকে হত্যা এবং ১শ ৬০ জন শিশুকে আটক করা হয়। ডিফেন্স ফর চিল্ড্রেন ইন্টারন্যাশনাল (ডি.সি.আই) একথা জানায়।

কয়েকশ শিশুকে আটকের প্রেক্ষাপটে চলতিবছর এপ্রিল মাস থেকে অসংখ্য হামলা এবং পাল্টা হামলা সংগঠিত হয়েছে। এ সময় আটক কৃতদের অধিকাংশের বয়স ১৪ বছরের ওপর। ১৯৯৮ এবং ২০০০ সালের মাঝামাঝি সময়ে শিশুদের আটকের সংখ্যা ৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। (১৯৯৮ সালের আটককৃত শিশুর সংখ্যা ৮৩ এবং ২০০০ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫২)।

উল্লেখ্য "১৯৯৯ সালে ১৩ থেকে ১৪ বছরের মধ্যবর্তী শিশুদের আটকের হার ৯.৯০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ডি সি প্রদত্ত তথ্যে একথা জানা যায়। পরবর্তীতে এই হার বৃদ্ধি পেয়েছে ২১.৮৩ শতাংশ। এছাড়া ফিলিস্তিনী শিশুদের কারাদন্ডের মেয়াদও বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৯ সালে ৪৩.৫১ শতাংশ ফিলিস্তিনী শিশু এক মাসেরও কম সময়ের কারাদন্ড ভোগ করে। এছাড়া ২০০০ সালে ৩০.৫৩ শতাংশ এক থেকে ছয় মাসের কারাদন্ড ভোগ করে"।[৫]

ডি. সি. আই., ফিলিস্তিনী মানবাধিকার সংগঠন ল' এবং বিটি সেলেস এর মতো সংস্থা এ ব্যাপারে অসংখ্য সাক্ষ্য সমাবেশ ঘটিয়েছে যে, সার্বিক অর্থেই ইসরাইলী নিপীড়ন তুঙ্গে উঠেছে। এসব তথ্যে আরো দেখা যাচ্ছে যে, কারাগারে আটক লোকজনের উপর বেদম প্রহার করা হয়। তাদেরকে খাদ্য ও ঘুম থেকে বঞ্চিত করা হয়। আটক ব্যাক্তিদের মৃত্যুর হুমকি প্রদান করা হয়। এছাড়া রয়েছে বিদ্যুৎ স্পৃষ্টকরণ এবং যৌন হয়রানির হুমকি। কারাগারে অত্যাচারের মাত্রা শিশুদের শুধু শারীরিক ক্ষতিই করেনা বরং ঘোরতর মানসিক বিপর্যয়ের কারণও হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে তাদেরকে এক জায়গা থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়। এর ফলে বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন শিশু ক্রমান্বয়ে নিঃসঙ্গতায় আক্রান্ত হয়।

যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ইউ, এম, এ, আই, ডি)র অর্থায়নে এবং তাদের উদ্যোগে শুরু করা এক গবেষণার প্রাথমিক ফলাফলে পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকায় বসবাসরত ফিলিস্তিনীদের মধ্যে অপুষ্টির কারণে একটি "সুনির্দিষ্ট মানবিক জরুরী অবস্থা"র ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

"জেরুজালেমের আল কুদস বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্লোবাল ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টিং গ্রুপ এর সমন্বয়ে কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল এবং জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা থেকে সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গত ৫ই আগষ্ট একটি সমন্বিত পুষ্টিগত পরিমাপ বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যাদি প্রকাশ করা হয়। এই জরিপে দেখা গেছে যে, ৫ বছরের কম বয়সী শতকরা ৯.৩

যে, এক-তৃতীয়াংশ ফিলিস্তিনী শিশু বর্তমানে অপুষ্টির শিকার। গবেষণা পত্রের তথ্য অনুযায়ী এই হার একটি 'স্বাভাবিক পুষ্টিপ্রাপ্ত জনসংখ্যার' চাইতে চারগুণ বেশী। এভাবে প্রায় ১০ শতাংশের অধিক ফিলিস্তিনী মারাত্মক অপুষ্টিতে ভুগছে।"(৬)

বর্তমান ইসরাইল রাষ্ট্রের ইতিকথাঃ

ইহুদী সম্প্রদায় খন্ড বিখন্ড হয়ে যখন শতধাবিভক্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে তখন অন্যান্য ধর্ম বিশেষ করে খৃষ্টান ধর্ম ও ইসলামের প্রচারে অনেক ইহুদী খৃষ্টান অথবা মুসলিম হয়ে যায়। এ বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ইহুদী সম্প্রদায় নিজেদেরকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয় এবং নানাবিধ বিধি নিষেধের গন্ডী খাড়া করে অন্যান্য ধর্মের প্রচারকার্যের প্রতিরোধ করতে প্রয়াস পায়। এ কারণে এরা মানুষের ঘৃণার পাত্র হয়ে দাড়ায়। তাই খৃষ্টান শাসিত দেশগুলোতে এরা নাগরিক মর্যাদা লাভ করতে পারেনি।

ফরাসী বিপ্লব ইহুদীদের জন্য মুক্তির পয়গাম বয়ে আনে। ইহুদীদের রচিত বিশ্বব্যাপী চক্রান্তের পরিকল্পনা পুস্তক থেকে জানা যায় যে, ফরাসী বিপ্লবের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ইহুদী ষড়যন্ত্রকারীদের হাত ছিল। এ বিপ্লবের ফলে ঊনিশ শতকের শেষাংশে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানী, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, নরওয়ে, অষ্ট্রিয়া এবং সুইজারল্যান্ড ইহুদীদের পূর্ণ নাগরিক অধিকার দান করে। কিন্তু পূর্ব ইউরোপে ইহুদীদের তখনও ঘৃণার চোখে দেখা হত এবং সেখানে আযাদীর সুখ থেকে এরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল। অষ্ট্রিয়ায় ইহুদী সাংবাদিক 'থিউডর হার্টজেল' সর্ব প্রথম ইহুদীদের মধ্যে আযাদীর প্রেরণা সৃষ্টি করে। এজন্য তাকে ইহুদীবাদের জনক বলা হয়।

প্রথমে থিউডর হার্টজেল ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র কায়েম করার কোন পরিকল্পনা করেনি। বরং সে ইংরেজদের পরামর্শে পূর্ব আফ্রিকা একটি আযাদ ইহুদী রাষ্ট্র স্থাপন করতে আগ্রহী ছিল। কিন্তু অন্যান্য ইহুদী নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার পর তার মনোভাব পরিবর্তিত হয় এবং তার লোলুপ দৃষ্টি ফিলিস্তিনের প্রতিই আকৃষ্ট হয়।

হার্টজেল তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য একদিকে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের শাসকগণের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করে দেয় এবং অপরদিকে তুরস্কের সুলতান আব্দুল হামিদ (দ্বিতীয়) এর সাথে দেখা করে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের বসবাসের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। স্বভাব সুলভ পন্থায় ইহুদীদল সুলতানকে ৫ কোটি পাউন্ড অর্থ সাহায্য পেশ করে তুর্কী খেলাফতের অর্থনৈতিক সঙ্কট দূরীকরণের ইচ্ছা প্রকাশ করে। সুলতান আব্দুল হামিদ এদের অসদুদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ইহুদীদের আবেদন নাকচ করে দেন এবং স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, তাঁর জীবদ্দশায় ইহুদী সম্প্রদায় কখনও ফিলিস্তিনে বসবাসের অনুমতি লাভ করতে পারবেনা।

থিউডর হার্টজেল সুলতান আব্দুল হামিদের নিকট থেকে নিরাশ হয়ে পুনরায় ইংরেজদের সঙ্গে সলাপরামর্শে লিপ্ত হয় এবং ১৮৯৭ সালের ২৯শে আগষ্ট সুইজারল্যান্ডে ইহুদী কংগ্রেসের বৈঠক আহবান করে। উক্ত বৈঠকে নিম্নরূপ ফয়সালা গৃহীত হয়।

(১) ফিলিস্তিনকে ইহুদীরাজ্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে ইহুদীদের সুপরিকল্পিত উপায়ে কৃষি ও ব্যাবসা ক্ষেত্রে অগ্রসর করানো।

(২) সমগ্র দুনিয়ার ইহুদীদের সংঘবদ্ধ করার জন্য আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় পর্যায়ে সংগঠন কায়েম করানো।

(৩) ইহুদীদের মধ্যে জাতীয় চেতনা ও অনুভূতি সৃষ্টিকরার উদ্দেশ্যে বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ।

(৪) আর উপরের তিনদফা কর্মসূচীর সঙ্গে ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র কায়েম করার জন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টা তদবীর জারী রাখা।

সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে ইহুদী সম্প্রদায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানাবিধ চক্রান্তের জাল বিস্তার করে। একদিকে আরব ও অনারবদের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির মাধ্যমে তুর্কী খিলাফতের অধীনে যে সব আরব অফিসার ও সৈন্য নিয়োজিত ছিল তাদের মনে তুরস্কের সুলতানদের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করার কাজ ইংরেজ ও ইহুদী সম্প্রদায় যৌথভাবে শুরু করে। আঞ্চলিকতাবাদ ও ভাষাগত জাতীয়তার সস্তা ও মুখরোচক শ্লোগানে মুসলমানদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে তাদের দুর্বল করার এ প্রচেষ্টা নব্য সমাজকে সহজে আকৃষ্ট করে এবং এর ফলে আরব তুর্কী সম্পর্ক বিনষ্ট হয়।

ক্রীড়নক হিসেবে মরণপণে কাজ করেছেন মাত্র।

তুর্কীর খিলাফত মুসলিম জাহানের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের একটা কেন্দ্র ছিল। সমগ্র মুসলিম জাহান এ খিলাফতকে কেন্দ্র করেই পরস্পরের প্রতি এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অনুভব করতো। ইংরেজ ও ইহুদী ষড়যন্ত্রের ফলে ফিলাফত উচ্ছেদ হয়ে গেল। এবং মুসলিম জাহানের ঐক্যসূত্র ছিন্ন হল। তারপর থেকে মুসলমান দেশগুলো পরস্পরের সংগে ঝগড়া-বিবাদ করে নিজেদেরকে ইহুদী ও খৃষ্টান চক্রান্তের খপ্পরে নিক্ষেপ করে।

কামাল পাশা ২৫,০০০ ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। খ্যাতনামা আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদদেরকেও পৈশাচিক আনেন্দে হত্যা করে কামাল পাশা 'গাজী' উপাধী ধারণ করেন। নিহত ব্যক্তিদের একটি মাত্র 'অপরাধ' ছিল। আর তা হলো ইসলামী আদর্শের প্রতি তাদের অটল বিশ্বাস। কামাল পাশা ইসলামী ইবাদত, ইসলামী রাজনীতি ও আদব-কায়দা সব কিছুই নিষিদ্ধ করে। এমনকি আরবী ভাষায় কুরআন শরীফ পাঠ করাও অপরাধ বিবেচনা করে।

এভাবে ইসলাম বিরোধী ও ইহুদী প্রভাবিত পরিবেশ সৃষ্টি হবার ফলে মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদীদের রাষ্ট্র স্থাপনের পথ প্রশস্ত হতে থাকে। আরব অনারব বিদ্বেষে মুসলিম শক্তি দুর্বল হয়ে যায় এবং ফ্রিম্যাসন আন্দোলনের প্রভাবে কামাল পাশার ইসলাম বিরোধী তৎপরতা ইহুদীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ প্রশস্ত করে দেয়।

ইহুদী চক্রান্ত একদিকে মুসলমানদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ সৃষ্টি ও নানাবিধ ছদ্ম নামে ইসলাম বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে যুব সমাজকে ইসলামের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন করে তোলে। অপর দিকে ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র কায়েম করার আন্দোলনও চালিয়ে যেতে থাকে। ১৯১৬ ঈসায়ী সালে ইহুদীদের বিশ্ব সংস্থা "ওয়ার্লড জাইওনিষ্ট অর্গানাইজেসন" (World zionist organisation) বৃটেনের পররাষ্ট্র দফতরের সঙ্গে আলোচনায় লিপ্ত হয় এবং এর ফলে ১৯১৭ সালে বৃটিশ সরকার কুখ্যাত "ব্যালফোর" ঘোষণায় ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জাতীয় আবাসভূমি স্থাপনের দাবী সমর্থন করে। 'ব্যালফোর' ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপ:

"আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, মহামান্য বৃটিশ সরকার ইহুদী আন্দোলনের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি পোষণ করে এবং ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জাতীয় আবাসভূমি স্থাপনের দাবী সমর্থন করে। এতদসঙ্গে আমি এ কথাও ঘোষণা করছি যে, বৃটিশ সরকার ইহুদীদের লক্ষ অর্জনের জন্য সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করবে"। তদানীন্তন বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী আর্থার জেমস্ 'ব্যালফোর' ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন। ১৯৩৭ সালে রয়েল ফিলিস্তিন কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দানকালে তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী একথা স্বীকার করেন যে, ১ম বিশ্বযুদ্ধে ইহুদী সম্প্রদায় মিত্র শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করার পুরস্কার স্বরূপ পূর্ব নির্ধারিত 'গুপ্তচুক্তি' মোতাবেক বৃটিশ সরকার ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জাতীয় আবাসভূমি স্থাপনের আন্দোলন সমর্থন করে। অবশ্য উক্ত ঘোষণায় ফিলিস্তিনে ইহুদীদের রাষ্ট্র স্থাপনের কথা উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু ইহুদী সম্প্রদায় এ ঘোষণাটিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদীদের নিয়ে এসে ফিলিস্তিনে জড়ো করতে শুরু করে। এদিকে ১৯২৩ সালে জাতিপুঞ্জ ফিলিস্তিনকে বৃটেনের তদারকিতে সমর্পন করে।

ব্যালফোর ঘোষণার পর ইহুদীদের ফিলিস্তিনে আমদানীর যে অভিযান শুরু হয়েছিল, ফিলিস্তিনে বৃটেনের তদারকি প্রাপ্তিতে সে অভিযান আরো জোরদার হল। ১৯১৮ সালে ফিলিস্তিনে মুসলমানদের মোট সংখ্যার এক দশমাংশ ছিল ইহুদী এবং এদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েক হাজার। পরবর্তী বছরগুলোতে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের সংখ্যা নিম্নহারে বেড়ে যায়ঃ

১৯১৯ সাল থেকে	১৯২৩ সাল পর্যন্ত	৩৫,০০০
১৯২৩ সাল থেকে	১৯৩১ সাল পর্যন্ত	৮১,০০০
১৯৩১ সাল থেকে	১৯৪১ সাল পর্যন্ত	২,৫০,০০০

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর লক্ষ লক্ষ যুদ্ধ বিধ্বস্ত গৃহহীন লোকদের পুনর্বাসনের সমস্যা দেখা দেয়। এদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক ইহুদীও ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মিঃ ট্রুম্যান তার সমসাময়িক বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এট্‌লীর সঙ্গে পত্রালাপ করে ফিলিস্তিনে এক লক্ষ যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইহুদীদের বসবাসের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেন।

বারজন সদস্যের এ কমিটি ওয়াশিংটন, লন্ডন এবং কায়রো সফর করে ইহুদী, মুসলিম ও খৃষ্টানদের বক্তব্য শোনেন। ১৯৪৬ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে যুগপৎ লন্ডন ও ওয়াশিংটন থেকে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ঐ রিপোর্টে ফিলিস্তিনে এক লাখ ইহুদীর বসবাসের ব্যবস্থা করার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করা হয়। তবে কমিটির সুপারিশে স্পষ্ট ভাষায় এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ফিলিস্তিনে ইহুদী ও মুসলমান কেউ কারো উপর প্রধান্য বিস্তার করতে পারবেনা। বরং ইহুদী, মুসলমান ও খৃষ্টান এ তিন জাতিরই ফিলিস্তিনে সমান অধিকার থাকবে।

রিপোর্টের শেষাংশে যে শর্তটি উল্লেখ করা হয় তার জন্য ইহুদী সংগঠনগুলো এ রিপোর্টের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকায় বিপুল সংখ্যক ইহুদীর বসবাসের ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান আমেরিকায় ইহুদীদের স্থান দিতে এক সময় রাজীও হয়েছিলেন। কিন্তু ইহুদী সম্প্রদায় এ সব প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। এরা বৃটেনের তদারকির সুযোগে সমগ্র আরব জাহানের প্রতিবাদ সত্ত্বেও দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদীদের ফিলিস্তিনে আনয়নের অভিযান আরো জোরদার করে দেয় এবং মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর পরই ছয়লাখ ইহুদীকে ফিলিস্তিনে এনে বসানো হয়।

এবার ইহুদী সম্প্রদায় ফিলিস্তিনে মজবুত হয়ে বসার ব্যবস্থা করে। বৃটিশের ছত্রছায়ায় ফিলিস্তিনে "হেগনা ও ইরগুন" নামে দু'টি সন্ত্রাসবাদী সশস্ত্র ইহুদী সংগঠন কায়েম হয় এবং এরা মুসলমানদের উপর নির্বিচারে জুলুম নির্যাতন শুরু করে দেয়। ফলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও খুন-খারাবী চরম আকার ধারণ করে। বৃটিশ সরকার অবশেষে বিষয়টি জাতিসংঘের নিকট পেশ করে দেয়।

১৯৪৭ সালের ২৮শে এপ্রিল তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয়। ফিলিস্তিনের অবস্থা তদন্ত করে ঐ বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের নিকট এ বিষয়ে রিপোর্ট পেশ করার জন্য ঐ অধিবেশনেই এগার সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সদস্য ছিল অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, চেকোশ্লোভাকিয়া, গুয়েতমালা, ভারত, ইরান, নেদারল্যান্ড, পেরু, সুইডেন, উরুগুয়ে ও যুগোশ্লোভিয়া। ইহুদী জাতি ঐ সময় চিৎকার করে ঘোষণা করতে শুরু করে যে, জাতিসংঘ যে সিদ্ধান্তই করুক না কেন, ফিলিস্তিনে ইহুদীদের স্বাধীন রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোন প্রস্তাবেই এরা সম্মত হবেনা। যথা সময়ে কমিটি রিপোর্ট প্রদান করে। ঐ রিপোর্টে কমিটির সদস্যগণ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে দু'ধরনের সুপারিশ করেছিলেন। কানাডা, চেকোশ্লোভাকিয়া, পেরু, গুয়েতমালা, নেদারল্যান্ড ও উরুগুয়ে ফিলিস্তিনকে বিভক্ত করে দু'টি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করার সুপারিশ করে। আর ভারত, যুগোশ্লাভিয়া ও ইরান একটি ফেডারেল রাষ্ট গঠন করার সুপারিশ করে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ এ উভয় প্রস্তাব একটি এড্হক কমিটির নিকট সোপর্দ করে দেয়। এ কমিটিতে গুয়েতমালা ও উরুগুয়ে ফিলিস্তিনকে বিভক্ত করার জন্য জোরদার ওকালতি শুরু করে। এদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য বর্তমান ইসরাইল রাষ্ট্রে গুয়েতমালা ও উরুগুয়ের নামে অনেক রাস্তাঘাটের নামকরণ করা হয়েছে। পাকিস্তানের প্রতিনিধি এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধীতা করেছিলেন। তুমুল বিতর্কের পর ভোট গ্রহণ করা হয় এবং ২৯-২৩ ভোটে ফিলিস্তিন বিভক্তির প্রস্তাব পাশ হয়ে যায়। রাশিয়া ও আমেরিকা উভয়েই বিভাগের পক্ষে ভোট দেয়।

কিন্তু সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের ভোটে প্রস্তাবটি উত্তীর্ণ না হলে তা কার্যকরী হয় না বিধায় ১৯৪৭ সালের ২৬শে নভেম্বর তারিখে সাধারণ পরিষদে প্রস্তাবটি সম্পর্কে বিবেচনা করা হবে বলে স্থির করা হয়। ঐ তারিখ পর্যন্ত অবস্থা ইহুদীদের অনুকূলে ছিলনা। তাই বৃহৎ শক্তিগুলো নানা প্রকার টাল বাহানা করে ভোট গ্রহণে বিলম্ব করতে থাকে। আর অপরদিকে ইহুদী নেতাগণ পৃথক পৃথকভাবে জাতিসংঘের সদস্যের সঙ্গে দেখা করে অবস্থা অনুকূলে আনয়নের জন্য প্রবল চেষ্টা শুরু করে দেয়। আমেরিকাও ঐ সময় ইহুদীদের অনুকূলে ভোটদানের জন্য সদস্য দেশগুলোকে চাপ দিতে থাকে।

২৯শে নভেম্বর পর্যন্ত ইহুদীদের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায় এবং ঐ দিনই ৩৩-১৩ ভোটে ফিলিস্তিন বিভক্তের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১০টি দেশ ভোটদানে বিরত এবং একটি দেশ পরিষদে অনুপস্থিত ছিল। প্রস্তাব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই পরিষদে হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায় এবং গোলামালের মধ্যেই আরব রাষ্ট্রগুলো এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে তাদের অস্বীকৃতি ঘোষণা করে

মুসলমান। পতপত করে উড়বে মুসলমানদের বিজয়ের পতাকা।

তথ্যসূত্রঃ

১। দৈনিক সংগ্রাম, বৃহস্পতিবার, ২৬শে বৈশাখ ১৪০৯ঃ ৯ই মে ২০০২ পৃঃ ৭ "বিশেষ মুহূর্তে বুশের উক্তি" নামক শিরোনাম থেকে গৃহীত।

২। ইহুদী চক্রান্ত (বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্রের ঐতিহাসিক দলীল) সম্পদনায়; আব্দুল খালেক (প্রাক্তন দৈনিক ইত্তেহাদ সম্পাদক) প্রকাশনায়ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় সংস্করন ডিসেম্বর ১৯৯৭ পৃঃ "৪৩"।

৩। দৈনিক ইনকিলাব, শনিবার ২২ আষাড় ১৪০৯. ৬ জুলাই ২০০২ ১১তম পৃ। "ইসরাইলের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার ফিলিস্তিনের মুসলমানরা" নামক শিরোনাম থেকে গৃহীত।

৪। দৈনিক সংগ্রাম, বৃহস্পতিবার ৯ইমে ২০০২, পৃ: ৭: "যুগে যুগে মুসলিম গণহত্যা: একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র" শীর্ষক শিরোনাম থেকে গৃহীত।

৫। প্রাগুক্ত, ৩য় পৃষ্ঠা। "ফিলিস্তিনী শিশুরা অকথ্য নির্যাতনের শিকার" নামক শিরোনাম থেকে গৃহীত।

৬। প্রাগুক্ত, ১৪ই আগষ্ট. ৩য় পৃষ্ঠা, "প্রায় ১০ শতাংশ ফিলিস্তিনী শিশু মারাত্মক অপুষ্টিতে ভুগছে" নামক শিরোনাম থেকে গৃহীত।

৭। (i) Revolutions and Military Rule in the Middle East by M. Haddad.
(ii) Rise of Nationality in the Balkans, by R.W. Setin-Watson.
(iii) The Emergence of Modern Turky. by Be Bernad Lewis.
(iv) ATATURR-The returnth of NATION. by lord kirnass.

৮। ইহুদী চক্রান্ত (বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্রের ঐতিহাসিক দলিল) পৃঃ ২৫-৩২

৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।

যুগ পরিক্রমায় নারী

মোঃ আশেকুল্লাহ*

সুচনা: কোন কালে একা হয়নি 'ক' জয়ী পুরুষের তরবারি
প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি যুগিয়েছে বিজয় লক্ষী নারী।[১]

পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকে শুরু করে অদ্যবধি পর্যন্ত পৃথিবীতে মানুষের যত কল্যাণ, অকল্যাণ, জয়-পরাজয়, সুখ, দুঃখ আনন্দ-বেদনা, গর্ব অহঙ্কার যা কিছু সংঘটিত হয়েছে অনুসন্ধান করে দেখা যাবে তার পিছনে রয়েছে, নারীর সম অংশিদারিত্ব। কবির ভাষায়:

বিশ্বের যা কিছু সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।
দিবসে দিয়েছে শক্তি সাহস, নিশীথে হয়েছে বধু
পুরুষ এসেছে মরুতৃষা লয়ে নারী যুগিয়েছে মধু।[২]

কিন্তু নারীর প্রতি প্রাচীন গ্রীক রোমান ও সমকালীন বিশ্বের বর্বর আচরন প্রমান করে কবির একথা শুধুমাত্র জল্পনা কিংবা ভূল ধারনা।

প্রকৃতপক্ষে কাল পরিক্রমায় জাতিভেদে নারীকে যখন অবহেলা ও নিগ্রহের বস্তু হিসাবে দেখেছে এবং যাবতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করে শুধুমাত্র ভোগের সামগ্রী ভেবেছে। একমাত্র ইসলাম-ই তখন সেই প্রাচীন ও পাশ্চাত্য ধারনার মূলে কুঠারাঘাত হেনে নারীকে ফিরিয়ে দিয়েছে তার প্রাপ্য অধিকার। তাই ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা আলোচনার পূর্বে যুগে যুগে নারীদের অবস্থা কেমন ছিল তা অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোকপাত করার প্রয়োজন অনুভব করছি।

গ্রীসে নারী

প্রাচীন ইতিহাস থেকে যতটুকু জানা যায়, গ্রীক সমাজের নারীকেই প্রথম সভ্য নারী বলা চলে। তারা তাদের প্রয়োজনীয় কাজ বাড়ীতেই সমাধা করত। অপরদিকে গ্রীক তাহযীব-তামাদ্দুন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় এতদূর এগিয়ে গিয়েছিল যে, যার উপর ভিত্তি করে অনেক সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু এত উন্নতি সত্ত্বেও তাদের সমাজে নারীর স্থান ছিল অনেক নীচে। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে তারা ছিল বঞ্চিত। সমাজে তারা এত ঘৃনিত ছিল যে, তাদেরকে শয়তানের নোংরা চেলা-চামুন্ডা মনে করা হত।[৩] নারীকে মানবতার জন্য একটা বোঝা মনে করা হত। সেবিকা হিসাবে পরিবারের মানুষের সেবা করা ছাড়া আর কোন মূল্যায়ন তারা পেতনা।

তারা বলত অগ্নিদগ্ধ হওয়ার এবং সর্প দংশনের প্রতিকার সম্ভব, কিন্তু নারীর কুপ্রভাব ও অকল্যাণের প্রতিকার সম্ভব নয়।[৪] গ্রীক সমাজের নারীরা সর্বক্ষেত্রে উপেক্ষিত ছিল। যেখানেই নারীর নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন উঠতো সেখানেই তারা বঞ্চিত হত। গ্রীকরা নারীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছিল। বিয়ের ব্যাপার সম্পূর্ণ পিতার এখতিয়ারাধীন ছিল। পিতা যেখানেই ইচ্ছা করতেন সেখানেই তাকে বিবাহ দিতেন। সেই সমাজে বিবাহ ছিন্ন করার সামান্য অধিকারটুকুও নারীদের ছিলনা। আইনগত দিক দিয়ে নারী ছিল সংসারের অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির মত। বাজারে তার বেচাকেনা চলতো।[৫]

একজন গ্রীক সাহিত্যিক বলেনঃ দুইটি ক্ষেত্রে নারী পুরুষের জন্য আনন্দের কারণ। এক: বিয়ের দিন দুই: তার মৃত্যুর দিন।[৬]

---

* ৭ম সেমিষ্টার, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক ষ্টাডিজ।

অধিকার, বহিস্কার করার অধিকার, শাস্তি দেয়ার অধিকার, এমন কি হত্যা করার অধিকার। পরবর্তীতে এ অধিকার পিতা হতে স্বামীর হাতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। এরপর স্বামীর কর্তৃত্ব এতদূর বিস্তৃত হয়েছিল যে, সে ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে যে কোন সময় হত্যা করতে পারতো।

প্রাচীন রোমান সমাজে এরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তাকে পরিবারের অন্তর্ভূক্ত করতে পিতা বাধ্য থাকত না। শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর তাকে পিতার পায়ের কাছে রাখা হত। পিতা যখন তাকে ধরে উপরে তুলতো তখন প্রমাণিত হত যে সে তাকে আপন পরিবারের অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছে। অন্যথায় ধরে নেয়া হত যে পিতা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কন্যা শিশুর আদৌ কোন মালিকানা অধিকার থাকতো না। কন্যা সন্তান কোন উপার্জন করলেই সেটা পরিণত হত পরিবার প্রধানের একটা বাড়তি সম্পত্তিতে।[৭] এমন কি মেয়ের বয়োঃপ্রাপ্তি কিংবা বিয়ে হয়ে গেলেও তার কোন মালিকানা থাকত না।

আরবে নারী

আরব সমাজে সীমিত সংখ্যক অভিজাত পরিবার ছাড়া সমগ্র আরবে নারীর অবস্থান এত নিম্নে নেমে এসেছিল যে তা বর্ণনা করতে গেলে সর্বপ্রথমে বলতে হবে, আরবরা নারীদেরকে যাবতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল, তাদের একদিকে যেমন ছিলনা সম্পত্তির অধিকার, অনুরূপভাবে বিবাহ কিংবা তালাকের ক্ষেত্রেও তাদের কোন অধিকার ছিল না। একজন পুরুষ যত খুশি বিবাহ করতে পারতো এবং বিচ্ছেদ ঘটাতে পারতো। কিন্তু নারীরা এ অধিকার থেকে ছিল সম্পূর্ন বঞ্চিত। পিতা মারা যাওয়ার পর সৎ মাকে বিবাহ করার মত জঘন্য ঘটনাও আরবদের মাঝে প্রচলিত ছিল। কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহন করাকে তারা অভিশাপ ও লাঞ্চনাকর মনে করত। ফলে জীবন্ত কন্যা সন্তানকে মাটিতে পুঁতে ফেলতেও কোনরকম দ্বিধা করতনা। এরশাদ হচ্ছে: যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে।[৮]

কন্যা সন্তানকে তারা লজ্জাজনক ও মর্যাদা হানিকর মনে করত। পবিত্র কুরআন তাদের মনোবৃত্তি কে অতি সুন্দরভাবে চিত্রাংকন করেছে।

"তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণের সু সংবাদ দেয়া হয় তখন তাদের চেহারা কৃষ্ণবর্ণ ধারন করে এবং মনোকষ্টে তার হৃদয় মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। লোকচক্ষু থেকে সে নিজেকে আড়াল করে চলতে থাকে। কারণ এ দুঃসংবাদ লাভের পর কি করে সে মানুষকে মুখ দেখাবে। সে তখন ভাবতে থাকে লাঞ্চনা বহন করে তাকে জীবিত থাকতে দেবনা, মাটির নীচে পুঁতে ফেলবো।[৯]

হজরত উমর রাঃ বলেন: আল্লাহর শপথ, জাহেলী যুগে আমরা নারীদেরকে কোন মর্যাদাই দিতামনা। তারপর আল্লাহ কুরআন নাযিল করলেন, তাদের ব্যাপারে নির্দেশনা দিলেন এবং যা কিছু অংশ নির্ধারণ করার দরকার ছিল তা করলেন।

ইয়াহুদী ধর্মে নারী

বণী ইসরাইলের উপর আল্লাহপাক তাওরাত অবতীর্ণ করে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেও তারা সে কিতাবকে সংরক্ষন করতে পারেনি। কালের আবর্তনে তা বিলোপ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ইয়াহুদী পন্ডিতগণ তাদের মনগড়া তাওরাত রচনা করে, যেখানে নারীকে কোন রকম মূল্যায়ন করা হয়নি। বরং তাকে যাবতীয় অপরাধ প্রবনতা ও পাপের উৎস হিসাবে দেখানো হয়েছে।

ইয়াহুদী ধর্ম আমাদের সামনে এ ধারণা পেশ করে যে, পুরুষ সৎ স্বভাব বিশিষ্ট ও সৎকর্মশীল এবং নারী বদ স্বভাব বিশিষ্ট ও ভন্ড।[১০] কারণ হিসাবে তারা উল্লেখ করেন মানব জাতির পিতা হযরত আদম (আঃ) জান্নাতে মহা সুখের জীবন কাটাচ্ছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন আল্লাহর অনুগত বান্দা। কিন্তু তার স্ত্রী হযরত হাওয়া(আঃ) তাঁকে সর্বপ্রথম আল্লাহর অবাধ্য হতে প্ররোচিত করলো এবং তাকে এমন একটি ফল খাওয়ালো যা খেতে আল্লাহ তাকে নিষেধ করেছিলেন। এছাড়া ইয়াহুদীরা সচরাচর নারীকে অভিশাপ মনে করে থাকে। তাওরাতে বলা হয়েছেঃ স্ত্রী লোক মৃত্যুর চেয়েও মারাত্মক। আল্লাহর কাছে যে ব্যক্তি সৎ, সে স্ত্রী লোকের কবল থেকে আত্মরক্ষা করে থাকে। একহাজার জনের মধ্যে

বঞ্চিত ছিল। ছেলের বর্তমানে স্ত্রী কিছুই পেতনা। নারীর দান প্রতিদান বা সাক্ষ্য দেয়ার ব্যাপারে কোন অধিকারই ছিল না। নারীর শপথও নিরর্থক বলে বিবেচিত হতো।

ইয়াহুদীদের কিতাব, "আহাদ নামায়ে আতীক" গ্রন্থে নারী সম্পর্কে লিখিত আছেঃ নারী সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য পুরুষকে আরাম পরিবেশন করা। নারী পাপের প্রস্রবন, পুন্য কাজ করার কোন যোগ্যতা নারীর মধ্যে নেই বলে সে সম্মানের যোগ্য হতে পারেনা।[১২]

তালাকের ব্যাপারেও এ ধরনের হৃদয়হীনতার বহু প্রমান পাওয়া যায়। নারীর ছোট ছোট দোষ ত্রুটিতো দুরের কথা, দোষ ত্রুটি না পেয়েও পাপহীন তালাকের অধিকার পুরুষদের জন্য ছিল। আরো বিপদ এই যে, ইয়াহুদী সমাজে তালাক প্রাপ্তা নারীকে কেহ বিবাহ করতে পারবেনা। তাই প্রত্যেক পুরুষ ইবাদতের সময় এই বলে দোয়া করত "হে আল্লাহ তুমি যে আমাকে নারী করে সৃষ্টি করনি এজন্য তোমার শুকরিয়া ও তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

পাদ্রীদের মতে, "সতী নারীর চেয়ে পাপিষ্ট পুরুষ শতগুনে ভাল।[১৩]

মদীনায় এক ইয়াহুদী বাদশা আইন করেছিল যে, বিবাহের পর স্বামীর নিকট গমনের পূর্বে বাধ্যতামূলকভাবে তাকে এক রাত্রি তার নিকট কাটাতে হবে।[১৪]

খ্রীষ্টধর্মে নারী

পরিবর্তনীয় খ্রীষ্ট ধর্মে নারী জাতিকে যতটুকু নিম্নে নামানো সম্ভব তা করতে সামান্য কার্পন্যও করেনি। যা নিচের বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

হে নারীকুল তোমরা জাননা যে, তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন হাওয়া। তোমাদের জন্য আল্লাহর যে ফতোয়া ছিল তা যদি বর্তমান থাকে তাহলে উক্ত অপরাধ প্রবণতাও তোমাদের মাঝে আছে। তোমরা তো শয়তানের দরোজা।[১৫] তোমরা সহজেই পুরুষদের ধ্বংস করেছো।

মোস্তাক নামক এক যাজক বলেন: "নারী এক অনিবার্য আপদ। এক লোভনীয় বস্তু। পরিবার ও সংসারের জন্য হুমকি। মোহনীয় মোড়কে আবৃত বিভীষিকা।"[১৬]

খ্রীষ্টানরা দুটি কারণে নারী জাতির প্রতি ক্রোধান্বিত। প্রথম কারণ হচ্ছে, নারী নিজে নিষিদ্ধ ফল খেলো আবার পুরুষকেও খাওয়ালো, তারই কারণে পুরুষকে জান্নাত বঞ্চিত হতে হলো। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে নারীর পাপের প্রায়শ্চিত্যের জন্যই হযরত ঈসা আঃ এর মতো একজন শুদ্ধ মানুষকে শুলে চড়তে হলো।

অর্থাৎ তারা হযরত মরিয়ম (আঃ) এর উপর অপবাদে আরোপ করেছে। নাউযুবিল্লাহ।

সেন্ট বার্নাড, সেন্ট সিপ্লিল ও সেন্ট জিরাম এই সকল খ্রীষ্টান পন্ডিতরা নারী মর্মে লিখেছেনঃ

নারী শয়তানের শক্তি, অজগর সাপের মত রক্ত পিপাসু, তার মধ্যে সাপের বিষ নিহিত আছে। নারী সমস্ত নৈতিক ত্রুটির মূল উৎস, শয়তানের বাদ্যযন্ত্র, দংশন্মোখ বিচ্ছু এবং প্রকৃত পক্ষেই আমাদের মনের উপর শয়তানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় নারী শয়তানের সাহায্য কারিণী।[১৭]

অপর একজন খৃষ্টান পন্ডিতের মতে নারী সমস্ত অত্যাচাবের মূল, তার কাছ থেকে দুরে থাকাই সমীচীন। নারী পুরুষের মনে লালসা উদ্রেককারী। ঘর সংসারের অশান্তির কারণ, তারা নিতান্তই দেহ সর্বস্ব, তাদের না আছে প্রাণ না প্রকৃত মর্যাদা।[১৮]

হিন্দু ধর্মে নারী

হিন্দু ধর্ম মানব রচিত ও পরিবর্তনশীল। এই ধর্ম প্রাচীনত্বে ও খ্যাতিতে প্রসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে কোন রকম মনোযোগ দেয়নি।

সতীদাহের মত নির্মম অমানুষিক বিধান হিন্দু ধর্মেরই দান। পুরুষ একই সময়ে একাধিক বিয়ে অথবা স্ত্রী বিয়োগের পর বিয়ে করার সুযোগ থাকলেও নারী স্বামী হারানোর পর বিয়ে করা তো দুরের কথা তার বেঁচে থাকার অধিকারটুকু এ ধর্মে নাই। বরং তাদের বিশ্বাস স্বামীর সাথে জীবন্ত দগ্ধ না হলে তার স্বর্গই লাভ হবেনা। যদি কোন নারী কোন প্রকারে এই সতীদাহ থেকে বেঁচেও যেত তবে, সমাজে পরিবারে কিংবা আত্মীয় স্বজনের কাছে তার কোন রকম মর্যাদা ছিলনা। ১৭শ

ভারতের বেশ কিছু অঞ্চলে একটি বিশেষ গাছের গোড়ায় প্রতিবছর একটি করে যুবতী মেয়েকে বলি দেয়ার রেওয়াজ চালূ আছে।[২০]

হিন্দু ধর্মে নারীর স্থান নিরূপনে মনুঃর কিছু বাণী নিম্নে তুলে ধরা হল।

–(মনু ৯/২) নারী স্বাধীন হওয়ার উপযুক্ত নয়।

-(মনু ৫/৪) নারী জীবনে কখনো নিজ ইচ্ছামত কাজ করতে পারবেনা।

–(মনু ৫/২৭) বাবা মেয়েকে যার সাথে বিয়ে দেবেন সেখানেই তাকে আজীবন থাকতে হবে এবং স্বামীর মৃত্যুর পর অন্য কারো স্ত্রী হতে পারবেনা।

–,(মনু ৫/৫১) আরো বলা হয়েছে শয্যা প্রিয়তা, অলংকারাসক্তি, পাপালিপ্সা, আত্মগর্ব, রাগ, একগুয়েমি ও বিরক্তিকরণ নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, গর্হিত কাজ করা তাদের অভ্যাস, মিথ্যা বলা তাদের স্বভাবজাত কাজ।[২১]

গীতায় বলা হয়েছে, "স্ত্রীলোক, বৈশ্য, শুদ্র অথবা পাপযোনি সমস্ত অন্তজ জাতি, তারাও আমার আশ্রয় নিলে নিশ্চই পরম গতি প্রাপ্ত হন। [২২]

মহাভারতে বলা হয়েছে "নারী অশুভ, সকল অমঙ্গলের কারণ, কন্যা দুঃখের হেতু।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেন, "নারীর চেয়ে অশুভতর আর কিছুই নেই। নারীর প্রতি পুরুষের মমত্ববোধ থাকা উচিত নয়।[২৩]

বিখ্যাত আইন রচয়িতা মনুরাজ নারী সম্পর্কে আরও বলেছেন, "নারী তার পিতার অধীনে, যৌবনে স্বামীর অধীনে এবং বিধবা হওয়ার পর পুত্রের অধীনে থাকবে। কোন সময়ই সে স্বাধীন থাকবেনা।

ইসলামে নারীর অধিকার

ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল স্থানেই যখন নারীরা ছিল অবহেলিত, নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত সপ্তম শতাব্দীর শুরুর দিকে মুহাম্মদ (সাঃ) এর আণীত বিধান ও তার মুখ নিসৃত বাণীই অবহেলিত নারী জাতিকে সকল লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও অপমান থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে রানীর মর্যাদায় সমাসীন করেছে। কন্যা, স্ত্রী, মাতা হিসাবে শিক্ষা দীক্ষায়, মিরাস ও তালাকের অধিকার সহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

নিম্নে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা আলোচনা করার চেষ্টা করব।

কন্যা হিসাবে নারী

প্রাক ইসলামী যুগে বিভিন্ন কারনে কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দেয়া হত কিংবা পাহাড়ের চুড়া থেকে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হত। দরিদ্রতার ভয় ও সমাজে নারীর কোন মর্যাদা না থাকায় এর বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ইসলাম জাহেলিয়াতের এই জঘন্য প্রথাকে চিরতরে বিলোপ সাধন করে ঘোষণা করলঃ

"দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করোনা। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চই তাদের হত্যা করা মহাপাপ।[২৪]

"নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা অন্যায় ভাবে কোন প্রমাণ ছাড়াই নিজ সন্তানদের হত্যা করেছে।[২৫]

"যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হল। [২৬]

ইসলাম কন্যা সন্তান হত্যা করা শুধু নিষেধই করেনি বরং তার অধিকার এবং মর্যাদাও প্রতিষ্ঠা করেছে। হজরত (সাঃ) এরশাদ করেন:

যে ব্যক্তির কোন কন্যা সন্তান রয়েছে এবং সে তাকে জীবন্ত প্রোথিত করে নি এবং ঘৃনার চোখেও দেখেনি উপরন্তু নিজপুত্র সন্তানকে অগ্রাধিকারও দেয়নি তাকে আল্লাহ তায়ালা জান্নাত দান করবেন।[২৭]

হাদিস শরীফে এসেছে "যে ব্যক্তি দুটি কন্যা সন্তানকে বয়ো প্রাপ্তি হওয়া পর্যন্ত লালন পালন করবে, সে ও আমি কিয়ামতের দিন এতটুকু কাছাকাছি থাকবো। এই বলে তিনি দুই আঙ্গুলকে উত্তোলন করলেন।

উপরোক্ত হাদিসদ্বয়ে কন্যা সন্তানের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

স্ত্রী হিসাবে নারী

বিভিন্ন সমাজে ও ধর্মে স্ত্রী শুধুমাত্র ভোগের সামগ্রী হিসাবে বিবেচিত হতো। কিন্তু ইসলাম স্ত্রী হিসাবে নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

স্ত্রীর মর্যাদা দানে আল কোরআন ঘোষণা করেছে "আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন যেন তাদের কাছে তোমরা বসবাস করতে পার এবং তোমাদের মাঝে ভালবাসা ও দয়ার সৃষ্টি করেছেন।[২৯]

রাসুল (সাঃ) বলেছেন, "পৃথিবীতে যত সম্পদ আছে তার মধ্যে উৎকৃষ্ট সম্পদ হলো সৎ কর্মশীল স্ত্রী।"[৩০]

তিনি আরও বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যারা নিজের স্ত্রীর কাছে ভাল তারা ইসলামের কাছেও ভাল। আমি আমার স্ত্রীদের কাছে ভাল।"

উপরোক্ত কোরআন ও হাদিসদ্বয়ে নিঃসন্দেহে স্ত্রীর মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্ত্রীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় কোরআন সর্বপ্রথম মোহরানাকে ফরজ ঘোষনা করেছে। তাদের (নারীদের) মধ্যে তোমরা যাদের ভোগ করবে তাকে তার নির্ধারিত (ফরজ মোহর) হক দান কর।[৩১]

হুজুর (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি অল্প বা অধিক মোহর ধার্য করে বিয়ে করলো কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার অন্তরে মোহর আদায় করার ইচ্ছা ছিলনা এইভাবে স্ত্রীকে প্রতারিত করে মারা গেলে কেয়ামতে সে ব্যক্তি যেনাকারী বা ব্যভিচারী রূপে আল্লাহর সাথে দেখা করবে।"

এরশাদ হচ্ছে "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে খুশি মনে মোহর দিয়ে দাও। তারা যদি খুশি হয়ে তা থেকে কিছু অংশ ছেড়ে দেয় তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দে ভোগ কর।[৩২]

ইসলাম স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। এরশাদ হচ্ছে "তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি যা তোমরা ছেড়ে যাও ইহাতে তোমাদের স্ত্রীদের জন্য রয়েছে ১/৪ (এক চতুর্থাংশ), যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তবে তাদের জন্য হবে ঐ সম্পত্তির ১/৮ (আটভাগের একভাগ) যা তোমরা ছেড়ে যাও অছিয়তের পর এবং ঋণ পরিশোধের পর।[৩৩]

বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসুল(সাঃ) বলেছেন তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে স্ত্রীদের উপর, তেমনি স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে তোমাদের উপর। এইভাবে ইসলাম স্ত্রীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

মা হিসাবে নারী

মা কথাটি অতি ছোট্ট কিন্তু মধুর। এর মধ্যে লুকায়িত রয়েছে হৃদয়ের শান্তি। পৃথিবীতে মায়ের সমকক্ষ আর কেহ নাই। তাই পৃথিবীর প্রায় সব ধর্মই মায়ের প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। এতদসত্ত্বেও খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদেরকে মায়ের প্রতি অন্যায় আচরণের অভিযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু ইসলাম মায়ের প্রতি অন্যায় আচরণ শুধু নিষেধ-ই করেনি বরং বাবা মাকে জান্নাত ও জাহান্নামের কারণ বলে উল্লেখ্য করা হয়েছে এবং আল্লাহর পরেই পিতামাতার আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে, তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করবেনা এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমাদের জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তাদেরকে তোমরা কষ্ট দিওনা এবং তাদেরকে ধমক দিবেনা এবং তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে। তাদের জন্য বিনয় ও নম্রতার সাথে শ্রদ্ধার বাহু প্রসারিত করবে এবং আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করবে "হে প্রভূ তাদের প্রতি আপনি সদয় হোন যেমনিভাবে তারা আমাকে শিশুকালে দয়ার সাথে প্রতিপালন করেছে।[৩৪]

একদিন এক ব্যক্তি হুজুর (সাঃ)কে সন্তানের কাছে মা বাবার প্রাপ্য কি জিজ্ঞাসা করলে হুজুর (সাঃ) জবাবে বললেন মা, বাবা তোমার জাহান্নাম ও জান্নাত।

এক ব্যক্তি রাসুল (সাঃ) এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলোঃ হে আল্লাহ রাসুল আমার সেবা পাওয়ার সবচেয়ে বেশি অধিকার কার? রাসুল (সাঃ) বললেন তোমার মায়ের। এভাবে তিনি তিনবার বললেন, তারপর বললেন তোমার বাবার।[৩৫]

জান্নাত রয়েছে (তাবরানী)। এভাবে ইসলাম মাকে সম্মানিত করেছে।

সমাপনীঃ

ইসলাম এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। একজন নারী শিশু থেকে আরম্ভ করে স্ত্রী, মা, কিংবা নানী/দাদী হওয়া পর্যন্ত প্রতি ক্ষেত্রে ইসলাম তার মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে। পৃথিবীর অবহেলিত নারীসমাজ একমাত্র ইসলামেই তাদের মর্যাদা ও অধিকার খুঁজে পেয়েছে। খুঁজে পেয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তার সকল দিক। যা থেকে পুরোপুরি ভাবে বঞ্চিত অন্যান্য ধর্ম ও সমাজের নারীরা। সুতরাং বর্তমান বিশ্বের নারী সমাজ তাদের অধিকার মর্যাদা ও স্বাধীনতা সহ সার্বিক নিরাপত্তা পেতে চাইলে তাদেরকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহন করতে হবে। একমাত্র ইসলামই পারে তাদের সকল অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে, যা পৃথিবীর অন্য কোন মতবাদ বা আইনের দ্বারা সম্ভব নয়।

আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন। আমিন।

টীকা

১। শ্রেষ্ঠ নজরুল - পৃষ্ঠা ৬১
২। শ্রেষ্ঠ নজরুল - পৃষ্ঠা - ৬০
৩। ইসহাক ওবায়দী - যুগে যুগে নারী - পৃষ্ঠা - ২০
৪। সাইয়েদ জালালউদ্দিন আনসার উমরী - ইসলামী সমাজে নারী - পৃঃ ৩৪
৫। ডঃ মুস্তফা আসসিবায়ী, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী পৃ: ৯
৬। ইসলামী সমাজে নারী - পৃ: ২৩
৭। ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী - পৃ: ১১
৮। আল কোরআন- সুরা তাকভীর- আয়াত- ৮,৯
৯। আল কোরআন- সুরা নহল আয়াত- ৫৮, ৫৯
১০। ইসলামী সমাজে নারী - পৃ: ৩১
১১। ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী- পৃ: ১৪
১২। যুগে যুগে নারী - পৃ: ২২
১৩। ফাতেমা আলী - ইসলামে নারী- পৃ: ১৪
১৪। মাও: আব্দুর রহিম- পরিবার ও পারিবারিক জীবন- পৃ:৩৮
১৫। ইসলামী সমাজে নারী- পৃ: ৩৩
১৬। ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী - পৃ: ১৪
১৭। যুগে যুগে নারী - পৃ: ১৬
১৮। ইসলামে নারী -পৃ: ১৩
১৯। অর্থ "খেদমতে"
২০। ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী - পৃ: ১৩
২১। যুগে যুগে নারী- পৃ: ২০
২২। ৩২ রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ
২৩। মমতাজ দৌলতানা-ধর্ম যুক্তি ও বিজ্ঞান -পৃ: ১০৮
২৪। সুরা বনি ইসরাঈল - আয়াত নং- ৩১
২৫। সুরা আল আনআম-১৪০
২৬। সুরা আত্ তাকভীর - ৮, ৯
২৭। আবু-দাউদ
২৮। সুরা নিসা-আয়াত নং-১১
২৯। সুরা আররোম আয়াত নং-২১
৩০। সহীহ মুসলিম ও ইবনে মাজা
৩১। সুরা আন নিসা- আয়াত নং-২৫
৩২। সুরা আন নিসা আয়াত নং - ৪
৩৩। সুরা আন নিসা আয়াত নং- ১১
৩৪। সুরা আন বনি ইসরাঈল আয়াত নং - ২৩, ২৪
৩৫। সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার গলদঃ উত্তরনের উপায়

মুহাম্মদ নাজমূল হুদা (সোহেল) *

১। ভূমিকাঃ জাতীয় উন্নতির পূর্ব শর্ত হলো মানব সম্পদের উন্নয়ন। আর মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রধান মাধ্যম হলো শিক্ষা। শিক্ষা প্রতিটি জাতির সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক উন্নতি ও অগ্রগতির প্রধান নিয়ামক। এজন্যই বলা হয় "Education is the backbone of a nation". শিক্ষা সুদূর প্রসারী, লক্ষাভিসারী। শিক্ষা বর্তমানের কানন ভবিষ্যতের মুকুল। চীন দেশে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে "তুমি যদি স্বল্পতম সময়ে ফল লাভ করতে চাও, তাহলে মৌসুমী ফলের চাষ কর, তবে তুমি ফসল পাবে একবার মাত্র। আর যদি তুমি দশ বছর ধরে ফল পেতে চাও, তাহলে চাষ কর ফলদার বৃক্ষের। আর যদি শতাব্দীকাল ধরে ফল পেতে চাও তাহলে মানুষের চাষ কর।" [১] মানুষের চাষ করা বলতে এখানে শিক্ষার কথাই বলা হয়েছে। আর শিক্ষার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষানীতি। এই শিক্ষা ব্যবস্থার উপরই জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সভ্যতার ইমারত বিনির্মিত হয়। একটি জাতি তখনই সভ্যতার উচ্চাসনে সমাসীন হয় যখন তার শিক্ষাব্যবস্থা হবে উন্নত, সুস্থ আর মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পরিতাপের বিষয় স্বাধীন সার্বভৌম আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা আজ কোন মজবুত ও আদর্শ নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। একটি সুষ্ঠু, আদর্শ ও সুচিন্তিত শিক্ষাব্যবস্থার অভাবে গোটা জাতি ছুটে চলছে চরম উদ্দেশ্যহীনতার দিকে। তাই অচিরেই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক গলদ কোথায়? এবং সমাধানই বা কি হতে পারে?

(২) প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় গলদ: যেকোন জাতির শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে জাতীয় জীবনের প্রয়োজন পূরণে উপযুক্ত লোক তৈরী করা। একটি আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষার্থীদের মাঝে একাডেমিক দক্ষতা সৃষ্টির সাথে সাথে জাতীয় আদর্শ ও মূল্যবোধের যথাযথ সমন্বয় সাধন করা। এসব দিক থেকে আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা পদবাচ্যে বিশেষিত করা যায় না। কেননা লক্ষ্যহীনতা, অব্যবস্থাপনা, সেকেলে সিলেবাস অনুসরণ ইত্যাদি সমস্যা ছাড়াও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বিরাজ করছে আদর্শবোধ ও নৈতিকতার বিরাট শূণ্যতা। যার কারণে এ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে জাতির আশা-আকাংখার সঠিক প্রতিফলন হচ্ছেনা। মরহুম শিক্ষাবিদ ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হতাশা ব্যক্ত করে বলতেন "আমাদের বিদ্যালয় মন্ত্রী, গভর্ণর, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবি প্রশাসক সবই প্রসব করেছে, কিন্তু মানুষ প্রসব করেছে কম।"

তাই এই মুহূর্ত জাতির সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ গুলো চিহ্নিত ও সংশোধন করে একটি কাংখিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা। আমি মনে করি, আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার গলদগুলো নিম্নরূপ:

২.১ শিক্ষাব্যবস্থায় আদর্শের অভাব: বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে একটি স্বাধীন-স্বার্বভৌম দেশ। আমরা একটি সোনালী ঐতিহ্যমন্ডিত জাতি। কিন্তু দুঃখজনক হল, আজ আমরা সাংস্কৃতিক ভাবে ভিক্ষুক, রাজনৈতিক দিক হতে কুদুলে, অর্থনৈতিক বিবেচনায় কোমর ভাংগা আর শিক্ষা ব্যবস্থার মানদন্ডে দেউলিয়া। শিক্ষাক্ষেত্রে গোটা জাতি চরম আদর্শ-শূন্যতায় ভুগছে। আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে আমরা আজও কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও মূল্যবোধকে জাতীয় আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে পারিনি। উপরন্তু আমরা ভিন্‌দেশীয় জগাখিচুড়ি চিন্তা চেতনার সংঘাত সংঘর্ষের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছি। বিভ্রান্ত হচ্ছে জাতির ভবিষ্যত নেতৃত্ব। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি এখানেই। একটি শিক্ষাব্যবস্থায় আদর্শিক দিকের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে আল্লামা ইকবাল বলেছেন "একজন ব্যক্তির জীবন নির্ভর করছে আত্মা ও দেহের সম্পর্কের উপর আর একটি জাতির জীবন নির্ভর করছে তার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপর। আত্মার জীবন প্রবাহ বন্ধ হলে

* ৫ম সেমিষ্টার, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক ষ্টাডিজ।

২.২ দ্বিমুখী শিক্ষাব্যবস্থা: বর্তমানে আমাদের দেশে বিপরীতমুখী দুটি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। একটি হলো মাদ্‌রাসা শিক্ষা এবং অপরটি সাধারণ শিক্ষা নামে পরিচিত। প্রথম শিক্ষা ব্যবস্থায় জড়িতরা একে ইসলামী শিক্ষা বলে দাবী করে আর দ্বিতীয় ব্যবস্থায় জড়িতরা সেটাকে আধুনিক শিক্ষা বলে গৌরববোধ করে। মাদ্‌রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতরা কুরআন-হাদীস, ফিক্‌হ ইত্যাদি ছাড়া আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ছোঁয়া খুব একটা পান না। যার কারণে আধুনিক বিশ্বের প্রয়োজনে তাঁরা কাংখিত অবদান রাখতে পারছেন না। অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতরা, প্রচলিত দুনিয়ার অনেক কিছু বুঝেন ঠিক, কিন্তু আদর্শ মুসলিম হিসাবে জীবন যাপনের কোন প্রেরণাই তারা লাভ করেন না। সুতরাং বুঝা গেল প্রচলিত শিক্ষাধারার একটিকেও পরিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। উপরন্তু দু'ধরনের শিক্ষা সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তাধারা সৃষ্টি করে চলেছে। একটি দেশের নাগরিক দিগকে উপযুক্ত রূপে গড়ে তুলবার জন্য একই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা থাকা উচিত। দু'ধরনের শিক্ষিত লোক সমাজকে দু'টি বিপরীত দিকে টানতে থাকলে দেশের বিপর্যয় অনিবার্য।

২.৩ ধর্ম ও নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষা: বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা মূলত: ধর্মনিরপেক্ষতার মোড়কে বাঁধা। ধর্ম বিদ্বেষ, ধর্মবিরোধ ও ধর্মহীনতা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে জঘন্য ত্রুটি। মূলতঃ ধর্ম যেখানে উপেক্ষিত সেখানে সকল মহৎ চিন্তা, সৎকর্ম, নৈতিকতা ও কল্যাণকামিতা থাকে অনুপস্থিত। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধর্ম ও নৈতিকতাবিহীন একটি কারখানায় পরিণত করা হয়েছে। ফলে যতই আমরা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলকে লিখে রাখি "শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রবেশ কর, সেবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়।[৩] ততই আমাদের শিক্ষার্থীরা কার্টুনিষ্ট র'নবীর ভাষায় "মানুষ হয়ে ঢুকছে, আর ছাগল হয়ে বের হচ্ছে।"

আমাদের শিক্ষাঙ্গনে নৈতিকতার মান এত নেমে গেছে যে, জাহাংগীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে জসীম উদ্দীন মানিকরা ধর্ষণের সেঞ্চুরী উদ্‌যাপনের সাহস পায়। থার্টি ফাষ্ট নাইটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাসেল গং কর্তৃক অসহায় তরুনীর বস্ত্র হরণ হয়। এ সবই নৈতিকতা বিবর্জিত, ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থার ফসল। বলাবাহুল্য, ধর্মনিরপেক্ষ ও আদর্শহীন শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীর আত্মা ও মননে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে পারে না। আর যে শিক্ষাব্যবস্থায় আত্মার পুষ্টি ও আদর্শিক প্রয়োজনের দিক বিবেচিত হয়না তা জাতির জন্য মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে। মহাকবি ইকবাল বলেছেন:

জ্ঞান যদি নিয়োজিত হয় তোমার দেহের সমৃদ্ধির জন্য
তবে এ জ্ঞান হচ্ছে এক বিষধর সর্প
জ্ঞান যদি হয় তোমার আত্মার জন্য নিবেদিত
তবে এ জ্ঞান হবে তোমার পরম বন্ধু, তোমার গর্ব।

ধর্মহীন শিক্ষার কুফল বর্ণনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত দার্শনিক Stanly Hull বলেছেন: If you teach your children the three R.S (Reading, writing, Arithmetic) and leave the forth R. (Religion) you will get a fifth R(Rascality) [৪]

শিক্ষার একটি আদর্শিক ভিত্তি আছে। আর সেই আদর্শগত ভিত্তি মূলত: ধর্মের ভিত্তি। তাই একটি জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়নই হওয়া উচিত শিক্ষার প্রধানতম উদ্দেশ্য। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় ৯০% মুসলমানের এদেশে তথাকথিত কিছু বুদ্ধিজীবি ইসলামী শিক্ষার নাম শুনলে নাক ছিটকান, একে সংকীর্ণতা ও প্রগতির অন্তরায় মনে করেন। অথচ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ক্যাথলিক কলেজ, প্রটোষ্ট্যান্ট কলেজ, মথোডিট বিশ্ববিদ্যালয়, হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, কনভেন্ট স্কুল, মিশনারী স্কুল, বাইবেল স্কুল ইত্যাদি সবই আছে। [৫] তাই মুসলিম দেশে ইসলামী শিক্ষা থাকবে জনগণের প্রয়োজনেই। সেজন্য সরকারের উচিত স্বল্প-সংখ্যক নাস্তিক ও নৈতিক মেরুদন্ডহীন প্রাণীদের সমালোচনার তোয়াক্কা না করে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নীতি নৈতিকতা ভিত্তিক শিক্ষানীতি চালু করা। অন্যথায় জাতীয় জীবন মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে বাধ্য।

২.৪ ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয় হীনতা: আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্ম ও বিজ্ঞানকে পরস্পরের দুশমন হিসাবে পেশ করা হয়েছে। বিশেষত: সমকালীন ইউরোপীয় জাহেলিয়াত এ দুয়ের মাঝে শত্রুতা ও ঘৃণা সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত। ইসলামের মত বিজ্ঞানময় জীবন বিধানকেও প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞানের শত্রুরূপে পরিচিত করানো হয়েছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থায়

এসব শাখায় অসামান্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। "জ্ঞানীর কালি শহীদের রক্তের চেয়ে উত্তম" কিংবা "এক রাত গবেষণা ও জ্ঞান সাধনায় লিপ্ত থাকা হাজার বছর নফল ইবাদাতের চেয়েও উত্তম" মহানবীর এসব অমূল্য বানীর সাথে পরিচিত হবার সুযোগ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় রাখা হয়নি। বরং ধর্ম তথা ইসলামের বিরুদ্ধে ছড়ানো হচ্ছে বিষোদগার, অপপ্রচার। ধর্ম ও বিজ্ঞানের এ সমন্বয়হীনতা অনভিপ্রেত, অকল্যাণকর। বিজ্ঞানী Albert Einstein চমৎকার বলেছেন:

"Science without Religion is lame and
Religion without science is blind." (৬)

২.৫ সহশিক্ষার অভিশাপ: আধুনিক শিক্ষাপদ্ধিতির আরেকটি মারাত্মক ত্রুটি হচ্ছে সহশিক্ষা। সহশিক্ষার ফলে তরুন-তরুণীরা অবাধ মেলামেশার সুযোগ পায়, যার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে নৈতিক অবক্ষয়। ইসলাম সহশিক্ষাকে অনুমোদন করে না। তাই ইসলামে নারী শিক্ষার জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সহ শিক্ষার নামে আজ গোটা বিশ্বে যে বেহায়াপনা ও উলঙ্গপনা চলছে তা শুধু ধর্মীয় বিধান লংঘন নয় বরং বিশ্বসভ্যতার জন্যও হুমকি স্বরূপ। কয়েকটি পরিসংখ্যান থেকে সহ শিক্ষার ভয়াবহতা সহজেই উপলব্ধি করা যাবে।

১। আমেরিকার বিশ্বদিল্যায় ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের অশ্লীলতার বিবরণ সম্প্রতি লেবাননের একটি পত্রিকায় উদ্ধৃত করা হয়েছে, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার মেয়ে অবৈধভাবে গর্ভবতী। (৭)

২। "আমেরিকার বালিকারা প্রাথমিক স্কুলেই যৌন চর্চা শুরু করে। এগার ও বার বৎসরের ৩১২ জন ছাত্রীর উপর জরীপ করে জানা গেল ২৫৫ জন্য ছাত্রী যৌন ক্রিয়ায় অভ্যস্ত।" (৮)

৩। "সহশিক্ষার কারণে আমেরিকাতে স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শতকরা ৪৫% মেয়ে অবৈধভাবে গর্ভভতী হয়ে থাকে। তাই সেখানে মেয়েদের জন্য পৃথক ১০৭টি কলেজ ও রাশিয়াতে ১২০টি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।"(৯)

৪। "বাংলাদেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে শতকরা ৪৮% ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে।"(১০)

সহশিক্ষার এই ভয়াল পরিণতিতে আমাদের শিক্ষাঙ্গন গুলো উদ্বেগজনক ভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। গোটা জাতির জন্য এটি এক মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে।

২.৬ সন্ত্রাস ও সেশন জট: শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস আমাদের জাতীয় বড় সমস্যা গুলির অন্যতম। এ সমস্যা জাতির প্রাণশক্তিকে কুরে কুরে খাচ্ছে। সন্ত্রাসের ফলে শিক্ষাঙ্গন মুহুর্তের মধ্যে পরিণত হয় প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের রণক্ষেত্রে। ফলে শিক্ষার পরিবেশ হয় ভূলুণ্ঠিত। জান-মালের ক্ষতি এড়ানোর জন্য কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। এভাবে শিক্ষাংগনে সেশন জটের অভিশাপ নেমে আসে। চার বছরের কোর্স যেনতেন প্রকারে শেষ হয় সাত/আট বছরে। ছাত্রাবস্থাতেই অতিক্রান্ত হচ্ছে সরকারী চাকুরীর বয়সসীমা। এভাবে সন্ত্রাসের কালো থাবায় আমাদের শিক্ষার পরিবেশকে কুলষিত করা হচ্ছে। মানুষ গড়ার আঙ্গিনা শিক্ষাঙ্গনকে আজ বলা হয়ে থাকে "ডাকাতদের গ্রাম।"(১১) জাতির জন্য এর চাইতে বড় দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে?

২.৭. বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষানীতি অনুসরণ: ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০০ বছর যাবত আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শাসনাধীনে ছিলাম। এ দীর্ঘ শাসনামলে বৃটিশদের সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো তাদের রেখে যাওয়া শিক্ষা ব্যবস্থা। এ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ জনগনের সাথে শাসকগোষ্ঠীর যোগাযোগ রক্ষার জন্য একদল, কেরানী, আমলা ও দালাল তৈরী করা। এর দ্বিতীয় ও সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীরা আচার-আচরণ, সংস্কৃতি ও রুচিবোধে হবে ইংরেজ। ১৮৩৫ সালে ইংরেজদের শিক্ষা পরিকল্পনার প্রধান লর্ড ম্যাকলের উক্তিই এসবের বড় প্রমান। সেটি হচ্ছে "We must at present do our best to form a class who will be interpreters between us and the willioms whom we govern: a class of persons Indians in blood and colour but English in taste in opinions, in morals and in intellect." (১২)

আজ বৃটিশরা শারীরিকভাবে এখানে আর নেই। কিন্তু আমাদের স্থবিরতা ও অধঃপতনের সুযোগে তারা যে ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করেছিল তার কু-প্রভাব আজ ও বিদ্যমান। আমাদের শিক্ষা কাঠামো, শিক্ষা সিলেবাসকে আজও বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষার লেজুড়বৃত্তি থেকে মুক্ত করা সম্ভব হয়নি। আমাদের অধিকাংশ সিলেবাসই পাশ্চাত্যে লেখা বই পুস্তকের

মাকড়সা যেমন নিজ শরীর থেকে লালা বের করে নিজের জন্য আবাস তৈরী করে, ঠিক তেমনি ভাবেই একটি জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠে সে জাতির অন্তর থেকে, প্রয়োজন থেকে, নিজস্ব চিন্তা-চেতনার প্রেক্ষিতে। অন্যের কাছ থেকে ধার করা আদর্শের ভিত্তিতে যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠে তা কখনও কোন জাতির জন্য কল্যাণমুখী হতে পারে না। এ ধরনের শিক্ষা বরং নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করে। এ সম্পর্কে মহাকবি ইকবাল বলেছেন:

তুমি অন্যের জ্ঞান অর্জন করেছ
নিজের চেহারায় মেকাপ করেছ অন্যের কাছ থেকে
ধার করা রুজ দিয়ে।
আমি জানিনা তুমি কি আসলে 'তুমি; না অন্য কেউ?
তোমার বুদ্ধিমত্তা বন্দী অপরের চিন্তার শৃংখলে।
তোমার গভীরের নিশ্বাসটুকু ও আসছে অন্যের সুত্র থেকে।
ধার করা ভাষা তোমার কণ্ঠে
ধার করা আকাঙ্খা তোমার হৃদয়ের গভীরে
তোমার কোকিল পাখি ধার করা গান গায়
তোমার সাইপ্রাস বৃক্ষের আবরণ ধার করা।
তোমার পানপাত্রে রক্ষিত সূরা সেওতো অন্যের কাছ থেকে চেয়ে নেয়া
সূরা পাত্রটিও তুমি এনেছ ধার করে।
তুমিতো একটি সূর্য। একবার চেয়ে দেখ নিজ সত্তার পানে
অপরেব তারকার আলো তুমি চেয়োনা কোন ক্ষণে
সভার মোমবাতির আলোতে তুমি আর কত দিন নাচবে?
তোমার হৃদয়ের-অনুভূতি যদি থাকে তাহলে জ্বালো
অনতিবিলম্বে আপনা আলো। (১৩)

২.৮ কারিগরি শিক্ষার অভাব: বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা এক কোটির উপরে। Under employed এর সংখ্যা হিসাব করলে অবস্থা আরো বেগতিক। শিক্ষাব্যবস্থায় তেমন কোন সুযোগই নেই। শুধু তাত্ত্বিক আর পুরনো বস্তাপচা মতবাদের মধ্যে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি। তাই উৎপাদনশীল শিক্ষার অভাবে প্রতিদিন বেড়ে চলছে বেকারের সংখ্যা। এজন্য অনেক প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে বেকার তৈরীর কারখানা হিসাবে অভিহিত করছেন। বিশ্বব্যাংকের এক রিপোর্ট মতে, বিশ্ববিদ্যালয় গুলো যে জনশক্তি তৈরী করছে তার ৬% মাত্র কর্মক্ষেত্রের উপযোগী। কর্মক্ষেত্রের সাথে শিক্ষা ব্যবস্থার এই দুরত্ব দেশের উন্নয়নকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্থ করছে।

২.৯ শিক্ষক প্রশিক্ষনের অভাব: শিক্ষকের বিদ্যা, চরিত্র ও দক্ষতার উপর চিরদিনই শিক্ষার মান প্রধানত নির্ভরশীল। তাই শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষক-অপরিহার্য। আজকাল অনেক শিক্ষকই যেন শিক্ষা শ্রমিক কিংবা শিক্ষা ব্যবসায়ী মাত্র। তারা যেন কেবল অর্থের জন্যই ছুটছেন, জ্ঞানের সওদাই যেন তাদের একমাত্র কাজ। এছাড়া দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অভাবতো রয়েছেই। শিক্ষকদের এ নানামুখী যোগ্যতার ঘাটতি পুরনের জন্য প্রয়োজন আধুনিক ও কার্যকর শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের জন্য বাংলাদেশে যেকটি শিক্ষক-প্রশিক্ষন ইনষ্টিটিউট রয়েছে কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকী ও কার্যকর পদক্ষেপের অভাবে সেগুলো নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আর মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য সম্প্রতি একটি মাত্র প্রশিক্ষন ইনষ্টিটিউট করা হয়েছে তাও আবার যথাযথ কার্যকর নয়। শিক্ষক প্রশিক্ষনের এই দৈন্যদশার কারণে শিক্ষক সমাজ জাতি কাঙ্খিত সেবা পাচ্ছে না।

২.১০ ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতি: বাংলাদেশে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ ও সেকেলে। এ পদ্ধতি ছাত্রদের মেধা নির্ধারণ ও শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক নয়। প্রশ্ন পত্র তৈরী, ফলাফল প্রকাশ সকল ক্ষেত্রেই ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে। বর্তমানে প্রচলিত GPA পদ্ধতির বিভাজনে আন্তর্জাতিক মানের সাথে সংগতি বজায় রাখা হয়নি। এছাড়া সীমাহীন নকল

ভিত্তিতে কোচিং ব্যবস্থা ও নোট বইয়ের প্রচলন। অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষকগণ ক্লাসের চেয়ে প্রাইভেট বা কোচিংয়ের দিকে বেশী নজর দেন। আর ছাত্র-ছাত্রীরাও মূল বই বিমুখ হয়ে প্রাইভেট কোচিং ও নোটের সাহায্যে ভালো রেজাল্ট করার জন্য ছুটছে। যার কারণে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় পাশ করছে ঠিক, কিন্তু মৌলিক জ্ঞান থেকে তারা বহুদুর পিছিয়ে থাকছে।

২.১২ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসা: ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হয়। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রবর্তিত নীতিমালা অনুসরণ না করেই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বহু বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার যথাযথ মান ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে না। ফলে অর্থের বিনিময়ে ডিগ্রি প্রদানই মূখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২.১৩ শিক্ষা উপকরনের অভাব: দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর প্রয়োজনীয় পাঠাগারে নতুন সংস্করনের বই, প্রয়োজনীয় রেফারেন্স বইয়ের অভাব রয়েছে। বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ, মান সম্পন্ন শিক্ষক, ব্যবহারিক পরিদর্শক, উন্নত রেফারেন্স বইয়ের অভাব সবচেয়ে প্রকট। এ সংকট আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি অদ্ভূত তত্ত্বীয় কাঠামোয় মুখস্তনির্ভর শিক্ষায় পরিণত করেছে।

৩। শিক্ষাব্যবস্থার সংকট উত্তরণে সুপারিশমালা: প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার নানাবিধ ত্রুটি থেকে উত্তরনের জন্য আমাদেরকে বাস্তবভিত্তিক ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে একটি আদর্শ ও কল্যাণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের লক্ষ্যে নিম্নে সংক্ষিপ্ত ভাবে কতিপয় সুপারিশমালা পেশ করছি।

এক. প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় জাতি গঠনের কোন আদর্শিক দিক নির্দেশনা না থাকার ফলে শিক্ষাঙ্গন গুলো আজ নিষিদ্ধ চরিত্রের মানুষ উপহার দিচ্ছে। যেহেতু আদর্শিক দেউলিয়াপনাই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক ত্রুটি, তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগনের আবেগ ও মূল্যবোধকে শিক্ষাদর্শের বুনিয়াদ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। শতকরা ৯০% মুসলমানের এদেশে ইসলামই হতে পারে সেই বুনিয়াদী আদর্শ।

দুই: স্থায়ীভাবে পরস্পরবিরোধী বিভিন্নমুখী শিক্ষা পদ্ধতি অক্ষুন্ন রেখে কোন সুসংহত জাতি ও দেশ গঠন সম্ভব নয়। তাই দশম শ্রেণী পর্যন্ত দ্বিমুখী শিক্ষার পরিবর্তে একক ধারার শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে। সেখানে শিক্ষার্থীরা সমকালীন বিষয়াবলীর সংগে সংগে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত মৌলিক জ্ঞান অর্জন করবে। এরপর শিক্ষার্থীরা নিজেদের পছন্দমত বিষয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে পারবে।

তিন: জড়বাদী দর্শনের প্রভাবে নৈতিক অবক্ষয় আজকের পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাশীলদেরও আতংকিত করে তুলেছে। ধর্মীয় অনুভূতি ছাড়া নৈতিক বিপর্যয় হতে কোন কিছুই মানুষকে রক্ষা করতে পারে না। তাই শিক্ষাব্যবস্থার সকল স্তরে ধর্মীয় শিক্ষাকে গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে।

চার: সহশিক্ষা ব্যবস্থাকে অব্যাহত রেখে কোনদিনই চরিত্রবান জাতি গঠন করা সম্ভয় নয়। তাই একমাত্র প্রাথমিক স্তর ছাড়া শিক্ষার সকল স্তরে অবশ্যই সহশিক্ষা বিলোপ করে মহিলা স্কুল, মহিলা কলেজ, মহিলা মাদ্‌রাসা, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ও মহিলা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

পাঁচ: জাতীয় আদর্শ ও মূল্যবোধের আলোকে শিক্ষাব্যবস্থার পূণর্বিন্যাস ও পূণর্গঠনের লক্ষ্যে ইসলামী স্কলার, শিক্ষাবিদ ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় বুদ্ধিজীবিদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী জাতীয় শিক্ষাকমিশন গঠন করতে হবে। শিক্ষা কমিশনকে অবশ্যই অধিকাংশ জনগনের চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। কেননা জনমতকে উপেক্ষা করার কারণে অতীতের সবকটি শিক্ষাকমিশন রিপোর্ট ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

ছয়: আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোকে সন্ত্রাসের মরণফাঁদ থেকে রক্ষা করতে হবে। আদর্শহীন ছাত্র রাজনীতিই মূলত: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গুলোকে সন্ত্রাসের জন্য দায়ী। তাই নির্দিষ্ট মেয়াদ যেমন চার বছর বা পাঁচ বছরের জন্য ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা যেতে পারে।

সাত: শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। সামাজিক মর্যাদা ও অন্যান্য বিষয়াদি সহ শিক্ষকতার পেশাকে এতটা আকর্ষণীয় করতে হবে যাতে শিক্ষিতদের সবচেয়ে মেধাবী অংশ শিক্ষকতাকে আনন্দের সহিত একটা মহৎ পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন।

করবেন।

দশ: ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব দূরীকরনের লক্ষ্যে মাধ্যমিক স্তর হতে কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে করে শিক্ষাকে উৎপাদন মুখী করা যায়।

এগার: বৈষম্য দূরীকরণ ও জাতীয় ঐক্য অর্জনের উদ্দেশ্যে মাদ্‌রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন নীতি অনুসরণ করতে হবে। মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার স্বকীয় বৈশিষ্ট অক্ষুন্ন রেখে আরও উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত করে সাধারণ শিক্ষার সমমান দিতে হবে।

বার: পরীক্ষা পদ্ধতি ও একাডেমিক কারিকুলাম এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে নকল প্রবণতা বন্ধ হয়ে যায় এবং পরীক্ষার্থীর মেধা ও অর্জিত জ্ঞানের যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব হয়।

তের: শিক্ষাক্ষেত্রে বাণিজ্যিকভাবে গড়ে উঠা কোচিং সেন্টার ও যত্রতত্র গাইড নোট বইয়ের প্রচলন বন্ধ করতে হবে।

চৌদ্দ: উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রী, আলিম, ফাজিল ও কামিল স্তরে বিজ্ঞান বিভাগ প্রবর্তন করতে হবে।

পনের: শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকর প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক সামগ্রীর সরবরাহ পাঠাগারের বই বৃদ্ধি, নতুন সংস্করনকৃত ও সর্বাধুনিক রেফারেন্স সমৃদ্ধ বই সংগ্রহ এবং বহির্বিশ্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর সাথে Councelling & Interaction বৃদ্ধি করতে হবে।

উপসংহারঃ

সর্বশেষ কথা হলো আমাদের একটি আধুনিক, আদর্শ ও সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন। আমাদের কাঙ্খিত শিক্ষাব্যবস্থা জাতিকে এমন ভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে যে, তাদের যেমন থাকবে আদর্শিক পরিচয়, তেমনি থাকবে যুগের প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও যোগ্যতা।

"Education is the harmonious development of body, mind and soul."[১৪] শিক্ষা ব্যবস্থায় এ কথাটির স্বার্থক প্রতিফলন হওয়া চাই। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার গলদ ও এ থেকে উত্তরনের মৌলিক বিষয়গুলো আলোকপাতের চেষ্টা করেছি। এখন এগুলো বাস্তবায়ন করার গুরু দায়িত্ব সরকারের উপর। তাওহীদপন্থী জনগনের ভোটে নির্বাচিত বর্তমান চারদলীয় জোট সরকারের উচিত আদর্শিক মূল্যবোধের আলোকে একটি কর্মমূখী, সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

তথ্য সূত্র:

১। ডঃ আবু বকর রফিক আহমদ। "একটি আদর্শ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখার আলোকে আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার প্রস্তাবনাঃ (প্রকাশিত প্রবন্ধ)। জাতীয় শিক্ষা সেমিনার সংকলন ১৯৯৭

২। অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ, ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি, অনুবাদক অধ্যাপক নজির আহমদ, আধুনিক প্রকাশনী, বাংলা বাজার ঢাকা, পৃষ্ঠা ১০ সন ১৯৯০

৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১০ (ঈষৎ পরিবর্তিত)

৪। আঃ শহীদ নাসিম, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে প্রস্তাব ও সুপারিশমালা সেন্টার ফর পলিসি ষ্টাডিজ, প্রকাশকাল, জুন '৯৭, ঢাকা পৃষ্ঠা ২৩

৫। দৈনিক ইনকিলাব, শিক্ষাঙ্গন, ২২শে জুলাই ২০০২

৬। মূল্যবান বানীটি বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনষ্টাইনের।

৭। 'আহাদ' দৈনিক পত্রিকা, সংখ্যা ৬৫০, লেবানন।

৮। মোহাম্মদ আলী সাবুনী, তারবীয়াতুল আওলাদ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৮০

৯। দৈনিক ইত্তেফাক, ২০শে মার্চ, ১৯৯৮ইং

১০। কবি আল মাহমুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ডাকাতদের গ্রাম বলে অভিহিত করেছেন।

১১। লর্ড ম্যাকলে, ১৮৩৫ সালে উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার উপর দিক নির্দেশনা দিতে গিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন।

১২। অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ, ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি, (বাংলা সংস্করন) আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯০ পৃষ্ঠা-৭

১৩। এটি মহাকবি মিল্টনের উক্তি।

মহানবীর (সঃ) যুগান্তকারী সমাজ দর্শন

মুহাম্মদ আবুল কালাম *

সূচনাঃ

৭ম শতকের পৃথিবী, সর্বত্র যুদ্ধ-সংঘাত-রক্তপাত আর হানাহানি। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রেই ছিল নৈরাজ্য ও অশান্তি। অশান্তি অনিয়মই ছিল নিয়ম-কানুন। শান্তির দূরতম লক্ষণ কোথাও দৃষ্টিগোচর ছিল না। মানবতার ও সভ্যতার এহেন অশান্তিময় বিপর্যস্ত দূরবস্থায় এলেন মহানবী (সঃ)। পেশ করলেন শান্তিময় ও কল্যাণের বাণী। মাত্র ২৩ বছরের মধ্যে তিনি তদানীন্তন আরবে এক শান্তিময় সমাজ ও রাষ্ট্র স্থাপন করলেন। প্রশস্ত করে দিলেন মানবতার শান্তির স্বর্গীয় অনুপম পথ। সমগ্র মানব জাতি খুঁজে পেয়েছিল শান্তি ও মুক্তির দিকনির্দেশনা। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে যুগ যুগ ধরে চলে আসা দ্বন্দ্ব-সংঘাত যুদ্ধের অবসান ঘটেছিল আরবে। অনুপম সমাজ দর্শনের ফলে চরম অশান্তির বদলে স্থাপিত হয়েছিল অতুলনীয় শান্তি সুখ সমৃদ্ধির আবাস। নিষ্পেষিত, শোষিত, বঞ্চিত নিপীড়িত মানবতা খুঁজে পেয়েছিল শান্তি ও কল্যাণের অমিয়ধারা। তারা প্রত্যক্ষ করেছিল শান্তিময় সুশীল সমাজ ব্যবস্থা। বিশ্ববাসী লাভ করেছিল শান্তির পরশ। স্বর্গীয় শান্তির ফল্গুধারা নেমে এসেছিল ধুলির ধরায়। শান্তিময় হয়ে উঠেছিল সব কিছু। জান্নাতের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছিল এ পৃথিবী। এভাবে মহানবীর (সঃ) শিক্ষা, সংস্কার ও সমাজ বিনির্মাণ মূর্ত হয়ে উঠেছিলে সেদিন। নিম্নে মহানবীর (সঃ) এর যুগান্তকারী সমাজ দর্শন সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেই আমার এ প্রবন্ধের যবনিকাপাতের রেখা টানবো ইনশাআল্লাহ্।

সমাজের আত্ম পরিচয়ঃ

সমাজ বলতে বুঝায়, "পরস্পর সহযোগিতা ও সহানুভূতির সংগে বসবাসকারী মনুষ্যগোষ্ঠী।"[১]

- ম্যাকাইভারের মতে, "রীতিনীতি, কার্যপ্রণালী ও পারস্পরিক সহযোগিতায় লিপ্ত, সংঘবদ্ধ জীবন যাপনকারী আচার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অনুসরণকারী জনগোষ্ঠীর নাম সমাজ।[২]
- টমাস এ্যকুইনের মতে, "নিজস্ব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে প্রজ্ঞাশীল, নৈতিক, পারস্পরিক সহযোগিতায় লিপ্ত বসবাসকারী সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠীকেই সমাজ বলা হয়।"[৩]

ইসলামী জীবন দর্শনে সামাজিক জীবন যাপনের গুরুত্বঃ

ইসলাম জীবন যাপনের গুরুত্বারোপ করে থাকে। আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, "আমি তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের মানসিক স্বস্তি তৃপ্তি ও শান্তির জন্য জীবন সংগীনীদেরকে সৃষ্টি করেছি।"[৪]

ইসলামী সামাজিক জীবন দর্শনে মানুষ তার সূচনা লগ্ন হতেই আল্লাহ্ প্রদত্ত ওহীর বুনিয়াদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সুষম ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামী সমাজের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছে। ইসলাম মানুষকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়াই সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের শিক্ষা দিয়েছে।

আল কুরআনে এরশাদ হচ্ছে, "হে মানব গোষ্ঠী, আমি তোমাদেরকে নর-নারী রূপে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে বংশ ও গোত্রের নামে বিভক্ত করেছি পরিচয়ের সূত্র হিসাবে। তোমাদের তারাই আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে বেশী মর্যাদার অধিকারী যারা তাকওয়ার মহান বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত।"[৫]

সমাজ গঠনের মৌলিক উপাদানঃ

সমাজ গঠন বা উন্নয়নের মৌলিক উপাদান হলো তিনটি-

---

* দাওয়াহ বিভাগের মাষ্টার্সের ১ম সেমিষ্টারের ছাত্র

পরিপূর্ণ ভাবেই বিদ্যমান ছিল। তিনি ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনের [illegible] কল্পে আল্লাহ্ প্রদত্ত একমাত্র আদর্শ 'ইসলাম' এর প্রচার দ্বারা তার কাজের উদ্বোধন করেন। ফলশ্রুতিতে মহানবী (সঃ) নিজ হাতে তৈরী লোকদের দ্বারা মদীনায় একটি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেন।

পরবর্তীতে বদর, উহুদ ও খন্দকের খুন পিচ্ছিল পথ পাড়ি দিয়ে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে গোটা আরবে তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে, আদর্শ সমাজ গঠনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে ব্যক্তি গঠন। কেননা কোন আদর্শ যতই সুন্দর হোক সে আদর্শ ভিত্তিক ব্যক্তি গঠন করা না হলে তার ভিত্তিতে সমাজ গঠন অকল্পনীয়। তাই মহানবী (সঃ) ব্যক্তি গঠনের জন্য এক ব্যাপক নীতিমালা পেশ করেন।

ব্যক্তি গঠনে মহানবীর (সঃ) মৌলিক নীতিমালাঃ

এ ক্ষেত্রে মহানবী (সঃ) চারটি মৌলিক নীতিমালা গ্রহণ করেছেন। তা হলো-

(১) তাওহীদঃ

তাওহীদ শব্দের অর্থ হলো একত্ববাদ। আল কোরআনের পরিভাষায় তাওহীদের অর্থ হলো, "আল্লাহ্ তায়ালা তার সত্তায়, গুণাবলীতে, বৈশিষ্ট্যে, সার্বভৌম কর্তৃত্বে আইন রচনায় এবং ইবাদত বা আনুগত্য পাবার দিক থেকে নিরংকুশ, তার কোন সমকক্ষ বা শরীক নেই।"[৭] আল্লাহ্র অস্তিত্ব এবং তার নিদর্শনের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- أفي الله شك فاطر السموات والأرض "আল্লাহ্র ব্যাপারে সংশয়? তিনিই তো আসমান জমীনের স্রষ্টা।"[৮] অন্যত্র বলা হয়েছে- وما من إله إلا الله الواحد القهار "আল্লাহ্ ছাড়া প্রকৃত ইলাহ আর কেউ নেই, যিনি এক ও একক সর্বজয়ী।"[৯]

তাই সার্বভৌমত্বের মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্। চূড়ান্ত ও সকল প্রকার ক্ষমতার উৎস হচ্ছেন আল্লাহ্র। তাওহীদ মানুষকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছে মাথা নত করা থেকে মুক্তি দেয় এবং মানুষের জীবনের নিরাপত্তা দেয় ও সঠিক ব্যক্তিত্ব গড়তে সহায়তা করে।

(২) রিসালাতঃ

রিসালাত শব্দের শাব্দিক অর্থ রাসুলত্ব বা রাসুলের কর্ম ও দায়িত্ব। আল কুরআনের পরিভাষায় রিসালাত হলো "মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন কল্যাণের জন্য যুগে যুগে যে সকল নবীরাসূলগণকে পাঠানো হয়েছে তাদের নেতৃত্ব কর্ম, আদর্শ এবং হেদায়েতের নামই রেসালাত।"[১০] তাওহীদের উপর বিশ্বাস স্থাপনের পাশাপাশি রিসালাতের উপরেও ঈমান এনে সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা ব্যক্তি গঠনের দ্বিতীয় মৌলিক কাজ। আল্লাহ্ তায়ালা মহানবী (সঃ) কে মানুষের মধ্য থেকেই মানুষের কল্যাণের (ব্যক্তি পরিচর্যা) জন্যই রাসুল করে পেশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন-

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم -

অর্থাৎ "তোমাদের নিকট যে একজন রাসুল এসেছেন তিনি তোমাদের মধ্যেরই একজন। তোমাদের কোন রূপ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া তা তার নিকট দুঃসহ কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের সঠিক কল্যাণ কামনাকারী এবং ঈমানদার লোকদের জন্য সহানুভূতি সম্পন্ন ও করুণাসিক্ত।"[১১]

(৩) আখিরাতঃ

আখিরাত শব্দের অর্থ শেষ, সমাপ্তি, পরবর্তী ইত্যাদি। আল কুরআনের দৃষ্টিতে আখিরাত হলো, "এই দুনিয়া শেষ বা পরিসমাপ্তির পর যেখানে মানুষের ইহকালীন জীবনের কৃতকর্মের হিসাব নিকাশ ও বিচার ফায়সালা করা হবে। অতঃপর পুরস্কার বা শাস্তি নিয়ে সেখানে অনন্ত অসীম জীবন অবস্থান করতে হবে।"[১২] পরকালের চিন্তার মাধ্যমে একজন লোক তার ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সর্বস্তরে সুন্দর ও খোদাভীতির পথ বেছে নিয়ে কাঙ্ক্ষিত মনযিলে পৌঁছাতে সক্ষম

عدل ولا هم ينصرون -

অর্থাৎ "আর সেদিনকে ভয় কর যে দিন কেউ কারো কোন কাজে আসবেনা, কারো সম্পর্কে কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। কোন কিছুর বিনিময়ে কাউকে ছেড়ে দেয়া হবে না। এবং (পাপীদের) কোন দিক হতেই কোন প্রকার সাহায্য করা হবে না।[১৩]

(৪) নৈতিক প্রশিক্ষণঃ

ব্যক্তিগঠনে মহানবী (সঃ) এর অন্যতম মূলনীতি ছিল নৈতিক শিক্ষা দেয়া। কেননা নৈতিকতাই হলো সব জিনিসের মূল। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সঃ) এর হাদীস অত্যন্ত প্রনিধানযোগ্য-

عن مالك رضي الله عنه أنه قد بلغه رسول الله ﷺ قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

-

অর্থাৎ "ইমাম মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তার নিকট এই খবর পৌঁছেছে যে, নবী (সঃ) এরশাদ করেছেন, আমাকে নৈতিক চরিত্রের মাহাত্ম্য পরিপূর্ণ করে দেবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে।"[১৪]

মহানবীর (সঃ) সমাজ দর্শনের মৌলিক ধারা সমূহঃ

অধঃপতিত একটি সমাজের উন্নয়নে সমাজের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকারগুলোর নিশ্চয়তা বিধান অপরিহার্য। তাই মহানবী (সঃ) তাঁর দীক্ষিত নৈতিকতায় সমৃদ্ধ সাহাবীদের দ্বারা মানব সমাজের উন্নয়নকল্পে নিম্নোক্ত অধিকারগুলো নিশ্চিত করেন-

(১) সকলের জন্য মানুষ হিসাবে সম্মানজনক জীবন যাপনের অধিকারঃ

মহানবী (সঃ) ঘুনেধরা অধঃপতিত সমাজের উন্নয়নের জন্য সামাজিক সকল অস্পৃশ্যতা উচ্ছেদ করে, যাবতীয় কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য সম্মানজনক জীবন যাপনের অধিকার নিশ্চিত করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি প্রাক-ইসলামী যুগে চরমভাবে অবহেলিতা, নিপীড়নের বুলডোজারে নিষ্পেষিতা, সর্বোপরি অধিকার বঞ্চিতা নারী জাতি এবং দাস-সাদীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এ জন্যই মহানবী (সঃ) ব্যক্তিক পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা যিন্দেগীর প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর অধিকারের স্বীকৃতি দেন।

(২) ব্যক্তি স্বাধীনতাঃ

মহানবী (সঃ) প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য চিন্তা ও মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। মহানবী (সঃ) ভালোমন্দ গ্রহণ ও বর্জন এবং ধর্মীয় বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। ইরশাদ হচ্ছে- لا إكراه في الدين "দ্বীনের মধ্যে কোন জোর দবরদস্তি নেই।"[১৫] এ প্রসঙ্গে মহানবী (সঃ) দ্বীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, "সাদা-কালো, ধনী-গরীব, প্রভু-ভৃত্য এবং শাসক ও শাসিত নির্বিশেষে সব মানুষই সমান অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করবে।"[১৬]

(৩) প্রাণের নিরাপত্তাঃ

মানুষের প্রাণের নিরাপত্তা বিধান ঘোষণা করে মহানবী (সঃ) বলেন, "জীবনদাতা আল্লাহ্, মানুষতো একটি পিঁপড়ার ডানা সৃষ্টিরও ক্ষমতা রাখেনা। সুতরাং যে মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না তার পক্ষে অন্যের প্রাণ হরণের কি অধিকার থাকতে পারে?"[১৭] তাই মহানবী (সঃ) ঘোষণা করেন "নরহত্যা হারাম, কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে সে যেন গোটা মানব জাতিকেই হত্যা করল। আর কেউ কাউকে বাঁচালে সে যেন গোটা মানব জাতিকেই বাঁচাল।"[১৮]

(৪) ইজ্জত ও আবরুর নিরাপত্তাঃ

ইজ্জত ও আবরুর নিরাপত্তা মানুষের মৌলিক অধিকারের অন্যতম। কারো দোষ চর্চা করা, অপবাদ দেয়া ও উপহাস করা

১০. আবুল কালাম আযাদ "আলকুরআনের চারটি মূল দাওয়াতের পরিচয়" পৃষ্ঠা নং ৪৫।
১১. সূরা তাওবা, আয়াত নং ১২৮।
১২. আবুল কালাম আযাদ "আলকুরআনের চারটি মূল দাওয়াতের পরিচয়" পৃষ্ঠা নং ৮৯।
১৩. সূরা "বাকারাহ" আয়াত নং ৪৮।
১৪. মুয়াত্তা ইমাম মালিক।
১৫. সূরা বাকারাহ, আয়াত নং ২৫৬
১৬. আল হাদীস
১৭. আল হাদীস
১৮. সুরা মায়েদা
১৯. সূরা হুজরাত আয়াত নং ১১
২০. মুসলিম শরীফ, কিতাবুল মাসাফাত, পৃষ্ঠা নং ১৩৮
২১. বুখারী শরীফ, কিতাবুল মাযালিম
২২. সূরা হুজরাত, আয়াত নং ৯
২৩. "অগ্রপথিক" পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ) সংখ্যা ১৪১৮ হিজরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা নং ২৯৭
২৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ২৯৫-২৯৬
২৫. বুখারী শরীফ, কিতাবুল ইমান, বাবুল আদাব।
২৬. "অগ্রপথিক" পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ) সংখ্যা ১৪১৮ হিজরী, পৃষ্ঠা নং ২৯৮
২৭. সূরা হাশর, আয়াত নং ৯

CHISTYA METAL INDUSTRIES

চিশ্‌তিয়া মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ

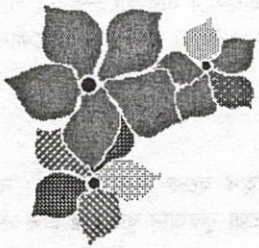

Proprietor
Md Shafiqul Islam

Office & Showroom:
235, Nawab Shirajudowla Road, Chawk Bazar, Chittagong-4203.
Phone: (Off.) 619489, Res.: 611674, Mobile: 011-214669.

তাফহীমুল কোরআনঃ যুগোপযোগী এক তাফসীর গ্রন্থ, ইসলামী আন্দোলনের গাইড বুক।

মোহাম্মদ রফিকুল হক*

ভূমিকাঃ

আল কুরআন মানব জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের এক অফুরান নেয়ামত । মহান রবের পক্ষ থেকে যুগে যুগে মানব জাতির প্রতি হেদায়াত আগমনের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ হেদায়াত। ইসলামী বিধিবিধানের মৌলিক উৎস এ আল-কুরআনের অর্থ অনুধাবন , রহস্য উন্মোচন এবং তদনুযায়ী কর্মপন্থা অবলম্বনেই মুসলিম মিল্লাতের, বরং সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ নিহিত। জীবনের প্রতিটি অনুষঙ্গে তাই আলকুরআনের দিক নির্দেশনা জেনে নিয়ে জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করার মহাপ্রয়াসে এই মহাদেশেও অসংখ্য তাফসীর রচিত হয়েছে। প্রতিটি তাফসীরই বাগানের নানা রঙ্গের নানা সুগন্ধি ফুলের সাথে তুলনীয়। এসব তাফসীর এর প্রত্যেকটির পরিচিতি ও বৈশিষ্টই আলাদা। আর তাফহীমুল কুরআনের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট এসব থেকে আলাদা কেন? এবং কোনদিক থেকে? এরই উত্তর সন্ধানের উদ্দেশ্যে আমাদের বক্ষমান এ প্রবন্ধ।

তাফহীমুল কুরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

(تفعيل) শব্দের ওজনে (تفهيم) শব্দের অর্থ হচ্ছে বুঝিয়ে দেয়া। তাই তাফহীমুল কুরআনের সহজ অর্থ দাড়ায় কুরআন বুঝিয়ে দেয়া। তাফহীমুল কুরআন তথা কুরআন বুঝাবার এক দরদ মাখা অন্তর নিয়ে যে এ মহাতাফসীর গ্রন্থ রচিত, এর অধ্যয়নকারী মাত্রই তা অনুধাবন করতে পারে বলেই আমাদের বিশ্বাস। এক্ষেত্রে মাওলানা মওদুদীর (রঃ) নিজের অভিব্যক্তি নিম্নরূপঃ

কিতাবের নাম থেকেই এটা স্পষ্ট, আমি এতে চেষ্টা করেছি যে সাধারণ শিক্ষিত লোকদেরকে কুরআন সেভাবে বুঝাব যে ভাবে আমি নিজে তা বুঝেছি। তার প্রকৃত অর্থ ও লক্ষ্য এভাবে খুলে বর্ণনা করব যে, মানুষ কুরআনের প্রাণ ও মূলতত্ত্ব পর্যন্ত পৌছতে পারে। সে সব সন্দেহ সংশয় দুরীভূত করবো এবং সে সব প্রশ্নের জবাব দিব, যা কুরআন কিংবা তার নিছক তরজমা পড়ে পাঠকের অন্তরে সৃষ্টি হয়; আর সে সব বিষয় সুস্পষ্ট করব, যেগুলি কুরআনে কারিম সংক্ষেপে বর্ণনা করেছে। [১]

---

* লেখক, শেষ বর্ষ, মাষ্টার্স, কুরআনিক সায়েন্সেস।

[১] মাওলানা মওদুদী ও তাফহীমুল কুরআন/ সম্পাদক হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ , পৃষ্টা ৬৪।

এ ব্যাপারে মাওঃ মওদুদী (রঃ) যা বলেনঃ- জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন শুরু করার সাথে সাথে আমি অনুভব করলাম যে, আমি আমার কলম ও জবান দ্বারা আল্লাহর দ্বীন যতই বুঝাবার চেষ্টা করিনা কেন, যে পর্যন্ত না স্বয়ং আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীন বুঝানোর চেষ্টা হবে, সে পর্যন্ত আল্লাহর দ্বীনের পূর্ণজ্ঞান অর্জিত হতে পারেনা।এ কিতাব দ্বীন বুঝানোর জন্য আল্লাহ নাযিল করেছেন। যদি দ্বীন বুঝাতেই হয়, তবে এ কিতাব বুঝানোরই চেষ্টা করা উচিত। যে পর্যন্ত মানুষ এটি না বুঝবে, সে পর্যন্ত তার জন্য এ উদ্দেশ্য বুঝাই সম্ভব নয়, যে জন্য আমি ও আমার জামাত কাজ করছি।[২]

যাদের উদ্দেশ্য করে এ তাফসীর গ্রন্থটি রচিতঃ

উদ্যোক্তাদের কাছে উৎপাদন বাজারজাত কালে যেমন ভোক্তাদের চাহিদা সামনে রেখে সরবরাহ করতে হয়, তেমনি কবি সাহিত্যিক , ঔপন্যাসিক ,প্রাবন্ধিক এমন কি বক্তাকেও পাঠক ও শ্রোতার চাহিদা সামনে রেখে লিখতে হয় বা কথা বলতে হয়। আল কোরআনে সমগ্র মানব গোষ্ঠির রসদ সামগ্রী মওজুদ থাকলেও কোন তাফসীরকারকের পক্ষেই মানুষের জ্ঞান মেধা বুদ্ধির পার্থক্য বিবেচনায় এনে একই তাফসীর গ্রন্থে সমান ভাবে সবার চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। তাই মাওঃ মওদুদী (রঃ) এ মহান তাফসীর গ্রন্থ খানা রচনা কালে যে বিরাট জনগোষ্ঠির চাহিদা কে প্রাধান্য দিয়ে তাফসীর খানা রচনা করেছেন তারা মূলত মাঝারি পর্যায়ের শিক্ষিত জনগোষ্ঠি। এ প্রসঙ্গে মাওলানা মওদুদী বলেন ঃ "এ তাফসীরটির মাধ্যমে আমি যাদের খেদমত করতে চাই তারা হচ্ছেন মূলত মাঝারি পর্যায়ের শিক্ষিত লোক। আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাদের কোন দখল নেই। কোরআনী জ্ঞানের যে বিশাল ভান্ডার আমাদের এখানে গড়ে উঠেছে তা থেকে লাভবান হবার সামর্থ ও যোগ্যতা তাদের নেই"।[৩]

অভিনব ও সুচারু বিন্যাসঃ

তাফসীরের শুরুতেই প্রসঙ্গ কথা ও একটি বিস্তারিত ভূমিকা , অতঃপর প্রতিটি সুরার শুরুতে সুরা সম্পৃক্ত বিষয়াবলী কেন্দ্রিক একেকটি ভূমিকা , অতঃপর সংশ্লিষ্ট সুরার একই বক্তব্য ধর্মী আয়াতগুচ্ছ উপস্থাপন ও সহজ সরল সাবলীল উর্দুতে তার ভাবানুবাদ পেশ, এবং সবশেষে অল্প শিক্ষিত ও আধুনিক শিক্ষিত জনগোষ্ঠির উপযোগী সহজ সরল ভাষায় প্রয়োজনীয় স্থানে সংখ্যাক্রমিক পাদটিকা দিয়ে সুবিন্যস্ত এ তাফসীর গ্রন্থ সাধারণের মাঝে এক অসাধারণ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

- প্রসঙ্গ কথায় মূলতঃ শাব্দিক অনুবাদের স্থলে ভাবানুবাদ গ্রহণের পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য এবং উভয় প্রকার অনুবাদের সুবিধা অসুবিধা , চাহিদা ও উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন।
- ভূমিকা অংশে কতিপয় মৌলিক বিষয়াবলী , গুরুত্ববহ শিরোনামে এমন কিছু জরুরী আলোচনার অবতারনা করেছেন পবিত্র কোরআন অধ্যয়নকারী মাত্রই যে গুলো জেনে নেয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।
- প্রতিটি সুরার শুরুতেই সে সুরার নামকরণ, শানে নুযুল , সুরার কেন্দ্রীয় বক্তব্য ও সাধারণ আলোচ্য বিষয়ের সাথে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য যে ভূমিকা তাফহীমুল কোরআনে সন্নিবেশিত হয়েছে তা পূর্ণ সুরাটিরই একটি সংক্ষিপ্ত পরিচায়ক বা সারমর্ম । ভুমিকা পাঠান্তে পাঠক যখন সুরাটি পাঠ করে , তার ভাবার্থ ও ব্যাখ্যামূলক টীকা পড়তে থাকে , তার মনে তখন সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে থাকে। আল কোরআনের পূর্ণ আহ্বান

---

[২] প্রাগুক্ত , পৃষ্ঠাঃ ৬৫।

[৩] সাইয়েদ আবুল আলা মাওদুদী / কুরআনের মর্মকথা , ঢাকা ঃ সাইয়েদ আবুল আলা মাওদুদী রিসার্চ একাডেমী, ৫ম সংস্করণ,১৯৯৭ইং. পৃষ্ঠা ৭।

কোরআন তাকে বুঝাতে চাচ্ছে।[৪]

- অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি ভাবানুবাদের আশ্রয় নিয়েছেন । কোন সুরার যতটুকু অংশকে একই বক্তব্য বলে মনে হয় একত্রে তা পেশ করে তার তরজমায় আলকোরআনের সাহিত্যিক ভাব এমন ভাবে তুলে ধরেছেন যে, কোরআন পড়ার সময় একজন আরবী জানা লোক যে স্বাদ অনুভব করে , তার মনে যে ভাবের উদয় হয় , অন্তরে যে চিত্র অংকিত হয় এবং তার উপর কোরআন যে প্রভাব বিস্তার করে উর্দু জানা লোকও এই তরজমা পড়ে তা উপলব্ধি করতে পারে।[৫]
- পাদটীকায় শব্দের জটিল আলোচনায় না গিয়ে যুগ সমস্যার কোরআনী সমাধান পেশ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি চেষ্টা করেছেন কোরআন পড়ার সময় পাঠকের মনে যে যে স্থানে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে পাঠক যথাযথ গুরুত্ব না দিয়েই চলে যেতে পারে - সেখানেই পাঠক কে একটু ভাবিত করতে। যেখানে পাঠকের মনে প্রশ্নের উদয় হতে পারে, চেষ্টা করেছেন সেখানেই তার জবাব দিতে।[৬]

তাফহীমুল কোরআনের এ সুবিন্যস্ত উপস্থাপনা গ্রন্থখানিকে পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় ও অধিকতর সহজবোধ্য করে তুলেছে।

ইসলামী আন্দোলনের গাইডবুক হিসাবে তাফহীমুল কোরআনঃ

আন্দোলন শব্দটি দোলন শব্দ থেকে নির্গত , এর অর্থ হচ্ছে নাড়ানো , কাপানো , নড়াচড়া করা । আরবী ভাষায় এ অর্থেই الحركة শব্দ দিয়ে আন্দোলন বুঝানো হয়। এর ইংরেজী প্রতিশব্দ Movement ।
একটি বিশেষ লক্ষ্যে পৌছার নিমিত্তে যাবতীয় চেষ্টা প্রচেষ্টাই আন্দোলন। আর ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত যাবতীয় চেষ্টা প্রচেষ্টাই ইসলামী আন্দোলন। অবশ্য ইসলামী আন্দোলনের যাবতীয় তৎপরতা ইসলামী শরীয়তের মৌলিক উৎস সমুহ তথা - কুরআন , সুন্নাহ , ইজমা ও কিয়াসের আলোকে এবং যুগে যুগে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আলোকে পরিচালিত হবে এটাই স্বাভাবিক। অন্যভাবে বলা যায়, একটি কাংখিত বিপ্লবই হচ্ছে কোন আন্দোলনের লক্ষ্য। আর কাংখিত ইসলামী বিপ্লবই ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য। আন্দোলন হল কর্মতৎপরতা আর বিপ্লব হচ্ছে তার ফলাফল।সুতরাং একটি কাংখিত ইসলামী বিপ্লবের জন্য পরিকল্পিত ও কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালিত যাবতীয় কর্মতৎপরতাই হল ইসলামী আন্দোলন। কালেমা তাইয়্যেবা হচ্ছে ইসলামী বিপ্লবের মৌলিক শ্লোগান। ইনকিলাবের অস্ত্র। মহাগ্রন্থ আলকুরআন সেই বিপ্লবের রূপ কাঠামো , সীমা পরিসীমা ও পরিধি ব্যাপকতার বিবরণদাতা ও সংরক্ষক, এর নড়াচড়া, গতি প্রকৃতি ও চলার পথের দিক নির্দেশনাদাতা-পরিচালক, ইসলামী বিপ্লবের রাজপথের সন্ধান দাতা এবং চলার পথের পাথেয় সরবরাহকারীও এই আলকুরআন। রাসুলে খোদা (সঃ) এর নবুয়তী জিন্দেগির সুদীর্ঘ ২৩ বছরে, ইসলামী বিপ্লবের পথে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে আন্দোলনের প্রতিটি মুহুর্তে সহযাত্রী রূপে এ আলকোরআনের অবস্থান। একটি কাংখিত বিপ্লবের রূপ কাঠামোর প্রয়োজনে জন্ম নেয়া আন্দোলন এবং চুড়ান্ত মনজিলে পৌছা পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সকল উপাদান সরবরাহে আলকোরআনের ভূমিকার দিকটি বিশ শতকের যে কয়টি তাফসীর গ্রন্থে ফুটে উঠেছে তার সর্বাগ্রে তাফহীমুল কুরআন। ইসলামী আন্দোলনের গাইডবুক হিসাবে এবং যুগসমস্যার সমাধানে তাফহীমুল কুরআনে আমরা নিম্নোক্ত গুণাবলী খুজে পাইঃ

• **জীবনের বৈষম্য দূরীকরণে তাফহীমুল কুরআনঃ-** আল-কুরআন জীবনের এক সুসামঞ্জস্য চিত্র পেশ করে। আলকুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের জীবন অবিভাজ্য। জীবনকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেক অংশের জন্য পৃথক পৃথক নীতি নির্ধারণ, জীবনের ঐক্য ও মানবের ব্যক্তিত্বকে একেবারে ধ্বংস করার নামান্তর। একই ব্যক্তি তার

---

[৪] মাওঃ মওদুদী ও তাফহীমুল কোরআন / সম্পাদনা হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ , পৃষ্ঠা - ৫৪
[৫] মাওঃ মওদুদী ও তাফহীমুল কোরআন / সম্পাদনা হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ , পৃষ্ঠা - ৫২
[৬] প্রাগুক্ত , পৃষ্ঠা ৫৩ ও ৬৩।

জীবনকে বিশৃঙ্খলা ও পারস্পরিক সংঘাতে ঠেলে দেয়ারই শামিল। ধর্ম ও রাজনীতি দুটি পৃথক পৃথক কর্মতৎপরতা এবং এদুটির জন্য পৃথক বরং বিপরীতমুখী নিয়ম রয়েছে, মাওঃ মওদুদীর মতে এ ধরনের মত উদ্ভট ও হাস্যকর। তিনি তাফহীমুল কুরআন ও তার অন্যান্য সাহিত্যে এ কথা বিশদ ভাবে বলেন যে, মানুষের চিন্তা ও কাজের সকল দিকের জন্যে একই ধরনের আইন ও একই ধরনের মূল্যবোধের প্রয়োজন।[৭]

- **জ্ঞানের এক পরিপূর্ণ বিশ্বকোষঃ** মাওঃ গুলজার আহমদ মোজাহেরী বলেন : ইলমের ময়দানে মাওঃ মওদুদীর যে বিশিষ্ট উচ্চ স্থান ছিল এবং সাহিত্য রচনায় তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সে সবের মূল্যায়ন করতে গেলে বহু গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হবে। তাঁর বহু সাহিত্যের মধ্যে তাফহীমুল কুরআন পড়ে দেখুন। এ তো একেবারে ধর্ম, রাজনীতি, ইতিহাস, অর্থনীতি, নৈতিকতা, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানের এক পরিপূর্ণ বিশ্বকোষ। এটি প্রত্যেক যুগের জন্য তাঁর একটা জীবন্ত ও শ্রেষ্ঠ অবদান।[৮]

- **বাতিল মতাদর্শের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণে ঃ** কাদিয়ানী মতবাদ ,পারভেজী মতবাদ , কমিউনিজম, পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ও এগুলোর অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে মাওঃ মওদুদী যে প্রকাশ ভঙ্গি, স্টাইল ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন সমকালীন আলেম ওলামারা সে বিষয়ে অপারগ ছিলেন। সে জন্যে এসব মতবাদের ধারক বাহকেরা মৌলভীসাহেবদের জন্য এতটা ভীত শংকিত ছিলনা, যতটা ছিল মাওলানা মওদুদীর জন্য। মাওলানা মোহতারামের এ এক বিরাট অবদান যে, তিনি আধুনিক দর্শনের মাধ্যমে ভ্রান্ত মতবাদের মোকাবেলা করেন এবং এ ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করেন।

ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের সাথে সমকালীন ভ্রান্ত মতাদর্শের সংঘর্ষের কারণ বিশ্লেষণ ও সেগুলোর অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণে তাফহীমুল কুরআন এক অনন্য বৈশিষ্টের অধিকারী।

- **যুগসমস্যার কুরআনী সমাধান পেশে তাফহীমুল কুরআন :** কুরআন শুধু দেখে দেখে পড়ার জিনিস নয়। তার সম্পর্ক মানুষের জীবনের সাথে। যতই তার জীবন সামনে চলতে থাকে ততই কুরআনের মর্ম তার কাছে খুলতে থাকে। এ হচ্ছে হেদায়াতের গ্রন্থ, যার কাছে মানুষ মনের শান্তির জন্য, আভ্যন্তরীন বৈষম্য, বৈপরীত্য থেকে বাচার জন্য এবং জীবনের সমস্যাবলীর সমাধান তালাশ করার জন্য বার বার স্মরণাপন্ন হতে হয়। [৯] তাই যুগজিজ্ঞাসার জবাবে এবং যুগসমস্যার কুরআনী সমাধান পেশে তাফহীমুল কুরআন অতুলনীয় এক তাফসীর গ্রন্থ।

- **সহজ সরল ভাষায় ইসলামী জীবনব্যবস্থা পেশঃ** ভাষার শক্তি ও প্রভাব ছাড়াও তাফহীমুল কুরআনে এ বিষয়ের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে যে , ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সুসামঞ্জস্য ভাবে যেন পাঠকের সামনে থাকে। কুরআন অধ্যয়নে যদি সে জীবন ব্যবস্থার কাঠামো পাওয়া না যায় , যার জন্য এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে এবং আল্লাহর নবী পাঠানো হয়েছে তাহলে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়না। সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী (রাঃ) সে জীবন ব্যবস্থার পূর্ণ চিত্র এবং প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে দিয়েছেন এবং সাথে সাথে তাফহীমুল কুরআনে মানবতার সে পৃষ্ঠপোষকের গোটা জীবনও অংকিত হয়েছে, যিনি ২৩ বছরে ডিজাইন মোতাবেক প্রাসাদ নির্মান সম্পন্ন করেছেন।[১০]

- **আন্দোলনী প্রেরণার উৎস ঃ** তাফহীমুল কুরআনের বৈশিষ্ট্য এমন যে, আপনি যতই তা পড়তে থাকবেন ততই আপনার মধ্যে ইসলামী আন্দোলনে অংশগ্রহনের আগ্রহ বাড়তে থাকবে। আপনার মন চাইবে যে, ভাল-মন্দের, হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বে আপনি ঝাপিয়ে পড়েন এবং জমিনের উপরে আল্লাহর ইচ্ছা পূরণ করে ছাড়েন। কুরআনে হাকীম

---

[৭] বিশ্বের মনীষীদের দৃষ্টিতে মাওঃ মওদুদী/ সম্পাদনা : আব্বাস আলী খান, ঢাকা: বইবিতান প্রকাশনী, ১৯৮৭ইং. পৃষ্ঠা:১১৭ .

[৮] প্রাগুক্ত , পৃষ্ঠা: ২২৫

[৯] বিশ্বের মনীষীদের দৃষ্টিতে মাওলানা মওদুদী , পৃষ্ঠা ১১৯.

[১০] প্রাগুক্ত , পৃষ্টা ২৫।

- **কুরআন মজিদের দাওয়াতী বৈশিষ্ট্য পেশ :** মানুষের সত্যিকার কল্যাণ, মানসিক শান্তি কুরআনের শিক্ষার আলোকে কাজ করার উপর নির্ভর করে। তাফহীমুল কুরঅনে বিষয়টি বলিষ্ঠ যুক্তি প্রমাণ সহ উপস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া এ তাফসীরের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, এতে কুরআন মজিদের দাওয়াতী বৈশিষ্ট সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এসব আলোচনায় বিশ্বাস ও ভালবাসার চিত্র প্রেরণামূলক ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে।[১২]

- **মনোজাগতিক বিপ্লব সাধনে তাফহীমুল কুরআন :** মাওলানা মওদুদীর বিরাট অবদান এই যে তিনি মুসলমানদের মধ্যে কুরআন অনুধাবনের সত্যিকার অর্থে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছেন। আলকুরআনের আলোকে সমাজ গঠনের কাজ প্রত্যেক মুসলমানের একটি অপরিহার্য দায়িত্ব- এ কথা তিনি ভাল ভাবে বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন । তাফহীমুল কুরআন বিরাট মানসিক বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। যুবসমাজের মাঝে কুরআনের প্রতি আগ্রহ বেড়ে চলেছে। তাদের মাঝে খোদাভীতি বাড়িয়ে দিয়েছে। শ্বাশত জীবন ব্যবস্থা ইসলামের প্রতি আস্থা ও নির্ভরতা সুদৃঢ় করেছে। এদিক থেকে তাফহীমুল কুরআন মিল্লাতে ইসলামিয়ার জন্য এক শক্তি সঞ্জিবনী গ্রন্থ।

উপসংহারঃ

ইসলামের পূর্ণাঙ্গরূপ উপস্থাপনায়, ইসলামী সমাজ বিপ্লবের পথ নির্দেশনায়, যুগসমস্যার কুরআনী সমাধানে, যুবসমাজের চিন্তা চেতনায় পরিবর্তন আনয়নে সর্বোপরি একটি আদর্শবাদী দলের যাবতীয় কর্মতৎপরতা নিয়ন্ত্রন ও পর্যবেক্ষণে তাফহীমুল কুরআন এক অনন্য সাধারণ যুগোপযোগী তাফসীর গ্রন্থ। দুনিয়ার কোন ভূ-খন্ডে ইসলামী বিপ্লব সংগঠিত হলে তার সংরক্ষণে শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্যন্ত তার গাইড বুক হিসাবেও তাফহীমুল কুরআন উজ্জল ভুমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

---

[১১] প্রাগুক্ত , পৃষ্টা ২৪।

[১২] মাওঃ মওদুদী ও তাফহীমুল কুরআন , পৃষ্ঠা:৮৫,৮৬ ।

والشعراء، ابن قتيبة، ج١، ص/١٠٤؛ كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، ج١٤، ص١٤٢.

١٣- الأدب العربي وتاريخه، د.عبد العزيز، ص٢٢٦ .

١٤- الرائد في الأدب العربي، إنعام الجندي، ج/١، ص/١٤٩ .

١٥- تاريخ الأدب العربي (العصر الإسلامي) ، د.شوقي ضيف، ص/٨٥

١٦- الأدب العربي وتاريخه، د.عبد العزيز، ص٢٢٦-٢٢٧ .

١٧- المرجع السابق ، ص ٢٢٦-٢٢٧ .

١٨- تاريخ الأدب العربي، أحمد حسن الزيات، ص١٤٦ .

١٩-تاريخ الأدب العربي، الزيات ص/١٤٧، تاريخ الأدب العربي (العصر الإسلامي)، د.شوقي ضيف،ص/٨٤-٨٥، الأدب العربي وتاريخه،د.عبد العزيز، ص/٢٢٧ .

٢٠-الاستيعاب، ابن عبد البر، ج/٣، ص/١٣١٥ .

٢١-المرجع السابق ، ص١٣١٥ .

٢٢- طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام الجمحي، شرح:أحمد محمد شاكر، د. ط، (مصر، دار المعارف) ج١، ص٨٣ .

٢٣- جرول: الحطيئة .

٢٤- تاريخ الأدب العربي (العصر الإسلامي)، شوقي ضيف، ص٨٤ .

٢٥- الاستيعاب، ابن عبد البر ج٣، ص١٣١٦ .

٢٦- تاريخ الأدب العربي-العصر الإسلامي ، د.شوقي ضيف، ص٨٨.

٢٧- في أدب الإسلام: محمد عثمان علي، ط/٢ ، (بيروت، دار الأوزاعي، عام ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م)، ص/١٧٠ .

٢٨- الأدب العربي وتاريخه، د.عبد العزيز، ص٢٢٨ .

٢٩- في أدب الإسلام ، محمد عثمان علي، ص١٧١ .

٣٠- الأدب العربي وتاريخه، د.عبد العزيز، ص/٢٢٩ .

٣١- تاريخ الأدب العربي-العصر الإسلامي، د.شوقي ضيف، ص٨٦ .

٣٢- المرجع السابق، ص٨٨ .

٣٣- في أدب الإسلام ، محمد عثمان علي، ص١٧١ .

٣٤- تاريخ الأدب العربي-العصر الإسلامي، د.شوقي ضيف، ص٨٥ ، الأدب العربي وتاريخه، د.عبد العزيز، ص٢٣٠ .

٣٥- المرجع السابق، ص٨٧ .

٣٦- تاريخ الأدب العربي-العصر الإسلامي، د.شوقي ضيف، ص٨٧ .

٣٧- الأدب العربي وتاريخه، د. عبد العزيز، ص٢٣١ ، تاريخ الأدب العربي-العصر الإسلامي-، د.شوقي ضيف، ص/٨٨ .

فلا تخافي علينا الفقر وانتظري فضل الذي بالغنى من عنده نثق

إن يفن ما عندنا فالله رازقنا ومن سواناولسنا نحن نرتزق[٣٦]

ومن حكمه قوله أيضا:

والسامع الذام شريك له ومطعم المأكول كالآكل

مقالة السوء في أهلها أسرع من منحدر سائل

ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل[٣٧]

فهذه هي المعاني و بعض النماذج منها التي قد ألفيناها عند شاعرنا كعب بن زهير – رضي الله عنه وأرضاه- ، وقد اكتفينا بذكرها خوفا من الإطالة والتطويل .

وفي الختام أوجه النداء والدعوة الجادة إلى جميع الكتاب والدارسين والباحثين للإسهام الوافر في هذا الميدان لرفع شأن الأدب العربي الإسلامي، ووضعه في موضع يناسبه ويستحقه، ولإثراء المكتبة الأدبية الإسلامية.

والله من وراء القصد. و نعم المولى و نعم الوكيل.

الهوامش:

١- تارخ الأدب العربي، أحمد حسن الزيات، ط/٢٤ دون ذكر دار النشر وتاريخ الطبع، مصر، ص١٤٦٠ .

٢- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر، تحقيق:علي محمد البجلاوي، ط/١، (بيروت : دار الجيل، عام١٩٩٢م)، ج٣ ، ص١٣١٣ .

٣-الأدب العربي وتاريخه، الدكتور عبد العزيز بن محمد الفيصل، ط/٣، (الرياض : مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، عام ١٤٠٨هـ)، ص٢٢٥ .

٤-تاريخ الأدب العربي ، الزيات ، ص/٥٢-٥٣

٥- الأدب العربي وتاريخه:الدكتور عبد العزيز بن محمد الفيصل،ط/٧ ، (الرياض : مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، عام ١٤٠٨هـ)، ص٢٢٥ .

٦- تارخ الأدب العربي (العصر الإسلامي)، الدكتور شوقي ضيف،ط/٧، (مصر، دار المعارف)، ص٢٥ .

٧-الأدب العربي وتاريخه، د.عبد العزيز، ص٢٢٥ .

٨-وفي رواية : وخالفت ،

٩- وفي رواية: على خلق ،

١٠- وفي رواية: لم تدرك،

١١- تاريخ الأدب العربي (العصر الإسلامي)، الدكتور شوقي ضيف، ص/٨٣-٨٤؛ تاريخ الأدب العربي، أحمد حسن الزيات، ص١٤٦-١٤٨؛ الأدب العربي وتاريخه، الدكتور عبد العزيز، ص/٢٢٥-٢٢٦؛ الرائد في الأدب العربي، إنعام الجندي، ط/٢، (بيروت، دار الرائد العربي)، ج١، ص١٤٩.

فهـذه المعاني استمـدها من القرآن الكريم صـدرت عن قناعتـه التامـة بالإسـلام وحرصـه على قومـه.

٤- الغـزل والوصـف:

إذا قرأنا شعر كعب بن زهير وجـدناه أنه لم يتخـل عن الغـزل والوصف في معظم قصائـده، إذ أنـه يراهمـا ركنين أساسيين من أركان القصيـدة ولاتتـم إلا بهمـا. ويبـدو أنه يأتي بهمـا لا عن رغبـة وقصـد بل من أجل تمام الشعـر، حتى أنـه لم يتركهما في قصيدتـه المشهورة "بانت سعاد" التي قالـها في حضرة الرسول-صلى الله عليه وسلم- بعـد إسـلامه، بل بـدأ بهمـا فقال:

بانت سعـاد فقلبي اليوم متبول متيـم إثـرها لـم يفـد مكبـول

وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول

فلا يغرنك ما منت وما وعدت إن الأمـاني والأحـلام تضليـل

فنـراه يستهـل القصيدة بالغزل إذ يذكـر سعـاد وفراقهـا، وأن قلبـه مرتهـن عنـدها فليس لها فكـاك، ثم يلـح في وصف سعـاد، ويشبهها بالظبي ويشبـه ريقهـا بالخمـر.(٣٤)

٥- المواعظ والحكم:

إننا نلفى كثيرا من الحكم والمواعظ في شعر كعب بن زهير، وليس غريبا عليه هـذا، فأبوه زهير كان من الشعراء الحكماء في الجاهلية. ولكن حكم كعب ومواعظه تتميز عن حكم أبيـه، فهي تتسم بالمعاني الإسلامية والفضائل النبيلـة، وإنها نتيجة إيمانه ورسوخ عقيدته، فكعب قد حسن إسلامه وتملك قلبه، فأخـذ يبـدو أثره في شعره، فتصدر عنه حكم ومواعظ يستوحيها من القرآن والسنـة، ومنها قولـه:

لو كنت أعجب من شيئ لأعجبني سعي الفتى وهـو مخبوء له القـدر

ليس الفتى لأمـور ليس يدركهـا فالنـفس واحـدة والهـم منتشـر

والمرء ما عاش محدود له الأمل لاتنتهـي العين حتى ينتهي الأثر(٣٥)

ومن حكمـه أيضا قولـه :

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما إلى آلـة حدبـاء محمـول

كما أننا نجـده يتـردد كثيرا أن الله يرزق عبـاده، فهـو الرازق ولايتركهم دونـه، ويقـول:

أعلم أني متى ما يأتيني قـدري فليس يحبسـه شـح ولا شفـق

قد يعوز الحازم المحمود نيـته بعد الثراء ويثري العاجز الحمق

أما الأغراض التي قال فيها كعب بن زهير الشعر بعد دخوله الإسلام، فهي لم تتغير إلى حد ما مما كانت في الجاهلية، فقد قال الشعر في المدح و الهجاء و الغزل والوصف والحكم و المواعظ والدعوة، إلا أنه يلتزم فيها بتعاليم الإسلام ومبادئه، ولايخرج عن الحدود التي رسمها الإسلام . وسنتناول هذه الأغراض فيما يلي:

١-المدح:

قد رأينا فيما سبق أن كعب بن زهير ألقى قصيدة فور دخوله الإسلام مدح فيها الرسول- صلى‌الله عليه وسلم- وصحابته – رضوان الله عليهم أجمعين- وقد أعجب به الرسول – صلى‌الله عليه وسلم- فخلع بردته وأعطاه إياها، وقد اشتهرت هذه القصيدة على امتداد التاريخ الإسلامي وتناقلها جيل بعد جيل، وهذا يدل على جودة معانيها وقوة أسلوبها وتأثير مضمونها.[٣٠]

وله قصائد أخرى في المدح قالها بعد إسلامه، لكنها لم تبلغ درجة"بانت سعاد".

ومن قصائد المدح التي قالها في مدح الأنصار حين أنكرت عليه قريش تعريضه لهم في قصيدة" بانت سعاد" وقالوا: " لم تمدحنا إذ هجوتهم"

و لم يقبلوا منه ذلك، فألقى هذه القصيدة، ومنها :

من سره كرم الحياة فلايزل — في مقنب من صالحي الأنصار

البـاذلين نفوسهم لنبيهم — يوم الهياج وسطوة الجبار

يتطهرون كأنه نسك لهم — بدماء من علقوا من الكفار[٣١]

٢- الهجاء:

إن كعب بن زهير قد قال الشعر بعد إسلامه في الهجاء، لكن هجاءه يختلف عما كانت عليه في الجاهلية، فهو ينهج منهج التعريض، ويبتعد عن ذكر الأسماء، فقد كان هجاؤه في الجاهلية لاذعا وقاسيا، غير أن هجاءه في الإسلام ينبئ عن التلطف، وعدم ذكر الأسماء، فهو يعلن لهاجيه أنه يصفح الصفح الجميل. ومنها قوله:

إن كنت لاترهب ذمي لما — تعرف من صفحي عن الجاهل

فاخش سكوتي إذ أنا منصت — فيك لمسموع خفا القائل[٣٢]

٣- شعر الدعوة:

إن كعب بن زهير قد قال الشعر في مجال الدعوة الإسلامية أيضا، فنجد أبياتا قالها في حياة الرسول- صلى الله عليه وسلم- يدعو فيها

قومه إلى الإسلام، وهي:

رحلت إلى قومي لأدعو جلهم — إلى أمر حزم أحكمته الجوامع

الجاهليـــة .

ومـــن الأغراض التي قال الشعـــر فيهـــا :

الفخـــر: فقـــد كان يفتخـــر بشعره وأصلـــه في مزينـــة .

الهجـــاء: إنه كان يقول الشعر في الهجـــاء، فقـــد كان يهجـــو زيد الخيـــل والمسلمين، كما أنه خـــص أخـــاه بـــجيـــر بالهجـــاء .

الغزل والوصف: ومن أغراض شعره في الجاهلية الغزل والوصف، فقـــد كان يبـــدأ قصيـــدته بالغزل ثم بالوصف، فغزلـــه ووصفـــه قريبان من غزل ووصف أبيه زهير لأنه تربى على يديـــه .

أســـــلوب شعـــره:

وأما أسلوب شعره فأسلوب متين، ويتصف بالتنقيح، لأنه اتبع طريقة والـــده في اختيار الألفاظ وجـــودة السبـــك.

ومن أجود شعره: قصيدته التي كان يفتخـــر فيها على مـــراد ، نـــذكر منها البيـــتين التالـــيين :

أتعرف رسما بين دهمان فالـــرقم إلى ذي مراهيط كما خط بالقلم

عفته رياح الصيف بعدي بمورها وأندية الجوزاء بالوبل والديم[٢٥]

أثـــر الإســـلام في شعـــر كعب:

لاشك في أن شاعرنا كعب بن زهير نـــراه دائمـــا أنه كان في شعره الجاهلي مفاخرا متوعدا مهـــددا، وكان لسانه قارعا لاذعا في الجاهلية، حتى إذا أسلم أخـــذت نفسه تصفو، وأخـــذ يستشعر معاني الإسلام الروحية،[٢٦] فمن المعروف أن الإسلام وتعاليمه كانت ترقق مشاعر الشاعر وعواطفه، فيـــرق شعـــره ويظهـــر أثـــر الإسلام فيـــه .

فإذا تصفحنـــا ديوان كعب بن زهير وتتبعنا شعره فيه، وجـــدنا لهجـــات تـــدل على تمسكه بدينه الحنيف،(٢٧) كما وجـــدنا أثر الإسلام فيه واضحـــا، ويأتي بمعان جديدة وحكم رائعة يمليها عليه دينه وعقيدته، بالرغم من أن شعره لم يتأثـــر كثيرا بإسلامه كما حـــدث لغيره من الشعراء الذين اعتنقـــوا الإسلام كـــ"حسان بن ثابت" وغيره، بل بقي كعب على طريقته وأسلوبـــه الذين كان عليهما في الجاهلية، في اختيار أغلب معانيه وفي اختيار ألفاظه وكلماته.[٢٨] فنجـــد ه يذكر الغزل والوصف والنسيب وغيرها من المعاني والأغراض التقليدية في معظم شعره حتى بعد إسلامـــه.

ونحن لانشك في إيمانه، بل كان مؤمنا حقا دخل قلبه الإيمان وأشرب به، وهذا ما نجـــده في كثير من شعره بعد إسلامـــه.[٢٩]

وفاتــه :

توفي شاعرنا كعب بن زهير –رضي الله عنه- عام ٢٦ هـــ [١٧] وفي قول آخر توفي عام ٢٤ هـــ [١٨] بعد ما ترك ثروة أدبية ومادية هائلة في الجاهلية والإسلام .

فرحـــم الله تعالى شاعرنا هـــذا و رضي عنه وعنا جميعـــــــا .

شعر كعب بن زهير:

لاشك أن كعب بن زهير من أبطال الشعر العربي في الجاهلية والإسلام، وشعره من أجود الشعر وأحسنه، فقد جمع بين الطبع و التنقيح .

فقد نشأ في روضة الشعر وباحة القريض، و إنه كان ينتمي إلى أسرة زاخرة بالشعراء والشاعرات؛ فجده شاعر، وأبوه من فحول الشعراء، وأخوه بجير شاعر، وابنه عقبة شاعر، وعمته سلمى شاعرة، وعمته الخنساء شاعـــرة أيضا، فقد اعتنى به والده زهير- أفحل الشعراء- ورباه ودربـــه على صوغ الشعر، فرسخت فيه ملكة الشعر، وتجلت شاعريته منذ صغره، فأخذ يقرض الشعر وهو دون المراهق، لكن أباه حال دونه فمنعه حتى امتحنه امتحانا شديدا، و اختبره اختبارا صعبا على نضج قريحته وسلامة طبعه، وعندما اطمأن زهير إلى ابنه أجازه لقرض الشعر، فاقتحم ميادينه وسلك مسلكه، حتى كاد أن يتعالى والده لولا غرابة في ألفاظه، وتعقيد في تراكيبه، وقصور في مطولاته .[١٩]

قال أبو عمرو- رحمه الله تعالى- : كان كعب بن زهير شاعرا مجودا كثير الشعـــر مقدمـــا في طبقتـــه هـــو أخـــوه بجيـــر، وكعب أشعـــرهما، وأبـــوهمـــا زهير فوقهمـــا.[٢٠]

وقال خلف الأحمـــر: لولا قصائد زهير ما فضلته على ابنه كعب.[٢١]

وقد اشتهـــر شاعرنا كعب بن زهير في الجاهلية، وكان من شعرائها البارزين، وقد عـــده ابن سلام الجمحي من شعراء الطبقة الثانية، وقدمه على كثير من المشهورين،[٢٢] بما أنه جمع بين الطبع والصنعة كما أشرت إليه آنفا.

ويـــدو واضحا مما يرويه ابن سلام أن كعب بن زهير قد اشتهر في الجاهلية أكثر مما اشتهر "الحطيئة" الشاعر المعروف، وهو أن الحطيئة جاءه وقال:"لقد علمت روايتي لكم أهل البيت و انقطاعي إليكم، وقد ذهبت الفحول غيري وغيرك، فلو قلت شعرا تذكر فيه نفسك وتضعني موضعا بعدك، فإن الناس لأشعاركم أروى وإليها أسرع." فقال كعب هذه القطعة:

فمن للقوافي شأنها من يحوكها؟ إذا مانوى كعب وفوز جرول[٢٣]

كفيتك لاتلفي من الناس واحدا تنخـــل منها مثل ما نتنخـــل

نثقفهـــا حتى تلـــين متونهـــا فيقصـــر عنهـــا ما يتمثـــل[٢٤]

فهـــذا يـــدل على أن كعبـــا كـــان أشهـــر مـــن الحطيئـــة .

شاكر عالم شوق*

المقـــدمـــة :

الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، الذي أعجز فصحاء العرب وبلغاءه إلى يوم الدين ، والصلاة والسلام على النبي العربي الأمي الذي أعطي جوامع الكلم والحكم ، وعلى آلـــه وصحبـــه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد، فإن اللغة العربية هي العين التي لاتنضب، والينبوع الذي لايغور، يلقي فيها دلوه كل وارد ، ويرتوي من معينها كل هائم وعطشان، ويستخرج من قعرها كل غواص و منقب أنواع الدرر وأصناف اللآلي عبر العصور والقرون، لكن خزائنها لاتنفد، بل تدر بجديد و نفيس في كل آن وحين .

فانطلاقا من هذا المبدأ السامي والحب العميق الصافي للغة العربية، أحببت البحث والدراسة حول شاعر من أشهر الشعراء وفحولهم في الجاهلية والإسلام، وحول شعره الرزين والمتين؛ ألا وهو الشاعر المخضرم **كعب بن زهير**، الذي لايكاد يوازيه شاعر غيره في أصالته الأدبية وصناعته الشعرية. فهو من أسرة جبلت على الشعر وطبعت عليه، فجـــده وأبوه وعمتاه وأخوه وابنه كلهم شعراء. كما أن قصيدته "بانت سعاد" التي أنشدها في حضرة الرسول الكريم-صلى الله عليه وسلم- فكساه بردته إعجاباً بها وإعزازاً لـــه، قد تحرك لها الوجود العربي منذ إلقائها، وذاع صيتها، فتناقلتها الألسن على مدى العصور ومر الأيام ، وتداولتها الأجيال جيلا بعد جيل إلى يومنا هـــذا .

أرجو من الله – الكبير المتعال- أن يوفقني لهذا، ويسدد خطاي، إنه تعالى ولي التوفيق ونعم الوكيل .

الشاعر المخضرم كعب بن زهير

اسمـــه ونسبـــه :

هو أبو عقبـــة [1] كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني، أو كعب بن زهير بن ربيعة بن رباح بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر.[2]

وأما نسبه فهو من قبيلة مزينة، و أمـــه من بني عبد الله بن غطفان، فهي كبشة بنت عمار بن عدي بن سحيم،[3] و أبوه زهير أحد الثلاثة الفحول في الجاهلية، وقد عرف بسداد رأيه، وجودة شعره، ووفرة ماله، وحنكته وحنفيته وحكمته،[4] و هو صاحب إحدى المعلقات السبع المشهورة .

---

*محاضر بقسم علوم القرآن والدراسات الإسلامية

٢-راجع: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، د/ محمود حمدي زقزوق، ط ١، كتاب الأمة ١٤٠٤هـ، ص ١٨.
٣- الاشتشراق: إدوارد سعيد، ترجمة: كمال أبوديب، مؤسسة الأبحات، ص ٣٩.
٤- لم الاهتمام بالاستشراق: د/ شكري النجّار، مجلّة الفكر العربي، العدد ٣١، ١٩٨٣ م، ص ٧١.
٥- انتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث، مالك بن نبي، دار الإرشاد، ١٩٦٩م، ص ٥٠.
٦- الدراسات العربية والإسلامية في أوربا، د/ ميثال جحا، معهد الإنماء العربي، ط ١، ص ٨٢.
٧- المستشرقون ومشكلات الحضارة، د/ عفاف صبرة، دار النهضة العربية القاهرة ١٩٩٠م، ص ٦.
٨- انتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث، مالك بن نبي، دار الإرشاد ١٩٦٩، ص ٥٠.
٩- راجع: انتشار الإسلام وموقف المستشرقين منه، د/محمد فتح الله الزيادي، ط ١، دار قتيبة ١٩٩١م، ص ٤٣.
١٠- قاموس المورد، منير البعلبكي، دار العلم للملايين، ١٩٧٩م.
١١- من مقال بعنوان (من زلات المستشرقين) عبد الوهاب حمودة، مجلة لواء الإسلام، العدد السادس، السنة الرابعة نوفمبر، ١٩٥٠م.
١٢- راجع: انتشار الإسلام و موقف المستشرقين منه، د/ محمد فتح الله الزيادي، ص ٤٤ ــ ٤٥.
١٣- الدراسات العربية والإسلامية في الجامعة الألمانية، رودي بارت ترجمة مصطفى ماهر، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر القاهرة، ١٩٦٧م ص.
١٤- الإسلام والحضارة الغربية، محمد حسين، ط ١. دار الإرشاد بيروت، ١٩٤٩م.
١٥- راجع: انتشار الإسلام وموقف المستشرقين منه، د/محمد فتح الله الزيادي ط، دار قتيبة ١٩٩٠م، ص. ٤٤ ــ ٤٥.
١٦- راجع: الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية، د. ساسي سالم الحاج، ج/١، ط ١، ١٩٩١م، ص ٢٧.
١٧- راجع: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، د. محمود حمدي زقزوق، ط ١، كتاب الأمة، ١٤٠٤هـ، ص ١٩.
١٨- المرجع السابق، ص ٢٠.
١٩- الاستشراق أهدافه ووسائله، د. محمد فتح الله الزيادي، ط ١، ١٩٩٨م، ص ٢٥.
٢٠- المرجع السابق، ص ٢٥.
٢١- المستشرقون البريطانيون أربري ترجمة، د. محمد النويهي، لندن ١٩٤٦ م،ص ٨.
٢٢ ــ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ط٢، ١٩٨٩م، الرياض، ص ٣٣.
٢٣- راجع: الاستشراق أهدافه ووسائله، د/ محمد فتح الله الزيادي، ط١، ١٩٩٨، ص ٣٣ــ٣٤.
٢٤- أجنحة المكر الثلاثة، عبد الرحمان حسن الميداني، ط ١، دار القلم، دمشق، ١٩٧٥ م.ص٢٠.
٢٥ ــ راجع: الاستشراق والمستشرقون، د. مصطفى السباعي، ط ١، دار السّلام،القاهرة، ص ٢٧-٢٨. وراجع: انتشار الإسلام وموقف المستشرقين منه، ص ٦٢ ــ ٦٣.
٢٦- الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، ص ٧٤.
٢٧- المرجع السابق، ص ٧٤- ٧٥.
٢٨- راجع: الاستشراق والمستشرقون، د/ مصطفى السباعي، ص ٢٩ ــ ٣٠.

وقد ظهرت تلك الأهداف التجارية في عصر ماقبل الاستعمار الغربي للعالم الإسلامي في القرنين - التاسع عشر والعشرين - فقد كان الغربيون مهتمين بتوسيع تجارتهم والحصول من بلاد الشرق على المواد الأولية لصناعتهم التي كانت في طريقها للازدهار . ومن أجل هذا وجدوا أن الحاجة ماسّة للسفر إلى البلاد الإسلامية والتعرف عليها ودراسة جغرافيتها الطبيعية و الزراعية والبشرية حتى يحسنوا التعامل مع تلك البلاد وتحقيق ما يصبون إليه من وراء ذلك من تحقيق فوائد كثيرة تعود على تجارتهم وصناعتهم بالخير العميم ؛ لذلك كانت المؤسسات المالية والشركات وكذلك الملوك فى بعض الأحيان يزودون الباحثين بمايحتاجون إليه من مال، كما كانت الحكومات المعنية تمنحهم الرعاية والحماية . (٢٦)

٣ - أهداف سياسية :

ظهرت تلك الأهداف السياسية واضحة جلية واتسع مداها باتساع رقعة الاستعمار الغربي للعالم الإسلامي فى القرنين- التاسع عشر والعشرين - واضطرت الدول الاستعمارية أن تعلم موظفيها فى المستعمرات لغات تلك البلاد ' وأن تدرس لهم آدابها ودينها ليعرفوا كيف يسوسون هذه المستعمرات ويحكمونها ، وقد اتجهوا في هذه المرحلة إلى العناية باللهجات العامية والعادات السائدة كما عنوا بالدين والشريعة. (٢٧)

٤ - أهداف علمية :

هناك صنف قليل من المستشرقين الذين اتجهوا إلى دراسة الإسلام والتراث العربي والإسلامي دراسة علمية خالصة تجلولهم بعض الحقائق الخافية عنهم وهم مع إخلاصهم في البحث والدراسة لايسلمون من الأخطاء والاستنتاجات البعيدة عن الحق ، إما لجهله بأساليب اللغة العربية وإما لجهلهم بالأجواء الإسلامية التاريخية على حقيقتها ، فيحبون أن يتصوروها كما يتصورون مجتمعاتهم ناسين الفروق الطبيعية والنفسية والزمنية التي تفرق بين الأجواء التاريخية التي يدرسونها وبين الأجواء الحاضرة التى يعيشونها .

وهذه الفئة أسلم الفئات كلها في أهدافها وأقلها خطراً ؛ إذ سرعان مايرجعون إلى الحق حين يتبين لهم . ومن هذه الفئة " توماس أرنولد" حيث أنصف المسلمين في كتابه " الدعوة إلى الإسلام " (٢)

ظهر في مكة ثم يضعف عدديا بل هو دائما في ازدياد واتساع ، ثم إن الإسلام ليس دينا فحسب بل من أركانه الجهاد . ولم يتفق قط أن شعبا دخل في الإسلام ثم عاد نصرانياً " (٢٤) وهذا هو الإسلام في المفهوم الغربي، ومن ثم فإن كل الجهود يجب أن تتوحد لتحويل المسلمين عن التمسك بعقيدتهم ولتحقيق هذا الهدف قاموا با لخطوات التالية :

أوّلا - التشكيك في رسالة محمد ﷺ، ويحاولون إبعاد صفة النبوة عن الرسول عليه الصّلاة والسلام ، ويفسرون بعض مظاهر الوحي التي كان يراها الصحابة عند نزول الوحي على النبي بأنها نوع من الصّرع أوالتخيلات الذهنية وأحيانا يرجعونها إلى أمراض نفسية قديمة وغير ذلك من تخبط المستشرقين فى تفسير مظاهر الوحي .

ثانيا - التشكيك في دستور الإسلام الخالدو المعجزة الباقية - القرآن الكريم - فهم يرون أن محمداً ﷺ استمد القرآن من كتب الأمم السابقة وحين يواجهون بالردود العلمية الصحيحة لايجد الكثير منهم إلا أن يقول : إن القرآن راجع إلى ذكاء محمد ﷺ وعبقريته وقوة بيانه...."

ثالثا - التشكيك في الدين الإسلامي نفسه، وأنه ليس دينا منزلاً من عند الله، بل هو مستمد من الديانتين اللتين سبقتا ظهور الإسلام وهما اليهودية والنصرانية، ويعللون لذلك بوجود نقاط التقاء بين الديانتين السابقتين والدين الإسلامي، وهذا ليس بمستغرب فهو راجع إلى وحدة الرسالات ومصدرها الواحد - وهو الله تبارك وتعالى .

رابعا - التشكيك فى صحة السّنة النبوية وذلك لماتمثله من دعامة متينة فى صرح الشريعة الإسلامية لكونها المصدر الثاني من مصادر التشريع ، ويستند المستشرقون فى دعوتهم هذه إلى مادخل فى رواية الأحاديث من دس وتحريف متناسين جهود العلماء فى تصحيح السّنة وإثبات مانسب إلى الرسول مما اختلق عليه .

خامسا - التشكيك في معظم جوانب التراث الإسلامي العلمي الحضاري، فهم يرون أن الفقه الإسلامي مستمد من الفقه الروماني ، ويرون أن اللغة العربية غير قادرة على مسايرة التطور العلمي حتى تظلّ الأمة العربية عالة على المصطلحات الغربية ، وكل ذلك بهدف إضعاف ثقة المسلمين بتراثهم الفكري والحضاري. (٢٥)

وتناولها في كتب ومقالات متعددة ، وذهب الدكتور محمد فتح الله الزيادى إلى أنه يمكن إجمال هذه الأهداف فى هدفين رئسين هما : هدف بنائي وهدف هدمي.

الأول - (الهدف البنائي) يتمثل في إقبال المستشرقين على التراث الإسلامي جمعاً و دراسة و تحقيقاً ونشرا وترجمةً بقصد الاستفادة العلمية من علوم ومعارف الأمة العربية التي وصلت أعلى سلّم التقدم العلمي عند قيام حركة الاستشراق ، ولم تكن هذه الاستفادة جوانب مادية فقط ، وإنما شملت جوانب عقدية تمثلت في محاولة التعرف الدقيق على العقيدة التي كانت سببا وراء قيام هذه الحضارة ولذلك تخصص عدد كبير من الأوربيين في دراسة القرآن من جميع جوانبه وفي السنة النبوية والفقه والتاريخ الإسلامي وغيرها من المجالات ، ولكن استفادتهم وقفت عند الحد المعرفي ولم تتجاوزه إلى الجانب التطبيقي .

الثاني - (الهدف الهدمي) ويراد به هدم أواصر الترابط بين إنسان هذه الحضارة و بين عقيدته وذلك من أجل ألا تتجدد هذه الحضارة التى أريد لها الاندثار، ليخلو المجال لحضارة الغرب المادية وتحقيقاً لهذا تتابعت الدراسات غير العلمية التي قدمت التراث الإسلامي في شكل مشوه واعتمد على الحذف والتغيير وسوء الاستنتاج ، وتفسير الوقائع على غير حقيقتها وحتى على الكذب والتزوير المتعمد أحياناً. (٢٣)

وذهب كل من الدكتور مصطفى السباعي، والدكتور محمود حمدي زقزوق إلى أن للاستشراق أهدافا دينية وسياسية وتجارية وعلمية وأنا أجمل فيما يلي خلاصة تلك الأهداف :

١- أهداف دينية :

ولعلّ من أهداف المستشرقين : هي محاولة إعطاء صورة مشوهة عن الإسلام كدين وعن الشرق كحضارة وعن العربية كتراث و قومية، وتحطيم الإسلام من داخله عن طريق تشكيك المسلمين فى كتابهم ونبيهم وتراثهم حتى يتم فصلهم عن دينهم وتفتيت وحدتهم ؛ لأن فى تمسكهم بهذا الدين وحد، من شأنها أن تهدد الكيان الغربي ولأن في تمسكم بهذ الدين رقيا وتقدماً وحضارة مادية ومعنوية من شأنها أن تؤثر فى مجرى حضارة الغرب المادية الزائفة ، وهذا التخوف والحذر من العقيدة الإسلامية لم يعد سرًا بل أعلن عنه كثير من المستشرقين فى بحوثهم ومؤلفاتهم ومجلاتهم العلمية . وهاهى مجلة العالم الإسلامى تقول :"إن شيئاً من

المسلمين عسكريا وهم متمسكون بدينهم ولكن يتم قهرهم والسيطرة عليهم يجب الفصل بينهم وبين دينهم عن طريق ما عرف فيما بعد بالغزو الفكري الذي كان الاستشراق أحد أهم مظاهره، ونتيجة لهذه القناعة توالت الكنيسة هذا العمل وقامت برعاية كل الجهود الرامية إلى تعلم العربية، وفهم الدين الإسلامي ' وهي الجهود التي تطورت بعد ذلك لتكون حركة الاستشراق. (٢٠)

٦- وأخيراً فإن البعض يرجع نشأة الاستشراق إلى القرن الثامن عشر، متخذاً من حملة "نا بليون" على مصر نقطة انطلاق الحركة الاستشراقية وعلى الرغم من أن هذه الحملة عسكرية إلّا أن اصطحاب نابليون معه مطبعة وعدداً من العلماء والباحثين هو الذي دفع إلى القول بأنها بداية الاستشراق.

ولا يفوتني أن أذكر بهذه الصدد بأن أوّل استعمال لكلمة مستشرق (ORIENTALIST) كان سنة ١٦٣٠ م حين أطلق على أحد أعضاء الكنيسة الشرقية. ثم في سنة ١٦٩٠ م وصف صمويل كلارك بأنه استشراقي نابه حين عرف بعض اللغات الشرقية. (٢١)

ولم يظهر مفهوم الاستشراق (ORIENTALISM) في أور با إلّا في نهاية القرن الثامن عشر ' فقد ظهر أولاً في إنجلترا عام ١٧٧٩ م، وفي فرنسا ١٧٩٩م، كما أدرج في قاموس الأكاديمية الفرنسية ١٨٣٨م. (٢٢)

أهداف الاستشراق :

سؤال : يترد دائما في أذهان الباحثين والمفكرين ممن تناولوا علاقة الشرق بالغرب وهو : ما الهدف من اهتمام الغربيين بالشرق؟ الآلاف من المستشرقين الباحثين في مختلف نواحي الحضارة العربية ' عشرات اللغات المستخدمة في دراساتهم، المئات من المؤسسات والجامعات التى تفتح أبوا بها لاحتضان ورعاية هذه الدراسات، كل ذلك يجري لدراسة حضارة غريبة عنهم، ومن هنا يزداد السؤال تشعباً، هل كل الأمم اهتمت بحضارات بعضها بنفس القدر الذي اهتم به الأوربيون بالحضارة العربية ؟ أيكون اهتمام الأوربيين بالحضارة العربية في إطار الاستفادة العلمية كما استفاد العرب من حضارات من سبقهم ؟ كل هذه الافتراضات قائمة في ميدان البحث العلمي ' والإجابة عنها قد تكون ميسرة الآن، حركة

نشأت بجهود عفوية ثم ما لبثت أن تطورت لتكون حركة منظمة لها كوادرها، ومؤسساتها المختلفة، والباحثون يختلفون كثيرا في تحديد تاريخ معيّن لظهور الاستشراق تبعا لاختلافهم في المراد منه أهو مجرد زيارة الشرق أم هو الكتابة حوله ؟ خاصّة تلك الكتابات الوصفية الأولية أم هو التعمق في الدراسات المتصلة بالشرق لأي غرض كانت هذه الدراسة وهكذا ونيتجة لاختلاف المراد من الاستشراق توسع بعض الباحثين في نشأته فرده بعضهم إلى فترة ما قبل الميلاد، وتطرّف آخرون ليردوا نشأته إلى حملة "نابليون" على مصر متناسين كل ما سبقها من جهود غربية لفهم الشرق والتعرّف عليه . هذا ويمكن حصر آ راء الباحثين في تاريخ الاستشراق في النقاط التالية :

١ــ ذهب بعض الباحثين إلى أن الاستشراق بدأ في القرن السادس قبل الميلاد والمراد بالاستشراق عندهم : هو زيارة الشرق ومعرفة تقاليدهم دون التدخل في الجانب العلمي أوالديني أوالسياسي كالمورخ اليوناني الإغريقي "هيردوتس" الذي زار الشرق وكتب عنه وهو أول مستشرق . (١٦)

٢- يرجع بعض الباحثين نشأة الاستشراق إلى أواخر القرن السابع الميلادي- في العهدالأموي ــ ويستندون في ذلك إلى كتابات بعض المسيحين عن الإسلام أمثال "يوحنا الدمشقي" (٦٧٦-٧٤٩) العالم النصراني الذى قام بدراسة الإسلام بقصد التشويه ولأجل حماية إخوانهم النصارى ــ ومن بين مصنفاته : محاورة مع مسلم، إرشادات النصارى فى جدل المسلمين. (١٧)

٣ــ ويرى الكثرة من الباحثين أنه نشأ في القرن العاشر الميلادي حين بدأت التلمذة الغربية على الشرق التي كان رائدها الراهب "جربرت" الذي تعلم العربية في قرطبة ثم عاد إلى بلاده ليتولى البابوية تحت سلفستر الثاني. (١٨)

٤ــ وهناك من يقول : إن الاستشراق نشأ في القرن الثاني عشر ويستدل على ذلك بظهور أول إنتاج استشراقي تمثل في أوّل ترجمة لمعاني القرآن وكذلك ظهور أول قاموس لاتيني عربي. (١٩)

٥ــ وذهب بعض الباحثين إلى أنه بدأ منذ القرن الثالث عشر الميلادي ويرى أن الاستشراق

في مجموعها على الطّلب ومن ثم فإن الاستشراق هو طلب الشرق، وتحت هذا المعنى تدخل مفاهيم عديدة، فزيارة الشرق أو الاهتمام أوالكتابة عنه أو القراءة حوله أو التخصص فيه أو استعماره كلها تسمىّ استشراقا... ولكن المعنى اللغوي عادة لايسعف بتحديد المعاني نظرا لاتساعه وشموله لمعانى متعددة ولذلك و انطلاقا من المعنى اللغوي ذاته فإننا محتاجون إلى فهم مصطلح الشرق محور القضّية وأول ما يتبادر إلى الذهن هو المعنى الجغرافي للكلمة وهو غير مراد على الإطلاق ؛ لأن تحديد الشرق جغرا فيّا يختلف من جهة إلى أخرى تبعاً للجهة المحدد منها ،فالشرق بالنسبة للألماني هو غير الشرق بالنسبة لليابابي وهكذا . (١٣)

ولذلك يجب النظر إلى هذه الكلمة من زاوية تاريخية أساسها أن حكمة الله تعالى اقتضت أن يخضع العالم إلى سيطرة قوتين كبير تين تحققان التوازن إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب ، تمثل ذلك في الصراع بين الفرس والروم ثم بين المسلمين والروم ثم بين المسلمين والصليبيين ثم بين العثمانيين والأوربيين ثم كان آخر فصول هذه الملحمة الصّلات بين الشرق ممثلا في آسيا وأفريقيا وبين الغرب ممثلا في أوربا وأمريكا. (١٤)

وهكذا يمكن أن نقف على مدلول أولي لمصطلح الاستشراق فهو طلب الشرق - الذي هوآسيا وأفريقيا - من قبل الغرب -الذي هو أوربا وأمريكا - ولكن مانوعية هذا الطلب ؟ فالذي رأى الاستشراق من زاوية معرفية قال : إن الاستشراق هومعرفة الغربيين بالعالم الشرقي ، أو هو اتجاه الغربيين للبحث أو التخصص في الشرق، ومن رآه من زاوية سياسية قال إن الاستشراق هو جهود الغربيين لمعرفة الشرق والسّيطرة عليه ، أو هو الأسلوب الغربي للسيطرة على الشرق.

ويقول الدكتور محمد فتح الله الزيادى حول هذه القضية مايلي : "وأخيرا فإني أعتقد أن إنتاج المستشرقين هو الذي يساعد في إدراك مصطلح الاستشراق ، فمن المعروف أن المستشرقين قد ركزوا أبحاثهم واهتما ما تهم حول قضية معينة من قضايا الشرق وهي الإسلام والعروبة . ومن هنارأى بعض الباحثين أن الاستشراق له مفهومان: أحدهما عام ويقصد به كل الدراسات الغربية التي تعرضت لحضارة العرب والمسلمين . وخاصة تلك التي اتصفت بالدس والتشويه . ومفهوم خاص أو أكا ديمي: وهو الدراسات الغربية التى تناولت الشرق من جميع جوانبه الدينية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية". (١٥)

٢- المستشرقون اصطلاح يشمل طوائف متعددة تعمل في ميادين الدراسات الشرقية ، فهم يدرسون العلوم والفنون ، والآداب والديانات والتاريخ وكل ما يخص شعوب الشرق : مثل الهند والفارس والصين، واليابان والعالم العربي وغيرهم من أمم الشرق. (٧)

٣- إننا نعني بالمستشرقين الكتاب الغربيين الذين يكتبون عن الفكر الإسلامي وعن الحضارة الإسلامية . (٨)

٤- المستشرق هو عالم غربي يهتم بالدراسات الشرقية ' فلا بد أن يتوافر في هذا المستشرق الشروط الواجب توافرها في العالم المتخصص المتعمق حتى ينتج ويفيد البشرية والحضارة بإنتاجه العلمي ولابد أن ينتمي هذا العالم إلى الغرب ..... (٩)

٥- ويقول البعلبكي : "المستشرق هو الدارس للغات الشرق وفنونه وحضارته". (١٠)

٦- أما "إدوارد سعيد" فيقول : إن لفظ الاستشراق لفظ أكاديمي صرف ، والمستشرق هو كل من يدرس أو يكتب عن الشرق أو يبحث فيه وكل ما يعمله هذا المستشرق يسمى استشراقاً . (١١)

٧- ويقول الأستاذ عبد الوهاب حمودة : "المستشرق كل من تجرد من أهل الغرب إلى دراسة بعض اللغات الشرقية ، كالفارسية والتركية والهندية والعربية وتقصي آدابها طلباً لمعرفة شأن أمة أو أمم شرقية من حيث أخلاقها وعاداتها وتاريخها وديانتها أو علومها وآدابها إلى غير ذلك.

ومن خلال عرض التعريفات المختلفة يبدو أن الباحثين يكادون يجمعون على تحديد المستشرق ، بأنه كل من تخصص فى دراسة الشرق أوفى جانب من جوانبه المختلفة إلا أنهم يختلفون في هوية الذى يمكن أن يسمى مستشرقا ، فمنهم من يخصص الكلمة لكل من يتخصص فى دراسة الشرق سواء كان غربيا أم شرقيا ومنهم من يخرج الشرقي من دائرة المستشرقين باعتبار أنه غير غريب على الشرق حتى يستحق مصطلحا خاصا والذي أود الإشارة إليه هنا هو أن المتبادر إلى الذهن أن المستشرق من تخصص في دراسة الإسلام والعرب من غير المسلمين ، ولعل هذا راجع إلى أن معظم بحوث هذه الفئة تركزت حول العرب والإسلام .

ويقول الدكتور محمد فتح الله الزيادى حول ذلك : " والحقيقة أنه رغم ما عرف به الباحثون المستشرق فإنه في نظري تبقي كلمة المستشرق تدل دلالتين أكاديمية وهي ما تنا ولها الباحثون من التعريفات ، وعامة وهي كل من تعرض لحضارة العرب والإسلام بالدراسة وخاصة من اتصف بالدس والكيد على الإسلام" . (١٢)

مصطلح الاستشراق : (ORIENTALISM)

اختلف الباحثون كثيرا في المراد من مصطلح الاستشراق ، وتعاريفهم له تأخذ اتجاهات متعددة تبعا لموقفهم منه ، فبينما يري البعض أنه ميدان علمي من ميادين الدراسة والبحث ، يتجه آخرون إلى اعتباره مؤسسة غربية ذات أهداف متعددة، في حين يرى بعض الباحثين أنه ظاهرة طبيعية تولدت عن حركة الصراع بين الشرق والغرب ، أوفي أضيق نطاق بين الإسلام والمسيحية وبا ستعراض لبعض هذه التعريفات يمكن أن نتبين هذه الاتجاهات التي ينتهجها الباحثون في النظرة إلى مفهوم الاستشراق .

إن كلمة "الاستشراق " مشتقة من الشرق وهي تعني طلب الشرق ، ومشرق الشمس ، ومن ثم تدل الكلمة على الاهتمام بما يحويه الشرق من علوم ومعارف وسمات حضارية متنوعة ، ويكون المستشرق هو الإنسان الذي وهب نفسه للاهتمام بمايدور في الشرق من مجالات مختلفة . (١)

وفيما يلي أقدم تعريف بعض الباحثين :

١ــ الاستشراق هو علم الشرق أوعلم العالم الشرقي ، وهو ذو معنيين : عام يطلق على كل غربي يشتغل بدراسة الشرق كله : أقصاه ووسطه وأدناه في لغاته وآدابه وحضارته وأديانه . ومعني خاص : وهو الدراسة الغربية المتعلقة بالشرق الإسلامي في لغاته وتاريخه وعقائده... (٢)

٢ ــ الاستشراق هو المؤسسة المشتركة للتعامل مع الشرق بإصدار تقريرات حوله وبوصفه وتدريسه والاستقرار فيه وحكمه وهو بإيجاز أسلوب غربي للسيطرة على الشرق واستبنائه وامتلاك السيّادة عليه . (٣)

٣ـ الاستشراق أسلوب غربي لفهم الشرق والسيطرة عليه ومحاولة إعادة توجيهه والتحكم فيه . (٤)

٤ــ الاستشراق هو مصطلح أومفهوم عام يطلق عادة على اتجاه فكري يعني بدراسة الحياة الحضارية للأمم الشرقية بصفة عامّة ودراسة حضارة الإسلام والعرب بصفة خاصّة . (٥)

مصطلح المستشرق : (ORIENTALIST)

ولأجل الاختلاف في تحديد مفهوم كلمة "الشرق" و"استشراق" ينشأ عنه اختلاف في تحديد المستشرق من هو ؟ وفيما يلي أذكر بعض التعريفات التي عرفها الباحثون :

وجدت أعداء ومعاندون ، وتعرضت الدعوة الإسلامية لشتى ألوان المعارضة والمقاومة ، وقد تعددت مظاهر هذه المعارضة عبر فترات التاريخ الإسلامي ، واختلفت باختلاف الظروف والأحوال والبيئات . فبينما كانت إيذاء شخصيا ومناوشات متنوعة في العهد المكي ، كانت مجابهة مسلحة وصداما قويا في فترة ما بعد الهجرة ، وبينما كانت بين المسلمين وبين قريش وحلفائها في الفترة الأولى ، نراها تتسع بعد تأسيس الدولة الإسلامية لتشمل أعظم قوتين في ذلك الوقت الفرس والروم.

وهكذا استمر الصراع بين الدولة الإسلامية ، وبين المعاندين والمكابرين في كل عصر من عصور التاريخ الإسلامي إلى أن أطل القرن الحادي عشر الميلادي والذي شهد تفجر أكبر صراع بين المسلمين وبين المسيحيين الذين شنوا حربا تحمل الصليب شعارالها ، وتتحرك من حقد صليبي كنسي سافر - وكان الهدف من الحروب الصليبية هو الاستيلاء على أماكن المسلمين المقدسة، وتدميرهم حتى لا يقف الإسلام - كما يظنون- حجر عثرة أمام تقدم وانتشار المسيحية . هذا بالإضافة إلى الأطماع الاستعمارية التي حركت نبلاء أوربا وجعلتهم يتحالفون مع الكنيسة ، ويتظاهرون بحماية الصليب وما كانوا في الواقع يريدون إلا السيطرة على أراضي المسلمين والا ستحواذ على كنوز الشرق ولكن حملاتهم هذه باءت بالفشل وبقي الإسلام قويا شامخا يتقدم وينتشر بين أمم العالم في سرعة مذهلة .

وحينما انتهت الحروب الصليبية تغيّر أسلوب المجابهة والمقاومة للإسلام وأصبح يعمد الحرب الفكرية التي تعتمد على التشويه والتشكيك لتنفير الناس من اعتناق هذا الدين وبالتالي وقف تقدمه وانتشاره . ولقد تحمل المستشرقون وأعوانهم مهمة تحقيق هذا الهدف ، وذلك عن طريق دراسة الإسلام فكراً وثقافةً وحضارة ثم الكتابة عن هذا الدين وإظهاره في قالب يبرز المفهوم الغربي ويخفي ما عداه من المفاهيم .

وللمستشرقين أهداف خطيرة ووسائل متنوعة لتوصيل أفكارهم ونظرياتهم سواء كان للعالم الغربي أو للشعوب الآخرين، ومن هنا تبدو خطورة عمل المستشرقين وأبحاثهم فنحن -المسلمين- علينا أن ننتبه ونتتبع أبحات الغربيين التي تمتلئ بها الصحف والمجلات والكتب يومياً ، ونتقبّل، ونشكر ونشجع ما كان صحيحاً ، ونرفض وندحض ما كان باطلاً ، كاذبا وافتراءً . ومن هذا المنطلق فقد وقع اختياري على هذا الموضوع . وقبل أن أخوض في

☆ محاضر قسم علوم القرآن والدراسات الإسلامية ، الجامعة الإسلامية العالمية ، شيتاغونغ .

طبق الأرض إلى طبق القمر، وقد شاهد ذلك الحدث ملايين الناس من على شاشات التلفزة . وبين عامي ١٩٦٩ و ١٩٧٢ م وطئ الإنسان أرض القمر سبع مرات .

وفي ١٤ أيار "مايو" سنة ١٩٧٣، أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية أول محطة فضائية أسمتها مختبر الفضاء (Skylab) وهي اسطوانية الشكل طولها ١٥ مترا، وعرضها ٦،٦ أمتار، ووزنها ٧٠ طنا، وهي بشكل الطبق، وقد انتقل إليها من طبق الأرض ثلاث مجموعات من رواد الفضاء، فأمضت المجموعة الأولى ٢٨ يوما، والثانية ٤٥ يوما، والثالثة ٨٤ يوما، ثم رجعت هذه المجموعات إلى طبق الأرض.

وفي سنة ١٩٧٦م التحمت المركبة الروسية " ساليوت " (Saliot) بالمركبة الفضائية "أبولو" واسمها حرفيا "الطبق أبولو"، وانتقل أفراد المركبات من طبق اصطناعي إلى آخر .

أخيرا، يخطط علماء الفلك اليوم لبناء محطات فضائية عملاقة سابحة في الفضاء الخارجي لكي ينتقل الإنسان منها إلى كواكب أخرى .

هذا والآيات الكريمة المشار إليها تعطي فكرة واضحة عن الإعجاز العلمي أو التحدي التاريخي في القرآن الكريم، أو ما أسمينا بالجدلية العلمية المنطقية في القرآن الكريم، فلقد أقسم المولى بالشفق و"الليل" و"القمر" بأن الإنسان سيركب طبقا عن طبق أي سينتقل من سماء إلى سماء، هذا ما حصل بعد قرون من التنزيل، ثم اتبع قسمه بقوله: ((فمالهم لا يؤمنون . وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون))[1] بمعنى: لماذا لا يؤمن الإنسان وقد رأى الإعجاز في خلق الشفق، والليل وما يحويه من كائنات، والقمر، وتحقق كذلك مما أنبأه المولى بأنه سيركب طبقا عن طبق؟ !![2]

وفي الختام، لا يسعني إلا أن أقول: لقد كان مقالي هذا بمثابة التمهيد لتلك القضية الكبرى، ولكني اقتصرت على ما ذكرت حسب ما اتسعت له مساحة البحث في المجلة، وله بقية بإذن الله تعالى. وأقول ذلك معتذراً عن عدم دخولي في البحث على النحو الذي يجب أن يكون، والله الموفق لا رب سواه . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

---

[1] سورة الانشقاق: ٢٠-٢١.

[2] من علم الفلك القرآني ص١٢٨-١٢٩.

لتركبن طبقا عن طبق

قال الله تعالى :((فلا أقسم بالشفق. والليل وما وسق. والقمر إذا اتسق. لتركبن طبقا عن طبق)) [٢]

جاء في لسان العرب أن الطبق غطاء كل شيء، طبق الأرض وجهها، والسماوات الطباق سميت بذلك لمطابقة بعضها بعضا أي بعضها فوق بعض .

وفي الحديث : "لله مائة رحمة كل رحمة منها كطباق الأرض" [٣].

وعن صفات المولى "حجابه النور لو كشف طبقة لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره" [٤]

وعن الصحابي الجليل ابن مسعود –رضي الله عنه– قوله في معنى"لتركبن طبقا عن طبق": لتركبن السماء حالا بعد حال. وعن الزجاج: لتركبن طبقا عن طبق من أطباق السماء.

أقسم المولى بالشفق والليل والقمر بأن الإنسان سيركب طبقا عن طبق .

ولقد ظل الإنسان يحلم بالطيران والانتقال من طبق الأرض إلى أطباق السموات منذ القدم إلى أن تحقق حلمه هذا منذ القرن الثامن .

وهذه – بالأرقام – المحطات التاريخية الكبرى الناجحة في انتقال الإنسان من طبق الأرض إلى أطباق السموات، في ٢١ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٧٨٣م انتقل الإنسان بواسطة المنطاد (Ballon) من طبق الأرض إلى طبق الغلاف الجوي الأولى المسماه " بالتروبوسفار " (Troposphere) فارتفع الفرنسي المدعو "روزيه" مئات الأمتار فوق باريس لمدة خمس وعشرين دقيقة .

وفي ١٧ كانون الأول "ديسمبر" ١٩٠٣م انتقل الأخوان "رايت" على متن أول طائرة بنياها بنفسيهما، ولمدة عشرات الثواني فقط – من طبق الأرض إلى الطبق السفلى من الغلاف الجوى الأرضي أيضا .

وفي ١٨ آذار "مارس" ١٩٦٥م ركب أول إنسان الفضـــاء الخارجي، إذ مشى الرائد "ألكسي ليونوف" (Alexi Leonov) خلال ١٢ دقيقة على طبق الفضاء الخارجي بعيدا عن جاذبية الأرض التي انتقل منها بواسطة المركبة "فوسكود" (Voskhod)

---

[1] المرجع السابق ص١٢٦بتصرف.

[2] سورة الانشقاق:١٦-١٩.

[3] رواه مسلم - بنحوه - رقم الحديث ٤٩٤٦؛ مسند أحمد رقم : ٢٢٦٠٥ .

[4] رواه مسلم - بنحوه - رقم الحديث ٢٦٣

إلينا، وثلاثين ألف سنة حتى يصل إلى مركز مجرتنا اللبنية، و٢٠٠ ألف سنة حتى يدور حولها، وعشرة مليارات سنة ونيفا ليصل إلى أبعد نجم استطاع أن يرصده، و٤٠ مليار سنة ليدور حول هذا الكون، هذا إن بقي الكون بدون توسع منذ انطلاقه!!!

وعدا مشكلة المسافات الهائلة في الكون، هناك مشكلة اصطدام المركبة بالنجوم والكويكبات والنيازك . وتكفي الإشارة إلى أن ذرات الهيدروجين الموجودة في الفضاء الكوني والتي تتحول إلى أشعة كونية قاتلة لدى اصطدامها بمركبة تسير بسرعة الضوء وحتى بسرعة أقل من ذلك بكثير .[1]

النفاذ من أقطار الأرض :

وكما نفذ الإنسان من أقطار السموات بسلطان العلم منذ سنة ١٩٥٧م، كذلك نفذ الإنسان من أقطار الأرض في النصف الآخر من القرن العشرين، وسبر أعماق المحيطات ووصل فيها إلى عمق ١٠ كلم تقريبا، وحفر في قشرة الأرض الصلبة بضعة عشر كيلو مترا .

إلا أنه يبقى أيضا في نفاذه من أقطار الأرض محدودا، فشعاع الأرض أي المسافة من سطحها إلى مركزها هي ٦٣٧٥ كلم . وفي جوف الأرض شواظ من نار ونحاس، أين منها شواظ الفضاء الخارجي؟ فالبراكين المشتعلة والزلازل المدمرة تعطي فكرة عما ينتظر الإنسان وآلته إذا تجاوز الحدود في سبر أقطار الأرض، مصداقا لقوله تعالى : ((يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران))[2] .

هذا و إن رأي كثير من المفسرين ممن نجل ونحترم، في الآيتين الكريمتين السابقتين، مشهدا من مشاهد يوم القيامة، فقد كتب ابن كثير-رحمه الله - فيها قائلا : "معنى الآية أنكم لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره، بل هو محيط بكم لا تقدرون على التخلص من حكمه، أينما ذهبتم أحيط بكم، فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان، أي بأمر الله وإرادته " .

وهذا التفسير هو وجه من وجوه الآيتين الكريمتين، يؤيده قوله تعالى - على لسان مؤمن آل فرعون، منذرا قومه : ((ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد . يوم تولون مدبرين مالكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد))[3] كما أن القول بأن الآيتين هما نبأ من القرآن الكريم بأن الإنسان سينفذ يوما ما من أقطار السموات والأرض هو وجه آخر من معانيهما، استنادا إلى قوله تعالى أيضا : ((لتركبن طبقا عن طبق))[4] .

---

[1] المرجع السابق ص ١٢٣-١٢٥بتصرف.
[2] سورة الرحمن:٣٥.
[3] سورة غافر:٣٢،٣٣
[4] سورة الإنشقاق:١٩.

ولئن قال الله تعالى : ((يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسطان))[2] .

والنفاذ هو جواز الشيء والخلوص منه، والأقطار جمع قطر، أي النواحي والجوانب من الشيء . والسلطان هو الحجة والبرهان والقدرة .

فماذا فعل الإنسان ؟ وإلى أي مرحلة استطاع أن ينفذ من الأقطار ؟

منذ الرابع والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) سنة ١٩٥٧م تاريخ أول قمر اصطناعي أطلقه الاتحاد السوفياتي حول الأرض، وحتى كتابه هذه الكلمات، نفذ الإنسان من أقطار السموات بسلطان العلم، فدار حول الأرض، ومشى على سطح القمر وأرسل محطات فضائية ودرس الكواكب التي تتبع النظام الشمسي إلا أن نفاذ الإنسان من أقطار السموات لا يزال وسيظل محدودا، ومحدودا جدا، فأبعد مسافة نفذ إليها الإنسان بشخصه هي ثانية ضوئية ونيف، أي المسافة بين الأرض والقمر (٣٨٤ ألف كلم) وأبعد مسافة وصل إليها الإنسان بآلته بعد عشر سنوات ونيف هي المسافة بين الأرض والكوكب "نبتون" (Neptune) أي (٤٠٤٥ مليون كلم) .

أما أقرب نجم إلينا فيبعد عنا أربع سنوات ضوئية .

وأما أبعد شبه نجم (الكازار) فتفصله عنا مسافة تزيد عن عشرة مليارات سنة ضوئية فالإنسان حتى الآن لم يكتشف من الفضاء إلا مقدار نقطة ماء من محيط .!!!

ولقد أنبأ الله سبحانه وتعالى في تنـــزيله بأن الإنسان سينفذ من أقطار السموات والأرض بواسطة سلطان العلم، كما أنبأ أيضا بأن النفاذ من أقطار السموات يبقى محفوفا بالمخاطر، ومنها تعرض المركبات ومن فيها لشواظ من النار والنحاس ((يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران))[3] .

فالإنس والجن لن يستطيعا استكشاف جميع أقطار السموات والأرض أو العيش طويلا خارج أقطار الأرض. وتاريخ اكتشاف الفضاء لم يخل يوما من المآسي، ومنها انفجار المكوك الفضائي الأميركي " تشالنجر" . وبالرغم من أن علماء الفلك يخططون اليوم للنفاذ إلى الأجرام البعيدة بواسطة محطات فضائية، إلا أن قدرتهم على سبر آفاق الكون تبقى محدودة جدا بالنسبة للمقاييس الكونية الهائلة .

ولو سلمنا جدلا كما يقول أحد علماء الفلك أن باستطاعة العلم بناء مركبة فضائية تصل سرعتها إلى سرعة الضوء أي ٣٠٠ ألف كلم في الثانية (وهذا في حدود الاستحالة، فأسرع المركبات اليوم لاتتجاوز سرعتها ٣٠

---

[1] من علم الفلك القرآني،ص٦١-٦٧بتصرف.

[2] سورة الرحمن:٣٣.

[3] سورة الرحمن:٣٥.

خاصة بكل واحد منها.

ومن عقل هذا ربما عقل شيئاً عن معنى قوله تعالى : ((والسماء ذات الحبك))[1] أي ذات الطرائق ويعنى بها طرائق النجوم، أو كما قال "ابن عباس"- رضي الله عنهما- في معناها، أي ذات الخلق الحسن، والحبكة هي الحبل الذي تشد به الأشياء ليثبت بعضها مع البعض الآخر، وهي الأفلاك أي مسارات الكواكب والنجوم والمجرات والسدم والأكداس.

ولو تدبرنا حقا معنى قوله تعالى : ((أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج))[2] لعلمنا أن في السماء التي فوقنا أي في الغلاف الجوي الأرضي "حبكا" أي طرائق تمنع عنا الأشعة الكونية القاتلة وملايين الشهب والنيازك الحارقة، وطرائق تنظف أرضنا من الغازات الضارة المتصاعدة منها ومما عليها من مخلوقات، وطرقا كشفها الإنسان واستطاع أن يسلكها في القرن العشرين عندما نفذ بمركباته الاصطناعية إلى الفضاء الخارجي.

ولو تفكرنا في خلق السموات والأرض التزاما بقوله تعالى : ((أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى))[3] لعلمنا أن الأرض بالنسبة للكون كحبة رمل في صحراء "الربع الخالي" أو كنقطة ماء في محيط واسع . ولرأي أنها تسير في مسار بيضاوي حول الشمس طوله التقريبي ٩٦٠٠ مليون كلم دون أن يصطدم بها ملايين النجوم والكواكب المنتشرة في الكون، ولعلم الإنسان عظمة الخالق جل وعلا، ولاعتراه بعض الرهبة والخشوع أمام عظمة الخالق في ملكوته، وربما عقلنا شيئاً من معاني قوله تعالى : ((ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه))[4] أو أدرك شيئاً من قوله تعالى : ((إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار))[5].

ومن نظر إلى النجوم رآها كأنها ثابتة لبعدها السحيق عنا، والحقيقة ليست كذلك، فالمسافات بين مواقعها تتزايد في كل ثانية، والكون في توسع دائم، وكدس كوكبة "العذراء" يبتعد عن مجرتنا اللبنية ١٢٠٠ كلم في كل ثانية، وكدس العدار يبتعد عنا ٦٠ ألف كلم في كل ثانية، والكدس أو الكوكبة هو مجموعة مجرات يصل تعدادها إلى

---

[1] سورة الذاريات:٧.
[2] سورة ق:٦.
[3] سورة الروم:٨.
[4] سورة الحج:٦٥.
[5] سورة آل عمران:١٩٠-١٩١.

فوق سطحها، ولا تعدمت إمكانية الحياة على ظهرها كما هي الحال على سطح القمر، علما أن القمر والأرض نشآ من كتلة غازية واحدة، من وراء ذلك ؟ ((هو الله الخالق البارئ المصور))[1]، ((بديع السموات والأرض))[2]

ولو كانت الأرض حجم الشمس لبلغت جاذبيتها مائة وخمسين مرة عما هي عليه، ولارتفع الضغط الجوي على سطحها إلى معدل طن واحد في كل بوصة مربعة، وفي ذلك استحالة نشأة كل حياة على سطحها، علما أن الشمس والأرض انفصلتا من كتلة غازية واحدة، فما علة ذلك ؟ ((الله نور السماوات والأرض))[3] جلت قدرته ((سبحانه وتعالى عما يشركون))[4].

ولو كان دوران الأرض حول محورها العمودي مستقيما وليس مائلا كما هي الحال في دوران كوكب المريخ حول نفسه لانعدمت إمكانية الحياة على سطحها، فمن وراء ذلك؟ إنه العليم الخبير اللطيف . ((الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء))[5] الذي ((خلق كل شيء فقدره تقديرا))[6] ولئن أرجعت القلة من المتعلمين ولا نقول العلماء- علة هذا النظام المحكم المودع في كل الأشياء، إلى نظريات واهية هي منطق العاجز، كالأزلية والصدفة والتطور والطبيعة، فكل عالم حقيقي يرى بعين البصيرة أن كل شيء درسه في حقل اختصاصه هو موقع بقول رب العالمين : ((صنع الله الذي أتقن كل شيء))[7] .[8]

قال تعالى ((وما أوتيتم من العلم إلا قليلا))[9]

لقد استطاع الإنسان أن يعرف أشياء في القرن العشرين في عالم الأرض والسماء، بما أسماه اكتشاف مجاهيل الأرض، والنفاذ إلى أقطار السماوات، فماذا عما علمه الإنسان ؟ وما حدود ذلك العلم ؟ ويكفي القارئ أن يعرف بعض المعلومات الفلكية التالية ليأخذ فكرة مبسطة عن عظمة الكون، وعظمة خالق الكون، وجلال روعة القرآن الكريم .

فلو أعطى أحدنا عقله قليلا من التأمل المريح فخرج في ليلة صافية الأديم غاب قمرها، ونظر إلى السماء فوقه ثم علم أن ما يراه بالعين المجردة من النجوم ما هو في الحقيقة إلا جزء يسير من مائة مليار مجرة أحصيت حتى الآن،

---

[1] سورة الحشر: ٢٤.
[2] سورة البقرة: ١١٧ والأنعام ١٠١.
[3] سورة النور: ٣٥.
[4] سورة الروم: ٤٠ وغيرها
[5] سورة غافر: ٦٤.
[6] سورة الفرقان: ٢.
[7] سورة النمل: ٨٨.
[8] ا.هـ من علم الفلك القرآني ص١١٧-١٢٠بتصرف
[9] سورة الإسراء: ٨٥.

تستمد طاقتها من الثقوب السوداء المتلازمة معها في أكثر المواقع التي اكتشفت فيها حتى الآن.

٣ . مواقع بعض النجوم بالنسبة للأرض : تبعد الشمس عنا ثماني دقائق ضوئية، أي مسافة مائة وخمسين مليون كلم تقريبا، أما أقرب نجم إلينا بعد الشمس فيبعد أربع سنوات ضوئية، أي أربعين ألف مليار كلم تقريبا.

وأما أشباه النجوم وهي "الكازارات": فبعضها يتطلب ضوءه كي يصل إلينا أربعة عشر مليار سنة. فالمسافات بين النجوم تذهل، وكذلك أحجامها وسرعاتها وتعدادها وتكوينها وطريقة عملها[١].

((صنع الله الذي أتقن كل شيء))[٢]

السببية مبدأ أساسي يعتمده العلم منذ قرون، ونبسطه بالآتي : يجب أن تتوافر جميع المسببات المنظمة في تسلسلها الزمني حتى يكون هناك خلق سوى. فلكل سبب مسبب ولكل مخلوق أسباب هيأت ومهدت لوجوده، إذ من غير المعقول أن توجد الرئتان قبل وجود الهواء الذي سنستنشقه، وأن يوجد خيشوم السمكة قبل وجود الماء، وأن توجد العينان قبل وجود النور.

وقد بينت علوم الأرض في القرن العشرين أن بدء تكون الأرض كان منذ أربعة مليارات سنة ونيف، ثم سويت طبقاتها، وأرسيت جبالها، وكون غلافها الجوي، وأخرج منها ماؤها، وأمدت بالطاقة الشمسية خلال مئات الملايين من السنين.

وبعدها ظهرت في الماء أول المخلوقات الحية، وهي الطحالب الزرقاء ذات الخلية الواحدة، منذ ثلاثة مليارات سنة ونيف، أما تاريخ ظهور أول إنسان على ظهرها فيرجع إلى بضعة ملايين من السنين.

هذا التنظيم البديع في تسلسل وإيجاد المسببات الضرورية لحياة الإنسان قبل وجوده على سطح الكرة الأرضية لا يمكن إرجاعه إلا إلى منظم قادر هو المولى سبحانه وتعالى، كما يسلم بذلك أكثر العاقلين من علماء الأحياء الذين قالوا حديثا بمبدأ الغائية (Intention) في الكون، بمعنى أنه تبين لهم مؤخرا أن كل شيء في الكون قد وجد لغاية وهدف معين، وأن المخلوقات في الكون كلها مترابطة مع بعضها البعض لغاية أساسية هي خدمة الإنسان، وهذا ما أسموه بمبدأ "الأنتروبي" ومصداقه من قوله تعالى : ((وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون))[٣]، ((والأرض وضعها للأنام))[٤]

---

[1] مرجع سابق ص٦٤-٦٥بتصرف

[2] سورة النمل:٨٨.

[3] سورة الجاثية :١٣.

[4] سورة الرحمن:١٠.

قال تعالى : ((وخلق كل شيء فقدره تقديرا))[2].

١ . موقع الشمس بالنسبة للأرض : جاء في مجلة العلم والحياة الفرنسية ما ترجمته الآتي :

"لو كان موقع الأرض بالنسبة للشمس بحيث يكون شعاع مدارها حول الشمس أصغر ٤% مما هي عليه – أي ١٤٤ مليون كلم بدلا من ١٥٠ مليون كلم- لارتفعت حرارتها تدريجيا حتى ٤٥٠ درجة مئوية، وتبخرت مياهها، ولا نعدمت إمكانية الحياة فيها كما هو الحاصل في الكوكب "فينوس" .

وعلى العكس من ذلك، لو كان موقع الأرض بالنسبة للشمس بحيث يكون شعاع مدارها حول الشمس أكبر بنسبة ١% مما هو عليه، أي ١٥١/٥ مليون كلم بدلا من ١٥٠ مليون كلم، لانخفضت حرارتها تدريجيا حتى تصل إلى أربعين درجة تحت الصفر، ولتجمد الماء فيها وانعدمت إمكانية الحياة على سطحها أيضا، وهو الحاصل بالنسبة للكوكب "مارس"

فهل موقع الشمس بالنسبة للأرض كان نتيجة الصدفة، أم من تدبير العزيز العليم الذي " خلق كل شيء فقدره تقديرا " ؟

ولماذا لم تلعب الصدفة دورها بالنسبة لبقية الكواكب من غير الأرض والتي تتبع النظام الشمسي؟ مسكينة الصدفة هي وأخواتها من النظريات الخرقاء كالأزلية والتطور والضرورة والطبيعة التي غالبا ما يلجأ إليها منطق بعض المتعلمين العاجز عند ما نسألهم : من وراء النظام البديع المحكم في كل خلق من مخلوقات الله ؟ "سبحانه وتعالى عما يشركون"

٢ . موقع الشمس في المجرة اللبنية : شمسنا هي نجم متواضع من مائة مليار نجم تؤلف المجرة اللبنية التي يتبعها نظامنا الشمسي، ومن نعم المولى علينا أن موقع الشمس بالنسبة إلى مركز (Gentre) المجرة اللبنية هو على أطرافها، إذ يبعد عن مركزها مسافة ثلاثين ألف سنة ضوئية. وقد اكتشف حديثا في مركز المجرة اللبنية شيء هائل غير منظور هو الثقب الأسود، الذي أسموه بمقبرة النجوم أو " بالوعة النجوم " وله من قوة الجاذبية ما يمكنه من أن يبلع الآف النجوم يوميا؛ لأن الثقل النوعي لكتلته يعادل أربعة ملايين مرة الثقل النوعي لكتلة الشمس. ولو لم تكن شمسنا في موقع بعيد جدا عن موقع هذا الغول، الملقب "بالثقب الأسود" لأصبحت لقمة سهلة الابتلاع .

---

[1] سورة الأنبياء:١٦-١٨.
[2] سورة الفرقان:٢.

٤٦-١٠ غرام).

وهذه المجموعة المحلية تتجمع مع غيرها لتؤلف كدس المجرات (Amasde Galaxies) الذي يحوي بضعة الآف من المجرات وتصل أبعاده إلى ستين مليون سنة ضوئية، وكتلته إلى بضعة ملايين المليارات من كتلة الشمس (٤٨-١٠ غرام).

وقد استطاع العلماء حتى الآن إحصاء ثلاثة الآف كدس منها في نصف الكرة الجنوبي للكون . إلا أن تركيب الكون لا يتوقف عند هذا الحد، فأكداس المجرات تتجمع فيما بينها كل خمسة أو ستة لتؤلف كدسا عملاقا (Super Amas) تصل أبعاده إلى مائتي مليون سنة ضوئية وكتلته إلى عشرة ملايين مليار مرة من كتلة الشمس (٤٩-١٠ غرام). فمجرتنا اللبنية ما هي إلا جزء من كدس عملاق مؤلف من عشرة آلاف مجرة . !!!

إن هذه الأرقام المبسطة عن النجوم والمجرات وتجمعاتها وأكداسها تعطي المؤمن شيئاً عن معنى قوله تعالى : ((والسماء وما بناها))[1] وعظمة قسمه ببروج السماء، وتجعله خاشعا أمام عظمة خالق الكون عندما يقرأ قوله تعالى : ((تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا))[2].

كذلك نرى أن رقم مائة مليار مجرة في الكون يتألف أصغرها من عشرة ملايين نجم، وأكبرها من الآف المليارات من النجوم، وكلها تجري بسرعات هائلة متفاوتة، كل نجم في مسار خاص دون تصادم بينها وفق نظام الجاذبية الكونية، نرى أن هذا الرقم أيضا يعطي فكرة عن معنى قوله تعالى ((لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ..))[3] في عظمة الصنعة. وقوله تعالى : ((إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا))[4] . بواسطة القوانين التي تحكم مسار الأجرام السماوية؛

لذلك كان التفكير في خلق السموات والأرض آيات لأولي الألباب : ((إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب))[5].

وفي هذا الصدد يقول "أينشتاين" - وهو من كبار العلماء أريد أن أعرف كيف خلق الله الكون، أريد أن أعرف أفكاره، وما عدا ذلك فتفاصيل ... الله بارع حاذق، وليس بشرير، الله لا يلعب بالنرد مع الكون .

ولقد ظل "أينشتاين" حتى أواخر عمره (١٩٥٥) يفتش عن القوانين التي يقوم عليها نظام السموات والأرض، وصدق الله إذ يقول: ((وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لا تخذناه من لدنا إن

---

[1] سورة الشمس:٥.
[2] سورة الفرقان:٦١.
[3] سورة غافر:٥٧.
[4] سورة فاطر:٤١.
[5] سورة آل عمران:١٩٠.

(Etoile-A stre) والكواكب (Piametes) وتسمى سديما (Nebuleuse) عندما يغلفها الدخان أو الغبار الكوني. والمجرات أنواع: فالمجرة القزم تتألف من عشرة ملايين نجم، أما المجرة العملاقة فيصل تعداد نجومها إلى عشرة آلاف مليار نجم ترتبط بعضها ببعض بواسطة قوة الجاذبية .

أما مجرتنا المسماة بالطريق اللبني والتي يتبع لها نظامنا الشمسي فمؤلفة من مئة مليار نجم تقريبا منها الشمس وهي نجم متوسط الحجم، وبعض النجوم تكبر الشمس بعشرات أو مئات المرات.

والمجرة اللبنية تبدو من خلال المراصد كقرص (Disque) قطره تسعون ألف سنة ضوئية، وسمكه خمسة آلاف سنة ضوئية (السنة الضوئية تساوي ٩٤١٦ مليار كلم أو عشرة آلاف مليار كلم تقريبا).

وفي حين يصل إلينا نور القمر في ثانية وثلث، ونور الشمس في ثماني دقائق، فإن النور يستغرق مائة ألف سنة ليصل بين طرفي قرص المجرة اللبنية (يقطع النور ثلاث مئة ألف كلم في الثانية).

وهناك مجرات تكبر هما بعشرات المرات، وفي الكون أحصى حتى الآن مائة مليار مجرة تقريبا، وكلها تدور وتجري بسرعة متفاوتة.

فالأرض تدور حول الشمس بسرعة ٣٠ كلم في الثانية تقريبا، والشمس تجري بسرعة ٧،١٩ كلم في الثانية بالنسبة للنجوم المجاورة لها.

أما أسرع المجرات فهي التي تحمل الرقم (٣-٢ ٢٩٥٠) إذ تصل سرعتها إلى ٣٦% من سرعة الضوء أي ١٠٨ آلاف كلم في الثانية.

والنجوم والمجرات لا تتوزع عشوائيا في الكون، فالنجوم تتجمع مع بعضها لتؤلف المجرة، والمجرات تتجمع مع بعضها لتؤلف مجموعة محلية (Groupe Locale) مؤلفة من عشرات المجرات، والمجموعة المحلية تتجمع مع بعضها لتؤلف كدس المجرات (Amas des Galaxies) المؤلف من بضعة آلاف من المجرات، وأكداس المجرات تتجمع كل خمسة أو ستة فيما بينها لتؤلف كدسا عملاقا (Super Amas).

فالنجوم هي حجر البناء في المجرة، والمجرة هي بيت في الكون، والمجموعة المحلية هي قرية في الكون.

أما كدس المجرات فهو مدينة في الكون. والكدس العملاق عاصمة من عواصمه العديدة حسب تشبيه علماء الفلك.

فالشمس مع بقية كواكب النظام الشمسي ومائة مليار نجم غيرها تتجمع مع بعضها لتؤلف مجرتنا اللبنية، ومجرتنا اللبنية مع توأمها المجرة "أندروميد" (Andromede) التي تبعد عنا ٣،٢ مليون سنة ضوئية، وغيمتا "ماجلان" الصغرى والكبرى (Nuages Magellan) وخمس عشرة قزما (Galaxie Naine) تتجمع مع بعضها لتؤلف

Thuan) وهذه ترجمة ما كتبه بالفرنسية: "إن المادة يمكن أن تظهر من الفراغ إذا حقنت فيها كمية كبيرة من الطاقة . الفراغ مصدر كل شيء . المجرات، والنجوم، والشجر، والأزهار، وأنت وأنا، إن فكرة النشوء من العدم والتي كانت بالأمس حكرا على علماء الدين تجد لها اليوم سندا علميا في علم الكونية" .

وهذا لا يتعارض -كما قد يتبادر إلى ذهن البعض - مع قوله عز وجل :((ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا))[1].

فالذي نفهمه من معنى "ما أشهدتهم" أي ما أشركتهم في خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم . وهذا المعنى يفرضه السياق القرآني، والجملة التي تعطي للكلمة معانيها في القرآن الكريم وليس العكس، فإذا تتبعنا معنى كلمتي " أشهدتهم " و " شهداءكم " نجدها بمعنى " أشركتهم " " وشركاءكم " كما في الآية السابقة، وقوله تعالى أيضا : ((وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين))[2] [3].

⊙ أمثلة في عالم السموات:

قال الله تعالى : ((لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون))[4]

عندما نظر "غاليليو" إلى السماء من خلال أول منظار بناه بنفسه في سنة ١٦٠٩م، رأى ما أذهله في الكون، وخلال أربعة قرون من هذا التاريخ بنى الإنسان مراصد متطورة كمراصد جبل "بالومار" و"كيت بيك" في الولايات المتحدة، ومرصد جبل "سميرودريكي" في القوقاز .

ولايزال علماء الفلك يكتشفون من خلالها كل يوم ما يذهل في هذا الكون الفسيح. فالإنسانية، كما قال العالم "بيكر" (Piker) لن تنتهي من سبر أغوار الكون، وهي لن تعرف من الكون إلا مقدار ما نعرفه عن نقطة ماء في محيط، أو كما قال "نيوتن" مكتشف مبدأ الجاذبية منذ ثلاثة قرون ونيف - : "لست أدري كيف أبدو في نظر العالم، ولكني في نظر نفسي أبدو كما لو كنت غلاما يلعب على شاطئ البحر ويلهو بين الحين والآخر بالعثور على حجر أملس أو محارة بالغة الجمال، في الوقت الذي يمتد فيه محيط الحقيقة أمامي دون أن يسبر أحد غوره"[5]. قال تعالى: ((والسماء وما بناها))[6].

---

[1] سورة الكهف:٥١.
[2] سورة البقرة:٢٦.
[3] من علم الفلك القرآني الثوابت العلمية في القرآن الكريم،د/عدنان الشريف، دار العلم للملايين، ص١٧-٢٠ بتصرف
[4] سورة غافر:٥٧.
[5] من علم الفلك القرآني :الثوابت العلمية في القرآن الكريم ،د/عدنان الشريف،ص٤٥-٤٦ بتصرف
[6] سورة الشمس:٥.

البروتون (Proton) وهو جزيئ ذو شحنة كهربائية موجبة، يدخل في تركيب نواة الذرات، كتلته أكبر بـ ١٨٣٨ مرة من كتلة الألكترون .

الفوتون (Photon) وهو جزيئ الذي يؤلف الضوء، لا كتلة له، وسرعته ٣٠٠ ألف كلم في الثانية .

النيترينو (Neutrino) وهو جسم محايد له قوة تمكنه من اختراق جميع الأشياء، لم تحدد كتلته بعد .

ومع مرور ملايين السنين اتحدت فيما بينها الجزئيات الأولية المذكورة أعلاه والتي كانت تتألف منها الكتلة البدائية، فكانت نواة أول وأبسط وأكثر العناصر انتشارا في الكون، ثم ذرتها، وهو عنصر غاز الهيدروجين، ثم اتحدت ذرات الهيدروجين والجسيمات التي تتألف منها بصورة متباينة، فتكونت بقية الذرات والعناصر الطبيعية، وعددها اثنان وتسعون عنصرا، تبدأ بالهيدروجين وتنتهي بالأورانيوم، ومن هذه العناصر نشأت مليارات المخلوقات .

وهذه بصورة مبسطة وسريعة تفاصيل نشأة المخلوقات كما كشفها العلم في القرن العشرين، كيف تخلقت الأشياء ؟ في البدء أي بعد جزء من مليار من الثانية كان الكون مؤلفا من أول وأصغر جزئيات الذرة المسماة " الكوارك " ومضاد، أي زوجة (الكرات الصغيرة البيضاء والسوداء)

ثم اتحدت ثلاثة منها فألفت البروتون، والنترون، بفعل القوة النووية القوية.

وبعد الدقائق الأولى من بدء الكون اتحدت جزئيات الذرة المؤلفة من البروتون والنتروتون بفعل القوة النووية القوية، فألفت نواة ذرة غاز الهيدروجين الثقيل ونواة غاز الهاليوم.

وبعد أن تألفت نوى غاز الهيدروجين، ثم غاز الهيدروجين والهاليوم بفعل القوة الكهرطيسية بدأت تظهر بقية الذرات والعناصر، فتكون عنصر الماء المؤلف من ذرة من الهيدروجين (الكرة الزرقاء) وذرتين من الأوكسجين (الكرة الحمراء) والأمونياك (الكرة الصفراء مع الكرات الحمراء) والميتان (الكرة الرمادية مع الكرات الحمراء) ثم الأشياء الأكثر تعقيدا .

نقطة الصفر في بدء الكون :

يقول علماء الكون : بأن الفيزياء الحديثة قد توصلت لمعرفة تفاصيل النشأة الأولى للكون كما كانت بعد جزء من مليارات المليارات من الثانية، وتحديدا بعد الرقم ٤٣-١٠من الثانية من نقطة الصفر من بدء هذه النشأة .

أما نقطة الصفر في خلق الجبلة الأولى التي نشأت منها المخلوقات جميعها فتبقى مجهولة في حدود العلم الحاضر، إلا إذا استطاع العلم تخطي وقت "بلانك" (Tempsdeplanck) وهو الرقم ٤٣-١٠ من الثانية، فيصل عندها هو إلى نقطة الصفر في معرفة كيفية بدء الكون وكيفية ظهوره من العدم.

هذا وآيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم عديدة، يقترب عددها من ألف آية صريحة بالإضافة إلى آيات أخرى تقترب دلالتها من الصراحة تكون حوالي سدس القرآن الكريم" وتشكل جانبا من أهم جوانب الإعجاز في كتاب الله، يعرف باسم "الإعجاز العلمي للقرآن الكريم" والعلم التجريبي له طبيعة تراكمية، بمعنى أنه كلما اتسعت دائرة المعرفة بالكون كلما أدرك الإنسان من أسرار هذا الكون ما لم يكن معروفا من قبل.

والزمان الذي نحيا فيه والذي يعرف باسم "زمن العلوم و التقنية" قد توفر فيه للإنسان من المعرفة بالكون ومكوناته ما لم يتحقق لجيل من البشر من قبل، لذلك فإن النظر الآن في هذه الآيات الكونية الواردة في كتاب الله على ضوء الحقائق العلمية المتوفرة لنا اليوم يعتبر من أوضح البراهين على الإعجاز العلمي للقرآن الكريم.

وقد جاءت الآيات الكونية في القرآن الكريم كلها في مقام الشهادة لله تعالى بطلاقة القدرة وببديع الصنعة، وبأن هذا الخالق العظيم الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته جدير بالخضوع له بالعبادة وحده، بغير شبيه ولا شريك ولامنازع، كما أتى في مقام الشهادة بأن الله تعالى الذي أبدع هذا الكون بكل ما فيه ومن فيه قادر على إفناء الكون وإعادة خلقه من جديد، وعلى الرغم من ذلك فإن الآيات الكونية في كتاب الله تبقى بيانا من الله الخالق الذي أبدع هذا الكون، ولابد أن تكون آياته التي أنزلها متوافقة مع خلقه الذي أبدع، ومن ثم فلا بد وأن تكون حقا مطلقا ونحن نرى هذا الحق في زماننا في ظل الكم الهائل للمعرفة بالكون ومكوناته التي بدأت تتضح أمام رؤى العلماء في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه، وبصورة لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد[1].

قال الله تعالى : ((قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ...))[2]

ومضى على الناس حين من الدهر وهم لا يعلمون شيئاً يذكر " كيف بدأ الخلق ؟"

ولكنها الدعوة إلى السير والتدبر، والعلم والنظر، والبحث والتفكر حتى يعلم الإنسان ويتذكر، ولقد استقر نبأ ما أعلمنا به التنزيل منذ عشرات السنين فقط، حين بدأ العلم يعرف شيئاً عن نشأة الأشياء، مصداقا لقوله تعالى : ((لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون))[3] فلقد نشأت كل المخلوقات من جبلة بدائية (Puree Primitive) مؤلفة من جزئيات أولية (Particules Elementaires) هي التالية :

الكوارك (Quark) وهو جزيئ سالب وموجب يتألف من البروتون والنيترون، وهو تصور نظري لم تثبت التجربة وجوده بعد .

---

[1] حديث تلفزيوني للدكتور / زغلول النجار .. عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم "برنامج نور على نور" بتصرف

[2] سورة العنكبوت: ٢٠.

[3] سورة الأنعام: ٦٧.

ألوان من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم

أ/ د. عمر بن عبد العزيز قريشي*

المقدمة: الحمد لله و كفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد: فقد شاع في الآونة الأخيرة مصطلح "الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة"، وهو أمر ينبغي استغلاله وحسن التعامل معه، فإنه لغة هذا العصر، فكما كان الإعجاز اللغوي معجزة القرآن فيمن نزل فيهم القرآن، فلا شك أن لغة العصر وإعجازه يرتبط بالعلم، ولا شك أن القرآن لفت نظر الإنسان إلى الحقائق العلمية، ووضع الإنسان في المناخ العلمي، حيث حث على التأمل والنظر والاختبار وملاحظة اضطراب القوانين والسنن، ليبتكر ويكتشف ويخترع ويسخِّر، كما حدثه القرآن عن مراحل الخلق وتطور الأجنة وما إلى ذلك مما أثبته العلم بعد أزمنة طويلة، و على سبيل المثال ذكر القرآن "الذرة" وتفتيتها، وذكر نظام الزوجية، واتساع الكون، وكروية الأرض، والجاذبية الأرضية، وذكر ألوانا من الطب، وتحدث عن عالم البحار والجبال، كما تحدث القرآن عن المستقبل، وذكر الكثير من الغيبيات، وصدق ربنا سبحانه إذ يقول: ((سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد))[1].

وقد تناول العلماء تفصيل ذلك في غير ما كتاب، وعلى المسلمين أن يحسنوا التعامل معه من أجل عمارة الأرض، والقيام بأعباء الأمانة والاستخلاف. إن المسلمين لا يعانون من أزمة منهج وقيم، وإنما يعانون من أزمة فكر وفهم، فالقرآن هو القرآن، والمنهج هو المنهج، ولكن أين المتدبرون ؟ وأين الشمولية في فهم الدين؟ قال تعالى: ((و أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون))[2]

صور من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم:

كما قال رب العالمين: ((سنريهم آياتنا في الآفاق و في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد))[3]

* الأستاذ الزائر بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية

---

[1] سورة فصلت: ٥٣.

[2] سورة الأنعام: ١٥٣

[3] سورة فصلت: ٥٣.

الجندي الذي تكتمل فيه صفات الجندية من قوة بدنية وشجاعة وبلوغ [illegible] وكان العباسيون يهتمون [illegible] الصحية لجيوشهم حيث عملوا على تزويد المعسكرات بالأطباء والصيادلة مما يدل على أنهم أتقنوا فنون الإمدادات والخدمات الطبية التي لا بد منها لاستمرار الجيوش وكسب المعارك، وكان الخليفة العباسي يستعرض جيوشه بين الحين والآخر ليتأكد من استعدادهم وليقف على أوضاعهم ويعالج مشاكلهم، واستمر الحال كذلك حتى أواخر عهد الدولة العباسية وتتوزع إلى قوى ودويلات إسلامية.[٢٧]

لامجال لنكران هذا الواقع بأن موضوع الجندية الإسلامية في القرون المفضلة موضوع شيق وواسع في الوقت نفسه لايمكن لى الإحاطة بجميع جوانبه بكل التفاصيل في هذه العجالة بل تناولت هذا الموضوع بشيء من الإيجاز نظرا لسعة الموضوع. وأهدف هنا بهذا الموضوع إعطاء القارئ الكريم الصورة الكاملة للتطور التاريخي لنظام الجندية الإسلامية، كيف بدأت بسيطة وكيف أصبحت قوة يشار لها بالبنان خلال فترة وجيزة في حساب الأمم. والله ولي التوفيق.

٢٧- المقدم/ سعد بن حمود الميموني، أطروحة في الجندية في الإسلام، ص ٢٩.

الأموي هو الذي يختار قائد الجيش والبحرية وكان الجيش في عصر بني أمية يتكون من عنصرين أساسيين: هما المشاة وسلاح الفرسان وكان الجيش الأموي بنوعيه البري والبحري يتمتع بقوة هائلة من حيث العدد والعدة حيث بلغ تعداده في معسكر البصرة والكوفة نحو ١٤٠٠٠٠ مقاتل، وفي الشام كان العدد نحو ذلك. هذا إلى جانب القوات التي كانت في القيروان والموصل وواسط، والمعهود لهم حماية الحدود،[٢٥] وكانت من أهم التنظيمات التي سادت في الجيش الإسلامي في عهد الدولة الأموية، هي كالآتي:[٢٦]

أ- أمير الجيش وعدد جنوده عشرة آلاف رجل وما فوق.

بـ- أمير التعبئة وعدد جنوده خمسة آلاف تقريبا.

جـ- أمير الكردوس وبلغ عدد جنوده ألف رجل.

د- القائد وعدد جنوده (١٠٠) جندي.

هـ-الخليفة وعدد جنوده (٥٠) جنديا.

و- العريف وعدد جنوده (١٠) جنود.

وكان يرافق الجيش الإسلامي الرائد ومهمته اكتشاف المواقع المناسبة لنـزول الجيش، بالإضافة إلى صاحب الإقباض وهو الشخص المسؤول عن جمع الغنائم وقسمة الفيء وغيرهم مثل القاضي والترجمان والكاتب. أما أسلحة القتال فقد تطورت إلى الأحسن وتمت الاستفادة من الدول المجاورة في ذلك العصر، كما تم إنشاء البحرية الإسلامية، وأقيمت المعسكرات الدائمة، وقدم الأمويون العناية الفائقة بثكنات الجند، ونكتفي بهذا العرض الخاطف عن تطور نظام الجندية في عهد الدولة الأموية.

ملامح تطور نظام الجندية في عهد الدولة العباسية:

زاد عدد الجيوش في عهد الدولة العباسية حيث نجد الخليفة (هارون الرشيد) يقود جيشا قوامه (١٣٥٠٠٠) مقاتل ضد مدينة هرقلة بآسيا الصغرى والتي كانت قائدة للروم في عهد الفتوحات الإسلامية الأولى، وبلغ عدد الجيش الإسلامي في عهد الخليفة المعتصم بالله في فتح عمورية (٢٠٠٠٠٠) جندي، وهذا يدل دلالة واضحة على اهتمام الخلفاء العباسيين بالجيش وتنظيمه وتطويره لأن قوة الدولة ترتكز على قوة الجيش الذي يحمي الحدود، ويحفظ الأمن، وقد قسم الجيش في عهد الدولة العباسية إلى قسمين، حيث أطلق على القسم الأول جيش الخراسانيين

٢٥- الرائد/ جمال يوسف الخلفات، الرائد ركن بهاء الدين محمد أسعد، العسكرية الإسلامية وقاداتها العظام، ص ٢٩٧

٢٦- وفيق الدقدوقي، الجندية في عهد الدولة الأموية، ص ١٢٢.

٢- فرض التجنيد الإجباري بعد أن كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام التزام أدبي حيث قسم الجند إلى قسمين:

أ- الجند النظامي: وهم الذين اتخذوا الجندية مهنة وتفرغوا لها.

ب- المتطوعون: وهم الذين يشاركون في وقت الحرب طمعا في الثواب، وبعد نهاية الحرب يعودون إلى مزاولة أعمالهم الحياتية، وبعد أن اتسعت الدولة الإسلامية لاحظ رضي الله عنه عيوب التطوع، ورأى أن الحاجة ماسة إلى جيش نظامي قوي يواصل الفتوحات لتحقيق الهدف الذي رسمه النبي عليه السلام، لذا نراه يصدر أوامره للأقاليم، وفيها شيء من الشدة حيث يقول: " ولاتدعوا في ربيعة ولامضر ولاحلفائها أحدا من أهل النجدات ولافارسا إلا جلبتموه فإن جاء طائعا وإلا حشرتموه، احملوا العرب على الجد ولاتدعوا أحدا له سلاح ولاقوس أو نجدة أو رأى إلا انتخبتموه ثم وجهتموه إلي والعجل العجل.[٢٤]

إذاً نراه رضي الله عنه هنا يستعجل الولاة أن يرسلوا أهل النجدة فإن أطاعوا فبها ونعمت وإلا تم إلزامهم كما فعل عندما أرسل الإمدادات لقائد جيش القادسية سعد بن أبي وقاص، وكان رضي الله عنه بوضعه ديوان الجند الذي يشبه وزارة الدفاع اليوم قد وضع إنجازا عظيما في مجال التنظيم بما يخدم اتساع أقاليم الدولة الإسلامية وحاجتها إلى وجود تشكيلات نظامية متفرغة للدفاع عن تلك الدولة وللمحافظة على الاستمرار في نشر الدعوة الإسلامية، وبقي على هذا الوضع الخليفة الثالث (عثمان بن عفان) رضي الله عنه، حيث أمدت الفتوحات نحو أرمنية وبلاد فارس وإلى شمال أفريقيا. أما في عهد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقد نشبت حرب أهلية بينه وبين معاوية بن سفيان، وانقسم المسلمون على أثر ذلك إلى معسكرين.

خلاصة الكلام في هذا المقام أن الخلفاء الراشدين ساروا على المنهج الذي رسمه رسول هذه الأمة وقائدها الأول محمد رسول الله بغية نيل الهدف المنشود وهو إعلاء كلمة الله وتوحيد الله في أرضه.

تطور نظام الجندية في عهد الدولة الأموية:

قام الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بتطوير نظام الجيش عما كان عليه في عهد الخلفاء الراشدين، واقتبس من الأنظمة السائدة في الدول المجاورة حيث أدرج بعض التعديلات في الزي العسكري،

٢٢- وفيق الدقدوقي، الجندية في عهد الدولة الأموية، ط ١، (بيروت: موسسة الرسالة، ١٤٠٦هـ)، ص ١٩١.

٢٣- الرائد/ جمال يوسف الخلفات، الرائد ركن/ بهاء الدين محمد أسعد، العسكرية الإسلامية وقاداتها العظام، ص ٢٩٧.

٢٤- المقدم ركن/ حازم إبراهيم العارف، الجيش العربي الإسلامي، ص ٥٨.

٥٠٠ عضوا، وفي أواخر عهده عليه السلام نظم الجيش على الترتيب التالي:

أ- الجريدة: جمعها جرائد حيث لايفوق عددها ٤٠ شخصا وهي راكبة.

ب- العصبة: إذا كان التنظيم مختلطا مثل (مشاة وفرسان).

جـ- المقانب: يتراوح عددها مابين (٤٠-٥٠٠) رجل.

د- الجمرات: يتراوح عددها مابين (٣٠٠-١٠٠٠) رجل.

هـ- السرية: يتراوح عددها ما بين (٣٠٠-٥٠٠) رجل.

و- الجيش مازاد عدده على ١٠٠٠ مقاتل.

ز- جيش جحفل: إذا وصل عدده إلى ٤٠٠٠ مقاتل.

حـ- جيش جرار: إذا بلغ عدده إلى ١٢٠٠٠ مقاتل.

وكان الجيش الإسلامي يقاتل بعد تشكيل القوات إلى القلب ثم الميمنة، والميسرة والساقة والمقدمة، واتبع الرسول عليه السلام هذا النظام في فتح مكة ثم اتبع في كثير من المعارك الإسلامية فيما بعد.[١٥]

٤- وضع عليه السلام أسس التجنيد وشروطه حيث كان التجنيد في عهده صلى الله عليه وسلم معتمدا على الالتزام الديني وكان المنادي ينادي أثناء تعرض المسلمين الخطر "الصلاة جامعة". وكان النبي عليه السلام يشترط في جنده اللياقة البدنية، وتجاوز سن الخامسة عشر، وقبل الدخول في أية معركة يتم استعراض الصفوف فيختار من كان صالحا جسميا ويرد غير صالح، وكان التخلف عن المعركة بمثابة عمل غير أخلاقي حيث يترتب عليه الحرمان من الغنائم في الدنيا والعقاب في الآخرة.

٥- كذلك قنن عليه الصلاة والسلام قواعد الحرب وأنظمتها وكان قدوة حسنة في قيادة الجيش الإسلامي الصغير، وكان يحترم العهود والمواثيق حيث أبرم معاهدة مع يهود المدينة ولم ينقض بنودها إلا أن نقضها اليهود أولا، كما أبرم معاهدة صلح الحديبية، واحترم بنودها رغم أن شروطها كانت لصالح المشركين في الظاهر.

٦- كان عليه السلام أول من استخدم نظام الصف في القتال، ومزج بينه وبين نظام الكر والفر. وإليه أشار الله عز وجل في كلامه: (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص)[١٦]

٧- وضع عليه السلام أسس استخدام طبيعة الأرض حيث كان جيشه يستند إلى موضع يأمنون فيه هجوم العدو، كما تم استخدام أسلوب التحصينات الميدانية عندما حفر الخندق حول المدينة، وكان أول من طبق أسلوب النيران

١٥- محمد فيصل عبد المنعم، تاريخ الحرب في الإسلام، ط ١، (الرياض: دار آمين للنشر والتوزيع، ب، ت)، ص ١٠٤.

١٦- القرآن الكريم: ٦١:٤.

المجتمع تحسب له الحساب، ومن ضمنها قبيلة قريش، والتي أصبحت تنام وتصحو على قلق وفزع، وبإمكاننا أن نبرز ملامح تلك الفترة بالسطور الآتية:

أ- بناء المسجد النبوي والذى كان بناؤه الخطوة الأولى في بناء المجتمع الإسلامي ليكون ذلك بمثابة أول معهد مثالي على وجه العالم يتعلم فيه ملائكة الأرض ومؤدبو الجبابرة وملوك الدار الآخرة.[١٣]

ب- وضع الحد على الصراعات والخلافات والعداوات السائدة فيما بين الأوس والخزرج.

جـ- حل أزمة المهاجرين الذين ارتحلوا إلى المدينة المنورة، وتركوا أموالهم في مكة، وكانوا في حالة سيئة يرثى لها، حيث لامأوى ولامال ولاطعام لهم، وذلك عبر تنفيذ مبدأ الأخوة بين المهاجرين والأنصار والتي مازالت تعد من أقوى الروابط الاجتماعية على مر التاريخ.

د- مهادنة العناصر اليهودية الموجودة في منطقة المدينة آنذاك في بادئ الأمر والتي لامجال لإنكار أحد ثقلها السياسي والاقتصادي.[١٤]

وبهذا قد تمكن صلى الله عليه وسلم من بناء وتأسيس مجتمع إسلامي والذي يعتبر أحد عناصر القوة العسكرية، وتم بناؤه على أسس ودعائم متينة. وعلى هذا تم الاعتماد في بناء وتطوير نظام القوات في غزواته وحروبه عليه السلام.

ب- مرحلة البناء وإعداد الجيش النظامي:

في المدينة المنورة بدأ إعداد الجيش الإسلامي من حيث التنظيم والتسليح والأساليب التكتيكية، حيث لم يمض عام واحد حتى كان بناء الجيش الإسلامي الأول قد اكتمل في قاعدة آمنة قوية، وقام عليه السلام بتنظيم الجيش على النحو الآتي:

١- وحد الهدف وهو توحيد الله بالعبادة.

٢- ركز القيادة على نفسه عليه الصلاة والسلام أو من يقوم مقامه، وكان يختار القائد المناسب في أية غزوة ويزوده بالإرشادات والتعاليم الضرورية ثم يأمر أصحابه بطاعته ولو كان عبدا حبشيا، وبهذا يكون الجيش الإسلامي بدأ في استخدام الرتب القيادية ابتداء من رتبة العريف، والنقيب، وأمر الجيش.

١٣- محمد أحمد باشميل، غزوة بدر الكبرى، الكتاب الأول، ط ٤، (بيروت: مطبعة دار الكتب،١٣٨٨هـ)، ص ٩٣.

١٤- المقدم سعد بن حمود الميموني، أطروحة في الجندية في الإسلام، ص ٢١.

الآتية:

أ- مرحلة الدعوة والتأسيس:

تنقسم هذه المرحلة إلى قسمين من حيث المواقع، وفيما يلي بيان ذلك:

١- في مكة المكرمة :

قضى رسولنا عليه السلام في مكة المكرمة قرابة ثلاثة عشر عاما حيث قام خلال هذه الفترة بإعداد وتأسيس نواة الجيش الإسلامي، ومن أهم ميزات، وملامح تلك الفترة كالآتي:

أ- الدعوة إلى الله عز وجل باللين والشفقة سرا وعلانية.

ب- عقد الاجتماعات الدورية مع أصحابه لتلقينهم مبادئ الدين الحنيف.

جـ- أمر أصحابه بالتحلي بالصبر والصمود في وجه الظلم والطغيان.

د ـ- تدريب أصحابه على مبدأ الثبات والاستقامة على العقيدة وعدم الحياد عنها مهما بلغت التحديات والصعوبات التي يواجهونـــها.

هـ- عقد الاجتماعات مع وفود القبائل ودعوتهم إلى الإسلام، وما بيعة العقبة الثانية إلا ثمرة من ثمار تلك الاجتماعات، حيث طلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من الأنصار اختيار ١٢ شخصاً ليكونوا نقباء على قومهم، وبناء على هذا تم اختيار ٩ نقباء من الخزرج، و ٣ نقباء من الأوس وكان ذلك التحالف العسكري الخطوة الأولى في مرحلة التأسيس.[١١]

و- لقد ضرب أصحابه عليه السلام أروع الأمثلة في اتباع أوامر وإرشادات القائد (اصبروا فإني لم أومر بقتال).[١٢]

ز- غادر الرسول عليه السلام مكة المكرمة مهاجرا إلى المدينة المنورة عندما اشتد أذى قريش له عليه السلام وعزمهم على القضاء عليه وذلك بعد أن أذن الله بالهجرة.

٢- في المدينة المنورة:

نجحت الهجرة ووصل النبي عليه السلام إلى المدينة المنورة بكل سلامة، وقد هاجر إليها قبله عدد كبير من المهاجرين بناء على أمره، ورحب الأنصار بهم، وقدموا لهم ما في وسعهم. وبذلك أصبحت المدينة دارا آمنة

١٠- المصدر السابق، ص ١٩.

١١- المقدم ركن/ حازم إبراهيم العارف، الجيش العربي الإسلامي، (الرياض: دار الرشيد للنشر والتوزيع، ١٤٠٥هـ)، ص ٢٥.

١٢ – د. محمد السيد الوكيل، القيادة والجندية في الإسلام، ط١، (المنصورة: دار الوفاء للنشر والتوزيع، ١٤٠٨هـ)، ج ١، ص ١٣٥.

٤- الجندية: نظام الجنود، مهنة الجنود.[٧]

١- الجند: بضم الجيم وسكون النون :العسكر Army : الأنصار والأعوان، جمعه: أجناد وجنود، والواحد: جندي Troops, Soldiers [٨]

المراد بالجندية الإسلامية هنا الأنظمة والقوانين التي يتبعها الإسلام للجيوش المسلمين ويسمحها لهم، علما أن الجيوش الإسلامية كانت ذات منهج ورسالة، وكان لها هدف نبيل تسعى لتحقيقه وهو رفع كلمة لا إله إلا الله وكان وراء تلك الجيوش قادة عظام طبقوا تعاليم دينهم في بناء وإعداد تلك الجيوش بقدر استطاعتهم، ولذلك استطاعوا تحقيق ذلك الهدف، وفتحوا الأرض شرقا وغربا وانتصروا على أعداء الإسلام.

ومن المعلوم أن معرفة العرب بالحرب والقتال وأنظمتها قديمة قدم التاريخ، حيث كانت الحروب تقام فيما بينهم على أدنى الأسباب وأتفهها، وأنها كانت تعتمد على أسلوب الكر والفر وكانت القبائل- لاالدول- هي مدار التنظيم القتالي . وبما أن التطور من سمات الحياة البشرية فقد حصل تطور في الأساليب والمفاهيم القتالية لدى العرب نتيجة لاحتكاكهم واتصالهم بالقوى المجاورة تطورا يتناغم مع ذلك العصر، وعندما ظهر الإسلام في ربوع الأراضي العربية حدث انقلاب تاريخي عظيم في تلك الأساليب والمفاهيم حيث ربطت عقيدة الدين تلك القبائل في دولة واحدة، فتغير مفهوم الولاء للقبيلة إلى مفهوم أشمل وأعم وهو الولاء لله سبحانه وتعالى، ثم العمل على نشر الإسلام، ومنذ ذلك التاريخ بدأت رحلة التطور في نظام الجندية في الجيش الإسلامي.[٩] فألقي عليه الضوء الخاطف خلال هذا المقال المتواضع.

تطور نظام الجندية في عهد القائد الأول (محمد صلى الله عليه وسلم):

من المقرر أن بناء الجيوش وإعدادها أمر مرغوب فيه ومطلوب لكل دولة من دول العالم، فلا يمكن أن يتصور قيام دولة بدون جيش منظم يدافع عنها، ويعمل على توفير الأمن وحماية مصالح الأمة ضد أعدائها. فلما كان بناء الجيوش هاما فإن تحديد الغاية من ذلك الجيش يعد أهم. ولو أمعنا النظر إلى غاية الجيش الإسلامي وهدفه نجدها تتمثل في أنبل وأشرف غاية على وجه التاريخ، ألا وهي نشر شريعة الله سبحانه وتعالى حتى يكون الدين كله لله، ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد، فكان ذلك بمثابة المرسوم الأول لتنظيم وتكوين الجيش الإسلامي بقيادة

---

[٦]- د. روحي البعلبكي، المورد ، (قاموس عربي- إنكليزي)، ط١،(بيروت: دار العلم للملايين)، ص٤٣٤.

[٧]- د. إبراهيم أنيس والجماعة، المعجم الوسيط، ط٢، (إستانبول- تركيا: المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٧٢م) ، ص١٤٠.

[٨]- د. محمد رواس قلعه جي وزميله، معجم لغة الفقهاء (عربي- إنكليزي) ط١، (بيروت: دار النفائس، ١٩٨٥)، ص١٦٧.

[٩]- المقدم سعد بن حمود الميمون، أطروحة في الجندية في الإسلام، ص ١٩.

الجندية في عهد خير القرون

د. أبو جمال محمد قطب الإسلام نعماني*

الحمد لله رب العالمين القائل:(لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا)[1] والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه السلام القائل: (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)،[2] وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد،

فالجندية في الإسلام شرف عظيم لمن ينتسب لها، ودورها عظيم في تحقيق غاية الإسلام، وهو نشر دين الله في أرض الله، وأن يعبد الله بما شرع وحده دون سواه، وما دام موضوع الجندية في الإسلام موضوعا شاملا وواسعا ومشتملا في معظم جوانبه على الماضي، وفي الجانب الآخر مشتملا على الحاضر بل والمستقبل أيضا، لأن الدور الذى تقوم به الأمة الإسلامية هو مطلوب منها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.[3] فأحببت أن ألقي ضوءا في هذا المقال المتواضع على جزء يسير منها، وهو الجندية في عهد خير القرون، وأحاول فيه جادا إلقاء الضوء على تطور نظام الجندية في عهد القائد الأول سيدنا ورسولنا محمد عليه السلام وخلفائه الراشدين ثم أتناول فيه أهم ملامح التطور في عهدى الدولة الأموية والدولة العباسية.

قبل أن أخوض في صلب الموضوع أود أن أذكر معنى الجندية بما جاء في القواميس، وهي كالآتي:

١- الجندية: Military Affairs, The Army, The Military,[4]

٢- الجندية: الخدمة العسكرية (خدمة العلم) Military Service[5]

---

* رئيس قسم الدعوة والدراسات الإسلامية، الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ، بنغلاديش

[1]- القرآن الكريم: ٢٣-٢١

[2]- البخارى ومسلم.

[3]- المقدم/ سعد بن حمود الميموني، أطروحة في الجندية في الإسلام (رسالة الماجستير)، الدورة الحادية والعشرون لكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية عام ١٤١٥هـ ١٩٩٤-١٩٩٥، ص ١-٢.

[4]- Hans Wher, A Dictionary of Modern written Arabic, 3rd Edition, (Beirut: Library of Lebanon, 1980), P. 140

[5]- Samouhi Fawq Al- Adah, A dictionary of Diplomacy and International Affairs, (English- French- Arabic); (Beirut: library of Lebanon, 1974, New Impression 1979), P-263.

الشافعي، محمد بن إدريس. **الأم**. المطبعة الأميرية، ١٣٢١هـ.

الطبري، محمد بن جرير. **اختلاف الفقهاء**. تحقيق شاخت، ب. ت. م.

عبد النور، محمود محجوب. **الصلح وأثره في إنهاء الخصومة في الفقه الإسلامي**. بيروت: دار الجيل، ١٩٨٧م.

عفيفي، محمد الصادق. **الإسلام والعلاقات الدولية**. الطبعة الثانية. بيروت: دار الرائد العربي، ١٩٨٦م.

عبد الحميد الشرواني. **حواشي الشرواني**. دار الفكر، بيروت.

العسقلاني، أحمد بن على بن حجر. **فتح الباري**. بيروت: دار المعرفة، ١٩٥٩م.

عبد الله عزام. **في الجهاد آداب وأحكام**. بيروت: دار ابن حزم، د.ت.

عبد الله بن قدامة المقدسي. **الكافي في فقه ابن حنبل**. بيروت: المكتبة الإسلامية، د.ت.

الكاساني، علاء الدين. **بدائع الصنائع**. الطبعة الثانية. بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٨٠م.

قطب، سيد. **السلام العالمي والإسلام**. ط ١٢. د.م. : دار الشروق، ١٩٩٣م.

منصور بن يونس بن إدريس البهوتي. **كشاف القناع**. بيروت: دار الفكر، ١٩٨٧م.

الموسوعة العربية العالمية. مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع. المملكة العربية السعودية.

المرداوي، علي بن سليمان المردوي. **الإنصاف**. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٩٨٧م.

مسلم. **صحيح مسلم بشرح النووي**. بيروت: دار المعرفة، ١٩٩٦م.

الموافق، محمد بن يوسف بن أبي القاسم. **التاج والإكليل لمختصر خليل**. ليبيا: مكتبة النجاح.

محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، **بداية المجتهد**. بيروت: دار الفكر.

محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله. **التاج والإكليل**. بيروت: دار الفكر.

محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري. **التاريخ الصغير**. القاهرة: مكتبة دار التراث.

محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير. **سبل السلام**. ، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. **صحيح مسلم**. بيروت: دار إحياء التراث العربي.

النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف. **شرح صحيح مسلم**. بيروت: دار المعرفة، ١٩٩٦م.

النحاس، أبو جعفر. **معاني القرآن الكريم**. تحقيق: محمد علي الصابوني. طبعة جامعة أم القرى، ١٩٨٨م.

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. **الموسوعة الفقهية**. مطابع دار الصفوة، ١٩٩٩م.

The New Encyclopedia of Britannica 14th edition.

Weech, The people and religions of India. Chicago: University of Chicago Press, 1986.

يخالف أصل الإيمان بالله، ولأن فيه تنازلاً عن حقوق المسلمين الثابتة، ولأنه من عقود الإكراه التي لا تجوز في الإسلام.

- إن الحرب في الإسلام تختلف عن الحرب عند غير المسلمين باعتبارها أسلوباً لتحقيق أهدافه وغاياته.
- الإسلام لا يشجع على الحرب لأجل الحرب، ولا يتمنى لقاء العدو.
- إن غرض الحرب في الإسلام حماية الدين وإزالة الفتنة أمام دعوة التوحيد.
- إن للحرب في الإسلام نظاما فوضع ضوابط للحرب.

وليس لنا في نهاية هذه المقالة إلا أن نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع وأن يلهمنا الإخلاص في القول والعمل.

ثبت المراجع

أبو شريعة، إسماعيل إبراهيم محمد. **نظرية الحرب في الشريعة الإسلامية**. الكويت: مكتبة الفلاح.

ابن الهمام، كمال الدين. **فتح القدير**. الطبعة الثانية. بيروت: دار الفكر، د.ت.

أبو هيف، علي صادق. **القانون الدولي العام**. الإسكندرية: دار الثقافة، ١٩٥٩م

ابن كثير، اسماعيل. **السيرة النبوية**. تحقيق: أحمد عبد الشافي. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٦٥.

ابن قيم الجوزية. **زاد المعاد في هدي خير العباد**. المطبعة المصرية، د.ت.

ابن القيم. **زاد المعاد في هدي خير العباد**. الطبعة المصرية ومكتبتها، د.ت.

ابن العربي، محمد بن عبد الله. **أحكام القرآن**. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت.

ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد. **المغني**. مكتبة القاهرة، د..ت.

ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم. **لسان العرب**. بيروت: دار صادر، ١٩٦٩م.

ابن العربي، محمد بن عبد الله. **أحكام القرآن**. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت.

ابن خلدون، عبد الرحمن. **المقدمة**. بدون رقم الطبعة وتاريخ النشر.

د. أحمد شلبي. **مقارنة الأديان**، الطبعة الثامنة. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٨٦م.

جماعة من علماء الهند. **الفتاوى الهندية**. مصر: الطبعة الأميرية الكبرى، ١٣١٠هـ.

الجوهري، اسماعيل بن حماد. **الصحاح**. تحقيق: أحمد عطار. الطبعة الثانية، د.م. ١٩٨٢م.

الرفاعي، فواد بن سيد عبد الرحمن. **حقيقة اليهود**. دار صلاح الدين، د. ت..

الزحيلي، وهبة. **آثار الحرب في الفقه الإسلامي**. الطبعة الرابعة. دمشق:دار الفكر، د.ت.

الزبيدي، محمد مرتضى. **تاج العروس**، ب. م.ت.

الزحيلي، وهبة. **العلاقات الدولية في الإسلام**. بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨١م.

سالم، نادرة محمود. **عقد العمل بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي**. القاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٩٤م.

السيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي أبو بكر. **إعانة الطالبين**. بيروت: دار الفكر، ١٩٨٦م.

الواجبات:

- أداء الجزية
- دفع عشر أموالهم التي يتاجرون بها في بلاد المسلمين
- أن لا يجاهر بشيء من شعائر دينهم، ولا بشيء من المحرمات
- أن لا يطعنوا في القرآن أو في الرسول ﷺ أو في الأنبياء أو في شيء من الإسلام.

هذه هي الواجبات من قبل الذميين، وأما الحكومة المسلمة فلابد أن يعطيه الأمن والسلام والحقوق كلها مثل المسلمين.

الخاتمة: وبعد هذه الرحلة الممتعة في كتب الفقه والعلم، مع موضوع يهم المسلمين ويمس كيانهم، ويظهر علاقتهم بغيرهم، فإنه يجدر بنا أن نسجل أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث:

- السلام مبدأ من المبادئ التي عني بها الإسلام عناية واضحة، حتى صار شعار المسلم في كل بقعة من بقاع الأرض عقيدة وخلقاً وسلوكاً ونظاما.
- عقد السلم يتكون من أربعة أركان وهي: العاقد والمعقود عليه والصيغة والمشروعية.
- السّلْم مع الأعداء جائز بدليل القرآن والسنة وإجماع المسلمين.
- السلام وهو شعار المجتمع المسلم ما بين مشرق الشمس ومغربها، فتحية المسلمين حين يلاقي بعضهم بعضاً: "السلام عليكم".
- عقد السّلْم مع الأعداء من حق إمام المسلمين.
- السلم مبدأ من مبادئ الإسلام، وشعار المسلمين في عباداتهم وفي حياتهم الدنيوية.
- الأصل في العلاقات الدولية في الإسلام هو السّلْم وليس الحرب.
- يجوز السّلْم مع الأعداء أي مدة كانت، والذي يحدد ذلك هو المصلحة العامة للمسلمين.
- السّلْم مع الأعداء عقد فلا بد من أن يكون قائما على التراضي، لا على أساس القهر والإكراه.
- يشترط في اتفاقية السّلْم أن تكون واضحة النصوص بينة الأهداف، حتى لا يكون هناك مجال للتلاعب بألفاظها ومدلولاتها.
- تعد اتفاقية السّلْم مع الأعداء باطلة إذا تضمنت أي شرط يخالف الكتاب والسنة أو يخالف أي أصل من أصول الدين.
- من أهم شروط اتفاقية السّلْم أن تكون محققة لمصلحة المسلمين.

ولكن قد يشاركهم هذا الحق غيرهم من أهل الذمة، لأن طبيعة هذا الدين لا تمنع التعايش مع غير المسلمين، وقد نص الفقهاء على أن الذمي يعامل معاملة المواطن المسلم من هذه الناحية ، قال الكاساني: "الذمي من أهل دار الإسلام"[١٣٨].

رابعا– جنسية الذمي: إن الذمي في الدولة الإسلامية يعامل على اعتبار أنه مواطن، وبعبارة أخرى تكون له جنسية الدولة الإسلامية التي يعيش فيها. وللجنسية معنى اجتماعي، فالجنسية إذن علاقة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة. و من ذلك يتضح لنا أن الذمي هو مواطن في الدولة الإسلامية يحمل جنسيتها، وبموجب هذه المواطنة، فإن معاملته من النواحي السياسية إنما يجب أن تنبثق من هذا التصور سوى بعض الاستثناءات التي تقتضيها طبيعة الدولة الإسلامية.

خامسا– تولي الذمي للوظائف العامة: إن الوظائف العامة في نظر الشريعة الإسلامية ليست حق للفرد على الدولة، وإنما هي تكليف تكلف بها الدولة إذا كان أهلا لها، وواجب يقوم به إذا عهد إليه القيام بها. وبعض الوظائف العامة لا يكلف بها الذمي، لأن طبيعتها تقتضي ألا يتولاها إلا المسلم: كالخلافة، والإمارة على الجهاد، ووزارة التفويض. ومن الطبيعي ألا يتولى مثل هذه المناصب إلا من يدين بالإسلام، وكذلك الجهاد، والقتال من أنواعه، لأن الجهاد يقوم على معنى ديني، فمن البديهي أن لا يكلف به ولا تناط أعماله إلا بمن يدين بدين الإسلام[١٣٩].

سادسا– حقهم في التعاليم والاجتماع وإبداء الرأي: لم ينص الشريعة الإسلامية وقواعدها على ما لا يمنع غير المسلمين من تمتع الذميين بالتعليم، وتعليم أبناءهم وفق ديانته، أو أن ينشئوا المدارس الخاصة بهم، وليس فيها كذلك ما يمنعهم من حرية إبداء الرأي والاجتماع إعمالا للقاعدة أن الأصل في التصرفات الإباحة، غير أن ذلك كله مقيد بعد إساءة استعمال هذا الحق، كأن يبشروا بدينهم بين أبناء المسلمين، أو يحملوا رعبا أو رهبا على معتقداتهم، لأن ذلك ردة وهي جريمة في نظر الإسلام. كما أن إبداء آرائهم مخصوص في شؤونهم الخاصة وفيما لا علاقة له بالأمور الإسلامية، و بحدود القواعد الشرعية والمصالح الإسلامية، دون الطعن على الإسلام وشعائره ودينه وأهله.

---

138 الكاساني: ص٢١٣.

139 الوجيز: المرجع السابق، ص١١٨.

المستضعفين.

حقوق المواطنين (أهل الذمة) في المجتمع الإسلامي: إن تعدد الأديان والأجناس ظاهرة عامة تكاد لا تخلو منها دولة أو مجتمع من المجتمعات. ونحن لا نجد أحدا من العلماء السابقين استخدموا كلمة المواطنة. يقول د. طه جابر العلواني: المواطنة هي انتماء إلى تراب تحده حدود جغرافية، فكل من ينتمون إلى ذلك التراب مواطنون يستمتعون بما يترتب على هذه المواطنة من الحقوق والواجبات التي تنظم بينهم لا بشيء آخر سائر العلاقات[١٣٤]. فالمواطنة في المفهوم الإسلامي تعتمد على معيارين هما: الانتساب الديني والإقامة. وقد تم استغلال هذه الإشاعة للإثارة على أن المجتمع الإسلامي يفي بحقوق الأقليات غير المسلمة.

حقوق أهل الذمة داخل المجتمع الإسلامي:

أولا– حرية الدين والعقيدة: إن القرآن الكريم هو الذي يرسم الخطوط العريضة لطريقة التعامل مع أهل الكتاب فيما يخص دينهم ثم يأتي التطبيق العملي من الرسول ﷺ ثم الخلفاء الراشدون من بعده. وهذه الحرية الدينية حق مضمون للذميين يجب على المسلمين أن يعاملوهم بمقتضاه وهي كذلك من أبرز مبررات عقد الذمة، وهذا الواقع ينبثق من نظرة الإسلام إلي العقيدة، حيث لا يجوز الإكراه عليها لأنها من أعمال القلب، قال تعالى: "لا إكراه في الدين"[١٣٥].

ثانيا– حق المساواة: قرر القرآن حق المساواة وفرضها على الناس جميعا. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير"[١٣٦]. ومبدأ المساواة بين المواطنين في الدولة الإسلامية ثابت فلا تختلف حقوق وواجبات المسلمين عن غير المسلمين إلا فيما يقتضيه اختلاف العقائد؛ لأن التسوية بين المتساوين عدل، فإن التسوية في الأوضاع غير المتساوية ظلم، وفي ذلك تأكيد لمبدأ المساواة لا استثناء منه ، ويقول الشهيد عبد القادر عودة: "فحمل المسلمين على ما يخالف عقيدتهم أو الذميين كذلك هو طعن في مبدأ العدالة والمساواة"[١٣٧].

---

134 العلواني طه جابر، مقدمة **حقوق المواطنة غير المسلم في المجتمع الإسلامي**: راشد الغنوشي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات المتحدة الأمريكية، ١٩٨٩م، ص٦٠.

135 البقرة: ٢٥٥.

136 الحجرات: ١٣.

137 عودة، عبد القادر، **التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي**: (بيروت: دار الكتب العربي، ١٣٧٤هـ.)، ص٥١٣-٥١٤.

ثالثا– الحرب من أجل حماية الأقليات المسلمة الضعفاء: قال تعالى: ﴿وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا﴾[١٢٨]. إن هذه الآية تشير إلى الدفاع عن المستضعفين وحماية الأقليات المسلمة التي تقيم في ديار الكفر. قال الإمام القرطبي في قوله تعالى: ﴿وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله﴾ حض على الجهاد وهو يتضمن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب ويفتنونهم في الدين، فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمته وإظهار دينه واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من عباده، وإن كان في ذلك تلف النفوس، وتخليص الأسرى واجب على جماعة المسلمين إما بالقتال وإما بالأموال"[١٢٩].

رابعا– القتال مع ناقضي العهد: اتفق العلماء على أن حرب ناقضي العهد واجب، سواء كانوا من أهل الأمان، أو من أهل الذمة، أو من أهل الحرب. والمستأمن الذي دخل ديار الإسلام بعقد أمان من الحاكم، أو من أحد أفراد المسلمين، فله حق السياحة في ديار الإسلام ما دام ملتزما بشروط عقده، فإن أخل بشروطه نقض عهده وبلغ مأمنه ووجب قتاله[130]. أما العهود الأخرى التي نقض أصحابها عهدهم فعلى المسلمين حربهم بدليل قوله تعالى: ﴿إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين﴾ [131] وقوله تعالى: ﴿وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون﴾.[132] وذكر د. أحمد عبد الرحمن: بأن هناك دواعي كثيرة للحرب، منها: درء الفتنة، وردّ العدوان، واغتيال المحاربين، وقتال الطائفة الباغية، والقتال لدفع المظالم[١٣٣]. هذه هي دواعي الحرب في الإسلام وتبين لنا منها بأن الحرب تقوم في الإسلام على دفع العدوان، سواء أكان ذلك عدوانا على الدين، أو عدوانا على

---

١٢٧ **سنن أبي داود:** ج٤، ص٢٤٦.

١٢٨ النساء: ٧٥.

١٢٩ **تفسير القرطبي:** ج٥، ص٢٧٩.

١٣٠ الدكتور إسماعيل إبراهيم محمد أبو شريعة، **نظرية الحرب في الشريعة الإسلامية:** ص٤٤.

١٣١ التوبة: ٤.

١٣٢ التوبة: ١٢.

133 د. عبد الرحمن، **الإسلام والقتال:** (القاهرة: دار الشرق الأوسط، د.ت.)، ص٤٣-٨٢.

يجوز قتالهم. وإزالة الفتنة واجب على المسلمين حينما يضطهد الناس في دينهم ويفتنون في عقائدهم ويتعرضون للعذاب وألوان الأذى، ويجب أن يُقاتلوا حتى يكون الناس أحراراً لكي يختار الإنسان دينه طواعية. والإسلام لا يتعطش للدماء بل يريد إحياء الأموات ويشهد على ذلك التاريخ خلال القرون، وإليك صورة من صور الحرب الذي قام به المسلمون تدل على أخلاقية الحرب عندهم، ألا وهى غزوة القادسية[120] في عهد خليفة عمر – رضى الله عنه – الذي التقى الجيش الإسلامي تحت قيادة سعد ابن أبي وقاص والجيش المجوسي تحت قيادة رستم في القادسية"[121]. نعم، الحرب لإزالة العوائق عن طريق الدعوة لإخراج الناس من الظلمات إلي النور طواعية، لا من أجل إدخال الناس إلي الإسلام كراهية؛ لأن إجبار الناس على الدخول في الإسلام وتغيير عقائدهم بالقوة تخالف "من شاء" وتخالف مفهوم الآيات الكريمة الآتية: قال تعالى:"لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم"[١٢٢]. أي أنه لا يكره أحد على الدخول في الإسلام ونظيره قوله تعالى: ﴿ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين﴾[١٢٣]. وقوله تعالى: ﴿فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ﴾[١٢٤]

ثانيا– الحرب لحماية النفس والمال: قال تعالى: ﴿أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز﴾" [125] وقال تعالى: ﴿ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين﴾"[126]. هذه الآيات تشير إلى وجوب الحرب لحماية النفس والعرض والوطن والمال. وأخرج أبو داود عن سعيد بن زيد عن النبي ﷺ أنه قال: "من قتل

---

[١١٩] البقرة: ١٩٣.

[١٢٠] القادسية: مدينة على حادة الكوفة، بينها وبين الكوفة ١٣ فرسخا.

[١٢١] الحافظ ابن كثير، **البداية والنهاية**: ج٧، ص٤٤.

[١٢٢] البقرة: ٢٥٦.

[١٢٣] يونس: ٩٩.

[١٢٤] الشورى: ٤٨.

[١٢٥] الحج: ٣٩-٤٠.

[١٢٦] البقرة: ١٩٠

صموئيل: "نحن اليهود، نحن المدمرون، سوف نبقى مدمرين إلى الأبد ".[111] هؤلاء هم اليهود، وهذه هي نظرهم للتعايش مع الآخرين، ولكننا نراهم اليوم يتحدثون عن السلام!!! فما هو حكم هذه الاتفاقيات؟ وما هو واجبنا تجاهها؟

حسب شروط اتفاقيات السّلْم وضوابطها في الإسلام، نجد أن هذه المعاهدات من الهندوس واليهود باطلة، وعليه فإنه لا يجوز اعتقاد صحتها أو تنفيذ شيء منها. وبيان ذلك:

أولاً: هذه المعاهدات تنص على إزالة كل أسباب العداوة والبغضاء بين المسلمين وبين الهنود واليهود. وهذا الشرط باطل لأنه يخالف أصل الإيمان. كما أشار إليه تعالى: "لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم....."[113].

ثانيا: هذه المعاهدات أقرت اليهود على ما أخذوا من أرض الإسلام عنوة وغدراً في لحظة ضعف للمسلمين، وهذا لا يجوز. فأرض فلسطين فتحها المسلمون، فأصبحت بذلك أرضاً إسلامية لا يجوز التخلي عنها..[114]

ثالثا: هذه المعاهدات من عقود الإكراه، وعقد الإكراه لا يجوز في الإسلام[115]،كما قال نادرة محمود سالم. قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم".[116]

رابعاً: هذه المعاهدات أفسدت حتى دنيا المسلمين، فقد زعم من وقع هذه المعاهدات أنها ستحقق الخير للمسلمين في الدنيا، وأن هذا السلام سيعود بالخير والرخاء على شعوب المنطقة.

والحقيقة على العكس من ذلك تماما.[117] وبالمجمل نقول: فقد تخلى موقعو هذه الاتفاقيات لليهود عن دينهم وعزتهم وكرامتهم ومقدسا تهم، فأي كسب يعدل هذه الخسائر[118]؟

دواعي الحرب:

أولا– حماية الدين وإزالة الفتنة: قال تعالى: "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين"[119]. المسلمون يحملون راية التوحيد، وهم مأمورون بنشرها، وإذا وقفت أمامها القوة أية ما

---

112 انظر: الرفاعي، فواد، **حقيقة اليهود:** ص٥٧.

113 المجادلة: ٢٢.

114 المرجع السابق، ص٣-٤.

115 سالم، نادرة محمود، **عقد العمل بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي:** (القاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٩٤م)، ص٨٥.

116 النساء: ٢٩.

117 المرجع السابق، ص٥.

118 انظر: المرجع السابق ص٥-٧.

يسيل غزيراً من دماء أبنائها، نقف في هذا البحث مع قضية مهمة، تُعدّ أساساً متيناً في الصراع الذي قام وما يزال قائماً على أرض كشمير وفلسطين، وتعتبر تأصيلاً مهماً في فهم طبيعة هذا الصراع حتى نفهم لماذا يتصرف الهنود واليهود بهذه الكيفية، علينا أنْ نهاجر إلى عقولهم، حتى نعلم كيف يفكرون، وكيف ينظرون إلى الآخرين.

يعتقد الهنود "كل ما في العالم ملك للبرهمي، وللبرهمي حق في كل موجود"[١٠٦]. وأنهم شعب الله المختار ولا يدنس بذنب ولو قتل العوالم الثلاثة[١٠٧]. وهكذا معتقداتهم الفاسدة والمنحرفة على دينهم، حتى إنهم قتلوا نصف مليون من المسلمين في الهند بعد استقلال بريطانيا عام١٩٤٧م. ونشرت جريدة سنغرام اليومية (البنجلاديشية) يوم ١٢/٤/ ١٩٨٩م أن الهندوس قتلوا المسلمين بعد استقلال من استعمار بريطانيا نصف مليون، وهجموا على المسلمين ١٥،٠٠٠ مرة، وجرحوا نصف مليون، وحرقوا خمسين ألف بيت. وأنهم يعتقدون أن الأرض الهندية للهندوس ، ولا يجوز لأبناء المواطن غير الهندوس أن يعيش في هذه الأرض. كما يعتقدون "وأهلك نسل داس (عبد)"[١٠٨]. ونحن نلاحظ أن الهند ألغت من مناهجها التعليمية الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تنص على الجهاد بالرغم من الاتفاقيات على إدخالها في مناهج التعليم حتى إنهم رفضوا تدريس صحيح البخاري في المدارس الدينية؛ لأنه يشتمل على كتاب المغازي.... هذا هو شأن الهندوس في الهند. أما اليهود في فلسطين أخطر وأشق على الأمة الإسلامية. إن اليهود يعتقدون أنهم شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحباؤه. و تلمودهم حافلة بالآراء والأفكار المنحرفة.

- الأيمان التي يؤديها اليهودي للأجنبي لا قيمة لها، ولا تلزم اليهودي بشيء لأنه لا أيْمان بين اليهود والحيوان.
- يجوز لليهودي أن يشهد زوراً.
- يستحب أو يجب على اليهود غش الأجنبي(غير اليهود)
- إذا جاء ك اليهودي و غير اليهودي متخاصمين ، فإن أمكنك أن تتحيز إلى الإسرائيلي فافعل.[١٠٩]

ولهذا نهانا الله عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين﴾[١١٠] والمقصود بالولاء هنا هو التحالف والتناصر. وقال تعالى: "ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم".[١١١]

---

106 شلبي، د. أحمد، **مقارنة الأديان**: الطبعة الثامنة، (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٨٦م)، ص٦٣.

107 نفس المرجع، ٦٢.

108 Weech, The people and religions of India, p311.

109 انظر: الرفاعي، فؤاد بن سيد عبد الرحمن، **حقيقة اليهود**: (دار صلاح الدين، د. ت.)، ص ١٨.

110 المائدة: ٥١.

111 البقرة، ١٢٠.

بالكافرين وكيف لا!!! إذا أجاز الإسلام قتل البشر الذين يقفون أمام الدعوة، فمن باب أولى إتلاف أموالهم إن كان فيها إضرار بهم.[٩٨]

حكم قطع الأشجار والزرع وقتل الحيوانات: اتفق العلماء على جواز قطع الأشجار والزرع لو كانت هناك مصلحة للمسلمين أو مضرة بالكافرين أثناء الحرب مستدلا بفعل النبي ﷺ[٩٩]. وذلك أن النبي ﷺ لما نزل على حصون بني النضير، حين نقضوا العهد بمعونة قريش عليه يوم أحد، أمر بقطع نخيلهم وإحراقها..... فشق ذلك على النبي - صلى الله عليه وسلم -. ووجد المؤمنون في أنفسهم حتى اختلفوا[١٠٠]. فنزلت هذه الآية. قال تعالى :" ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين"[101]. وما أخرجه الشيخان عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بأنه قال: حرق رسول الله ﷺ نخل بني النضير وقطع، فنزلت "ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله"[102]. قال الكاساني:" ولا بأس بقطع أشجارهم المثمرة وغير المثمرة وإفساد زرعهم.. ولا بأس بإحراق حصونهم بالنار، وإغراقها بالماء وتخريبها وهدمها عليهم ونصب المنجنيق عليهم .. "[١٠٣].

فما الحكم فيما إذا تضرر المسلمون بقطع الأشجار والزرع؟ قال ابن قدامة من الحنبلية: لا يجوز إذا كان فيه ضرر بالمسلمين لحاجتهم إلى الاستظلال أو الاستتار به أو الأكل منه[١٠٤]. قال الإمام القرطبي: إذا علم المسلمون أن ذلك لهم لم يفعلوا، وإن يئسوا فعلوا. وذهب إليه الإمام مالك وعليه يميل أصحاب الشافعي. وذكر ابن العربي: والصحيح جواز ذلك. وقد علم رسول الله ﷺ أن نخل بني النضير له، ولكنه قطع وحرق ليكون ذلك نكاية لهم[١٠٥]. واتفق الفقهاء على قتل الحيوانات في الحرب لو كانت هناك منفعة عائدة على المسلمين أو مضرة بالكافرين.

---

٩٨ الشهيد عبد الله عزام، **في الجهاد آداب وأحكام**: ص٢٢.

٩٩ الشافعي، محمد بن إدريس، **الأم**: ج٤، ص٢٥٨.

١٠٠ انظر: **تفسير القرطبي**: ج١٨، ص٦.

١٠١ الحشر: ٥.

١٠٢ أخرجه البخاري في **صحيحه**: ج٤، ص١٤٧٩.

١٠٣ انظر: الكاساني، **بدائع الصنائع**: ج٧، ص١٠٠.

١٠٤ ابن قدامة، **الكافي في فقه ابن حنبل**: ج٤، ص٢٦٩.

١٠٥ **تفسير القرطبي**: ج١٨، ص٦.

إليه، و كذلك حكم الصبي المراهق[٩٢]. وهناك حالات يختلط النساء والصبيان بالمقاتلين بحيث لا يمكن المقاتلة إلا بقتلهم، ففي هذه الحالة يجوز قتلهم. وقال الإمام السرخسي: لا يمتنع تحريق حصونهم بكون النساء والولدان فيها فكذلك لا يمتنع ذلك بكون الأسير فيها ولكنهم يقصدون المشركين بذلك، لو منعناهم من ذلك يتعذر عليهم قتال المشركين والظهور عليهم، لو قدروا على التمييز فعلا لزمهم ذلك فكذلك إذا قدروا على التمييز بالنية يلزمهم ذلك[٩٣]. ويجوز قتل كل من هؤلاء إذا كان ملكا أو الشيخ الكبير إن كان ذا رأي يعين في الحرب، كما أقر رسول الله ﷺ أبا عامر الأشعري على قتل "دريد بن الصمة"، وقد تجاوز المائة يوم حنين وهو شيخ لا قتال فيه وكان أصحابه يستعينون برأيه، والحديث في الصحيحين[٩٤]، لأن الرأي من أعظم المعونة في الحرب. قال السرخسي: "لا تقتل الشيخ الكبير .....فإن دريد بن الصمة قتل يوم حنين وكان مائة وستين وقد عمى وكان ذا رأي في الحرب"[٩٥].

حكم قتل الراهب في الحرب:

الراهب لا يقتل في الحرب عند بعض الفقهاء مطلقا. وعند الجمهور لا يقتل إذا كان في صومعته ولا يخلط مع الناس، ولكن إذا خلط مع الناس جاز قتله، لأن الناس يقتدون بهم، فهم يحثون الناس على القتال فعلا. وإن كانوا لا يحثونهم على ذلك لا يقتلون. وقال المرداوي الحنبلي في قتل الراهب: "وقيد بعض الأصحاب عدم قتل الراهب بشرط عدم مخالطة الناس فإن خالط قتل وإلا فلا، والمذهب لا يقتل مطلقا"[٩٦]. ونقل الإمام السرخسي عن رأي الحنفية أنه لا يقتلون: سأل أبو يوسف أبا حنيفة عن أصحاب الصوامع والرهبان، فرأى قتلهم حسنا، وفي السير الكبير مروي عن أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – أنهم لا يقتلون، وهو قول أبي يوسف، ومحمد – رحمهم الله تعالى –. وقيل لا خلاف في الحقيقة فإنهم إن كانوا يخالطون الناس يقتلون عندهم جميعا؛ لأن المقاتلة يصدرون عن رأيهم وهم الذين يحثونهم على قتال المسلمين. وإن كانوا لا يخالطون الناس أصلا فإنهم لا يقتلون، لأنهم لا يقاتلون بالفعل ولا بالحث عليه[٩٧].

---

[٩٢] انظر: **فتح الباري**: ج٦، ص١٤٨.

[٩٣] انظر: السرخسي، **المبسوط**: ج١٠، ص٣٢.

[٩٤] أخرجه البخاري في **صحيحه**: ج٤، ص١٥٧١.

[٩٥] السرخسي، **المبسوط**، ج١٠، ص١٣٧.

[٩٦] المرداوي، **الإنصاف**، ج٤، ص١٢٨.

[٩٧] السرخسي، **المبسوط**، ج١٠، ص١٣٧.

وهذه الآية صريحة في جواز ذلك، وهي محكمة ولا دليل على نسخها.

- ما رجحناه سابقاً من أن الأصل في العلاقات الدولية هو السِّلْم لا الحرب.
- إن الإبقاء على الصلح الطويل الأمد هو ما يقتضيه واجب الوفاء بالعهد، وليس في القرآن الكريم أو السنة نص على منع هذا الصلح. أما مصالحة الرسول ﷺ لقريش على عشر سنين، فلا تدل على أن ما هو أكثر من ذلك لا يجوز.
- استدل ابن القيم على ذلك بمصالحة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأهل خيبر لما انتصر عليهم، على أن يجليهم متى شاء، قال: "ولم يجئ بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم البتة، فالصواب جوازه وصحته"[٨٦].

حكم قتل النساء والولدان والشيوخ في الحرب:

بوّب الإمام مسلم: "باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب"وذكر حديثا عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنه – بأن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله ﷺ مقتولة، فأنكر رسول الله ﷺ قتل النساء والصبيان[٨٧]. فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز في الإسلام قتل النساء والولدان والشيوخ في الحرب إلا المقاتلة[٨٨]. وروي عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال:" انطلقوا باسم الله، وبالله، وعلى ملة رسول الله، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا، ولا صغيرا، ولا امرأة، ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين"[٨٩]. ولا يجوز في الإسلام قتل النساء والولدان والشيوخ في حرب ولا غيرها ما لم يقاتلوا، لنهي الرسول ﷺ عن قتلهم. قال ابن حجر: "واتفق الجميع على منع القصد إلى قتل النساء والولدان؛ أما النساء فلضعفهن، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر"[٩٠]. والحديث الذي روي عن رباح بن ربيع قال: كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا، فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء. فجاء، فقال: على امرأة قتيل. فقال: "ما كانت هذه لتقاتل"[٩١]. وقوله عليه السلام "ما كانت هذه لتقاتل" فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت. وقال الشافعي والكوفيون:

---

85 النساء: ٩٠.

86 ابن القيم، **زاد المعاد في هدي خير العباد**: (الطبعة المصرية ومكتبتها، د.ت.)، ج٢، ص٧٧.

٨٧ أخرجه مسلم في **صحيحه**: ج٣، ص١٣٦٤.

٨٨ المقاتلة: مفاعلة في المشاركة من الجانبين.

٨٩ أخرجه أبو داود في **سننه**: ج٣، ص٣٧.

٩٠ **فتح الباري**: ج٦، ص١٤٨.

٩١ أخرجه أبو داود في **سننه**: ج٣، ص٥٣.

عدوان إلا على الظالمين" [٧٨].

ويشير الأستاذ الزحيلي كذلك إلى أن الآيات المطلقة عن شن الحرب محمولة على الآيات المقيدة المبيحة للقتال بسبب العدوان أو الاعتداء.[٧٩] ومن الأمثلة الواضحة على ذلك قوله تعالى: "واقتلوهم حيث ثقفتموهم"[٨٠]. فهذه آية عامة يقيدها قوله تعالى: "وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين"[٨١]. فالله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين أن يقاتلوا المعتدين دفعاً للعدوان، وحتى لا يقفون حائلاً أمام وصول الدعوة إلى المدعوين، ونكون بهذا الفهم قد قررنا مبدأ حمل المطلق على المقيد إذا تماثل السبب بينهما، فالآية المطلقة عن تشريع القتال سواء وجد اعتداء أم لا، مقيدة بالآية التي تفيد أن القتال لمن قاتلنا واعتدى علينا. وأما النهي عن موالاة الكافرين، فليس معناه النهي عن مسالمتهم والإحسان إليهم، لأن المراد من الموالاة: الاستنصار بهم، والاطمئنان إليهم، وإطلاعهم على أسرار المسلمين، وعلى هذا الوجه تكون الآيات الداعية إلى السَلْم محكمة غير منسوخة، وتكون آيات العفو والصفح معمولاً بها في غير حال الاعتداء، وبحسب ما تقتضيه السياسة الإسلامية والمصلحة العامة[٨٢].

حكم مدة السَلْم مع الأعداء: يرى جمهور الفقهاء أنه يجوز موادعة أهل الحرب على أي مدة كانت ما دامت في ذلك مصلحة للمسلمين؛ أما إن لم تكن مصلحة فلا يجوز، لقوله تعالى: "فلا تهنوا وتدعو إلى السَلْم وأنتم الأعلون....."[٨٣] بينما يرى الإمام الشافعي والإمام أحمد أنه لا تجوز مهادنة المشركين أكثر من عشر سنين استناداً إلى ما روي عن الرسول ﷺ في صلح الحديبية، فإن صولح المشركون على أكثر من ذلك فالصلح منتقض.[٨٤] والرأي الراجح هو الذي ذهب إليه الجمهور والأدلة على ذلك:

---

77 البقرة: ١٩٣.

78 الزحيلي، وهبة، **العلاقات الدولية في الإسلام**: ص٢٥.

79 المرجع السابق، ص٩٦.

80 البقرة: ١٩١.

81 البقرة: ١٩٠.

82 انظر: الزحيلي، وهبة، **العلاقات الدولية في الإسلام**: ص٩٦.

83 محمد: ٣٥.

84 انظر: **الموسوعة الفقهية**: ج٢، ص٩-١٠.

وكفالة الحريات. وبهذا "يصبح السلام هو القاعدة الدائمة، والحرب هي الاستثناء الذي يقتضي الخروج عن هذا التناسق الممثل في دين الله الواحد، بالبغي والظلم، أو بالفساد والاختلال"[٦٩].

ويلخص لنا الشهيد سيد قطب – رحمه الله – فكرة السلام في الإسلام بقوله: "السِّلْم قاعدة والحرب ضرورة".[٧٠] ويؤيدنا في ذلك ما قرره الفقهاء الأوائل من أن الباعث على القتال هو دفع الاعتداء وليس المخالفة في الدين. وقال الحنفية: "الآدمي معصوم ليتمكن من حمل أعباء التكليف، وإباحة القتل عارضة سُمح به لدفع شره". وقالوا أيضاً: "الكفر من حيث هو كفر ليس علة لقتالهم". وقال الإمام مالك: " لا ينبغي لمسلم أن يراق دمه إلا في حق، ولا يريق دماً إلا بحق". وقال الحنابلة: "الأصل في الدماء الحظر إلا بيقين الإباحة"[٧١]. وقال ابن الهمام الحنفي في قوله تعالى: ﴿وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة﴾[٧٢] فأفاد أن قتالنا المأمور به جزاء لقتالهم ومسبب عنه. وكذا قوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾[٧٣] أي لا تكون فتنة منهم للمسلمين عن دينهم بالإكراه بالضرب والقتل[٧٤].

وهذا هو الأمر المقرر لدى فقهاء القانون الدولي، حيث يقولون بأن الحالة الطبيعية بين الدول هي السلام، والحرب حالة وقتية عارضة مهما كان سببها.[٧٥] وفي سلوك قادة المسلمين في المعارك ما يؤكد أن القتال في الإسلام ليس إلا تدعيماً لأصل السلام الذي أسست عليه حياة الناس. وما توجيهات أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – لجيش أسامة إلا بيان لامتداد مفهوم السِّلْم، ليكون مستمراً في جميع الأحوال؛ لأنه مرتبط بعقيدة المسلم الذي ينطلق في أمره كله باسم الله سبحانه، واستجابة لأمره ونهيه. أما الذين يلجئون إلى تغليب قاعدة القتال في الإسلام استناداً إلى آيات القتال العديدة، فهم يغفلون القاعدة الأساسية، ولا يبحثون عن السياقات الخاصة للظروف التي نزلت فيها تلك الآيات. وهذه قضية لا بد من بسطها وتوضيحها لنخرج منها بفهم دقيق لهذه المسألة. وقد بين الأستاذ وهبة الزحيلي أن هذا السبب يرجع إلى أحد أمرين:

- دفع الظلم، كما في قوله تعالى: "أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير"[٧٦].

---

69 قطب، سيد، **السلام العالمي والإسلام**: ط ١٢، (دار الشروق، ١٩٩٣م)، ص٢١.

70 المرجع السابق، ص٢٩.

71 الطبري، محمد بن جرير، **اختلاف الفقهاء**: التحقيق شاخت، (ب. ت. م.)، ص١٩٥.

72 التوبة: ٣٦.

73 البقرة: ١٩٣.

74 ابن الهمام، **فتح القدير**: ج٤، ص٢٧٩.

75 الزحيلي، وهبة، **العلاقات الدولية في الإسلام**: ص١٤١.

76 الحج: ٣٩.

قالت: "استأذنت رسول الله ﷺ في الجهاد"، فقال: "جهادكن الحج"[٦٣].

خامسا- السلامة من الضرر: يراعي الإسلام ظروف فاقد القدرة على الحركة والسير وحمل السلاح، لأن الحرب تحتاج إلى جسم كامل القوة، وسليم الأعضاء والحواس[٦٤]. قال الله تعالى: ﴿ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما﴾[٦٥]. وقال تعالى: ﴿ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم﴾[٦٦].

سادسا- وجود النفقة: لا تجب الحرب على الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون في طريقه. والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج....﴾[٦٧]. أما إذا كانت الحرب على باب البلد، فحينئذ تجب عليهم، لأنه لا حاجة إلى نفقة الطريق.

حكم السّلْم والحرب أيهما أولاً؟

فكرة السّلْم في الإسلام فكرة أصيلة عميقة، تتصل اتصالا وثيقاً بطبيعته. فقد جاء الإسلام ليحقق مبدأ العدالة في الأرض قاطبة، ويقيم القسط بين البشر عامة. فالإسلام يريد السلام، ولا يريد العدوان والاستعلاء في الأرض، يريد السلام بين العبد ونفسه، فلا غش ولا حقد، والسلام بين العبد وربه، فهو دائم الصلة والخشية والمراقبة، والسلام بين الفرد ومجتمعه، وسلام الشعوب فيما بينها. ورغم هذا الموقف المبدئي من السلام، إلا أن الإسلام دعانا إلى إعداد مستلزمات القوة لمواجهة الأشرار والمعتدين، ذلك أن الإسلام لا يتناقض مع سنة الحياة.

وهذا ما قاله ابن خلدون: "إن الحرب أمر طبيعي في البشر، لا تخلو عنه أمة ولا جيل، وإنما تنشأ حين يريد بعض البشر أن ينتقم من بعض"[٦٨].

وإذا كان الأمر على هذه الصورة من دعوة الإسلام إلى السّلْم والحرب معا. فأيهما الأصل؟ وأيهما الاستثناء؟ إذا ألقينا نظرة فاحصة على نصوص القرآن والسنة، وجدنا أنها تتجه مباشرة دون الدخول في التأويلات إلى إيثار

---

٦٢ **المهذب:** ج٢، ص٢٢٧.

٦٣ أخرجه البخاري في **صحيحه:** ج٣، ص١٠٥٤.

٦٤ ابن رشد، **بداية المجتهد:** ص٢٧٨.

٦٥ الفتح: ١٧.

٦٦ التوبة: ٩١.

٦٧ التوبة: ٩١.

68 ابن خلدون، عبد الرحمن، **المقدمة:** ص٣٢٦.

- أن يكون المسلمون قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك.
- أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين.

وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي، والثوري، والأوزاعي. واستدلوا باستعانته ﷺ بناس من اليهود في خيبر، وبصفوان بن أمية في يوم حنين[٥٣].

ب : لا يجوز الاستعانة بغير المسلمين في الحرب: وإليه ذهب الإمام مالك، وأحمد[٥٤].

واستدلوا بما روته عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: جاء رجل - قبل غزوة بدر- إلى رسول الله ﷺ وقال: "جئت لأتبعك فأصيب معك"، فقال له رسول الله ﷺ: "تؤمن بالله ورسوله؟" قال: "لا"، قال: "فارجع فلن أستعين بمشرك"[٥٥].

الجمع بين الروايات: الحافظ ابن حجر جمع بين هذه الروايات، وقال: إن الذي رده يوم بدر تفرس فيه الرغبة في الإسلام، فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه أو أن الاستعانة كانت ممنوعة فرخص فيها وهذا أقرب، وقد استعان يوم حنين بجماعة من المشركين تألفهم بالغنائم"[٥٦]. وذهب جمهور العلماء إلى جواز الاستعانة بالمشركين إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك نظرا لحاجة الأمة الإسلامية. ويجوز الاستعانة بالمنافق إجماعا لاستعانته - صلى الله عليه وآله وسلم - بعبد الله بن أبي وأصحابه[٥٧].

ثانيا- البلوغ والعقل: الحرب في سبيل الله تعالى عبادة تتعلق بالبدن، فلا تجب على المجنون والصبي كالصلاة والصوم[٥٨]. ودليله على ذلك أنه عندما عرض بعض الشباب على رسول الله ﷺ قبل أن يكملوا سن الرشد مشاركتهم معهم في الحرب فلم يقبل عنهم.[٥٩].

ثالثا- الحرية: وقال ابن الرشد: "فلا أعلم فيها خلافا"[٦٠]. والحرية تشترط للحرب لما روي أن النبي ﷺ كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد، ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد[٦١].

---

٥٣ انظر: الزيلعي، **نصب الراية**: ج٣، ص٤٢٣.

٥٤ المرجع السابق. نفس الصفحة .

٥٥ أخرجه مسلم في **صحيحه**: ج٣، ص١٤٥٠.

٥٦ الصنعاني، **سبل السلام**: ج٤، ص٥٠.

٥٧ الشوكاني، **نيل الأوطار**: ج٨، ص٤٤.

٥٨ المرداوي، **الإنصاف**: ج٤، ص١١٥.

٥٩ الإمام البخاري، **التاريخ الصغير**: ج١، ص١٢٠.

٦٠ ابن رشد، **بداية المجتهد**: ص٢٧٨.

٦١ **المغني**: ج٩، ص١٦٢.

بـــل إن العقود التي تقع بين المسلمين أنفسهم إذا تضمنت شروطاً باطلة فهي باطلة كذلك، كما ورد عن الرسول – صـــلى الله عليه وسلم – : "المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً"[49]. هذا الحديث رواه عمـــرو بن عوف. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ولذلك فإن الربا والزنا والقمار وإن كان فيها عقود، فإنها باطلة ولا تقع ولا يجوز الوفاء بها.

رابعـــا– أن يكـــون لمصـــلحة المجتمع المسلم: نلاحظ أن الفقهاء قيدوا أحقّية الإمام في عقد الصلح عن المسلمين بالمصـــلحة بمعنى أن هذا الصلح إذا لم يحقق مصلحة المسلمين، فإنه يعد باطلاً، ولا يجوز الالتزام به. ولكن الفقهاء لم يذكـــروا معايير محددة لهذه المصلحة، وقد نجد بعض الأمثلة لهذه المصلحة في عبارتهم. ومن ذلك: ما قال ابن العربي المـــالكي: "فإذا كان المسلمون على عزة، وفي قوة ومنعة، ومناقب عديدة، وعدة شديدة، وكان للمسلمين مصلحة في الصـــلح مـــن نفع يجلب به، أو ضرر يندفع بسببه فلا بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه، وأن يجيبوا إذا دعـــوا إلـــيه".[50] ومـــا قال الجصاص الحنفي من أنه: "نهي عن المسالمة عند القوة على قهر العدو وقتلهم"[51]. وإذا استأنســـنا بهـــذه الأمثلة، إضافة إلى الغاية من الحرب في الإسلام، وأنها لا تعلن إلا بعد عرض الإسلام على الكفار، لاســـتطعنا مـــن خلالها الخلوص إلى معايير يمكن أن تضبط المصلحة التي شرطها الفقهاء، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

- تمكين المسلمين من نشر الإسلام، وتأمينهم على أنفسهم وأموالهم.
- أن تكـــون المصـــلحة العـــائدة على المسلمين من هذا السّلْم راجحة على المصلحة العائدة على عدوهم منه، أو مساوية لها على أقل تقدير مع وجود المبرر لذلك في الحالتين.
- أن يضـــع الإمـــام نصب عينيه أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فلا يعقد سلماً يعود على المسلمين بالضرر، أو يظهر الأمة الإسلامية بمظهر الضعف والتخاذل، أو يكون فيه تنازل عما لا يجوز التنازل عنه من حقوق المسلمين[52].

شروط الحرب:

ويشترط لوجوب الحرب سبعة شروط، وهي:

أولا– الإسلام: والإسلام من شروط وجوب الحرب؛ لأن الكافر غير مكلف بالأحكام قبل الإيمان. وهل يجوز الاستعانة بغير المسلمين في الحرب أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، وهما:

---

49 **نيل الأوطار**: ج٥، ص٢٥٤.

50 ابن العربي، **أحكام القرآن**: ج٢، ص٧٧.

51 الجصاص، **أحكام القرآن**: ج٢، ص٢٣.

52 انظر: محمود، عبد النور، **الصلح وأثره في إنهاء الخصومة في الفقه الإسلامي**: ص٢١٤.

إن شروط السلم فهي كالآتي:

أولا- التراضـــي: السَــلْم مع الأعداء هو عقد من العقود، والعقود تتطلب لصحتها الرضا والاختيار من الجانبين- المتعاقدين- أما معاهدات السلام القائمة على أساس الإكراه أو القهر أو التي تخضع للقوة والضغوط، فهي معاهدات باطلـــة، لأن ذلك مناف لمقتضى العقد. فالتعبير عن الإرادة يجب أن يكون حراً، واستقرار السَلْم لا يمكن أن يتحقق دون توفــر الرضـــا والاختـــيار[40]. وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن الدعوة إلى السَلْم، إذا كان في هذه الدعوة ذل وإهانـــة للمسلمين، وإذا كان هذا السَلْم قائما على القهر والتسليم للأعداء بالحقوق فلا ينعقد إذن. قال تعالى: "فلا تهـــنوا وتدعوا إلى السَلْم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم"[41]. قال ابن العربي المالكي تعليقاً على هذه الآيـــة: "وقـــد نهى الله تعالى هنا أي السَلْم مع القهر والغلبة للكفار، وذلك بين، وإن الصلح إنما هو إذا كان له وجه يحتاج فيه إليه، ويفيد فائدة"[42].

ثانـــيا- أن تكـــون اتفاقـــية السَلْم واضحة: يجب أن تكون اتفاقية السَلْم واضحة النصوص، بينة الأهداف، تحدد الحقـــوق والالـــتزامات تحديـــداً لا يحتاج إلى التأويل والتلاعب بالألفاظ، فلا تستخدم العبارات التي فيها تورية أو خـــداع أو غش أو غموض، لأن ذلك يوقع في الارتباك، ويحتاج إلى تفسير الاتفاقية بالتحكيم أو القضاء الدولي مما يـــؤدي إلى إحـــباط أهداف الاتفاقية، وإضاعة الحقوق المشروعة، بسبب بطء القضاء وسوء نية الدول المتحضرة[43]. وقـــد حذرنا القرآن الكريم من مكر الأعداء، فقال تعالى: "وخذوا حذركم"[44]. ومن وصايا علي – رضي الله عنه – للأشـــتر الـــنخعي عدم جواز استغلال ضعف المعاهدين أو اللجوء إلى اللف والدوران في تفسير الألفاظ: "لا إدغال ولا مدالسة[45] ولا خداع فيه، ولا تعقد عقداً تجوّز العلل[46]، ولا تعولن على لحن قول[47]، بعد التأكيد والتوثقة"[48].

ثالـــثا- أن لا تكون فيه شروطاً باطلة: لا يجوز للإمام المسلم أن يشترط في صلحه مع الكفار شرطاً يخالف الكتاب والســـنة، وكل شرط يخالف أصول الدين فهو باطل. ومثال الشروط الباطلة أن يتنازل عن شيء من الدين كالصلاة

---

40 انظر: الزحيلي، وهبة، **العلاقات الدولية في الإسلام:** ص١٤٠.

41 محمد: ٣٥.

42 ابن العربي، **أحكام القرآن:** ج٢، ص٧٦.

43 الزحيلي، وهبة، **العلاقات الدولية في الإسلام:** ص١٤٢.

44 النساء: ١٠٢.

45 الإدغال: الإفساد، المدالسة: الخيانة.

46 المراد بالعلل في العقود والكلام: ما يصرفها عن وجهها ويحولها إلى غير المراد.

47 لحن القول: هو ما يقبل التوجيه كالتورية والتعريض.

48 انظر: الزحيلي، **العلاقات الدولية في الإسلام:** ص٦٤٢.

تعالى: ﴿وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله﴾[31]. وذكر محمد عفيفي: "أن القرآن الكريم لا يكاد يمر بمناسبة حضارية تعاونية إلا وينادي بالأمن والسلام، ويرغب في السَّلْم ويحض عليه، وقد ورد السَّلْم ومشتقاته في القرآن الكريم مائة وثمان وثلاثين مرة"[32].

السلم من السنة النبوية الشريفة: مثل حادثة صلح الحديبية المشهورة مع كفار قريش[33].

استناداً إلى هذه النصوص وغيرها يمكن أن نقول: بأن السَّلْم مع الأعداء مشروع، إذا تحققت شروطه وضوابطه، وقد أجمع فقهاء المسلمين على جوازه[34].

مشروعية الحرب:

وقد وردت في مشروعية الحرب آيات وأحاديث كثيرة.

منها قوله تعالى: ﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين﴾[35]. تدل هذه الآية على أن الحرب فرض على المسلمين.

ومن السنة **النبوية** ﷺ:

ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال : لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله"[36].

حكم الحرب في الإسلام:

ذهب جمهور العلماء إلى أن الحرب فرض كفاية على كل أمة محمد ﷺ[37]. والحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري: بأن رسول الله ﷺ بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: "أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج"[38]. هذا الحديث يدل على أن الحرب فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين[39].

---

31 الأنفال: ٦١.

32 عفيفي، محمد، **الإسلام والعلاقات الدولية**: ص٢٥٩.

33 ابن كثير، أبو الفداء، **السيرة النبوية**: ضبط وتصحيح: أحمد عبد الشافي، (بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت)، ج٢، ص٦٠.

٣٤١ بن العربي، محمد بن عبد الله، **أحكام القرآن**: التحقيق: محمد عبد القادر عطا، (بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت.)، ج٢، ص٧٤.

35 البقرة: ١٩٠.

36 أخرجه البخاري في **صحيحه**: ج ١، ص١٧.

37 انظر: المرجع السابق: ص٢٨-٣٠.

38 أخرجه مسلم في **صحيحه**: ج٣، ص١٥٠٧.

39 السمرقندي، محمد بن أحمد، **تحفة الفقهاء**: ج٣، ص٢٩٤.

أ- **العـــاقد:** وهـــو المصالح - بضم الميم وكسر اللام - الذي عقد الصلح. وهو الإمام أو الخليفة. فقد اتفق الفقهاء عـــلى أن الذي يتولى هذا العقد، هو الإمام أو نائبه، فإذا عقد أحد المسلمين العقد بغير إذن الإمام أو نائبه، لم يصح العقـــد عـــند جمهور العلماء[٢٣]؛ لأن عقد معاهدات السّلْم أمر خطير يمس سيادة الدولة الإسلامية ويحتاج إلى سعة نظـــر، وبعـــد رؤيـــة. وذكر في الفتاوى الهندية نقلا عن مذهب الحنفية: يجوز إذا تولاه فريق من المسلمين وتوفرت المصلحة فيه، واحتجوا لذلك بأن المعوّل عليه هو وجود المصلحة وقد وجدت[٢٤]. وكما أجازها سحنون من المالكية مع الكراهة للضرورة.[٢٥]

ورأي الجمهور هو الراجح، وذلك للأسباب التالية:

- إن تقدير المصلحة يحتاج إلى بعد نظر، ولا شك أن الإمام أقدر من غيره على ذلك.
- إنه كان عليه العمل في الزمن الأول، حيث كان حق عقد المعاهدة بيد الرسول ﷺ ومن بعده بأيدي خلفائه.

والدكـــتور وهـــبة الزحيـــلي رجّح هذا الرأي في كتابه "العلاقات الدولية في الإسلام"[٢٦]. ب- المعقود عليه: وهو المصـــالَح أو المسالَم عنه — بضم الميم وفتح اللام — وهو الشيء المدعى به، أو محل الصلح كما يسميه القانونيون[٢٧]. فقد يكون المسالم عنه أرضاً اختلف عليها، أو إيقافاً للحرب لمدة معينة، أو غير ذلك.

ج- **الصيغة:** وهي ما يكون به العقد من قول كالإيجاب والقبول. تبياناً لإرادة العاقد وكشفاً عن كلامه النفسي[٢٨].

د- **المشروعية:** من أركان عقد السّلْم أن يكون مشروعاً، أي أن يكون متفقاً مع أحكام الشريعة ولا يصادم مبدأ من مبادئها، عملاً بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"[٢٩]. وفي السّلْم قال ابن الهمام: لا بد من توافر المصلحة المشروعة وإلا لم يجز العقد[٣٠].

مشروعية السلم:

---

23 انظر: ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد، **المغني:** (مكتبة القاهرة، د. ت.)، ج٩، ص٢٩٨.

24 جماعة من علماء الهند، **الفتاوى الهندية:** (مصر: الطبعة الأميرية الكبرى ، ١٣١٠هـــ)، ج٢، ص ١٦٦.

25 الموافق، محمد بن يوسف بن أبي القاسم، **التاج والإكليل لمختصر خليل:** (ليبيا: مكتبة النجاح)، ج٣، ص٣٨٦.

26 انظر: وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص ٢١٢ — ٢١٣.

27 عبد النور، محمود محجوب، **الصلح وأثره في إنهاء الخصومة في الفقه الإسلامي:** (بيروت: دار الجيل، ١٩٨٧م)، ص ٢١٢.

28 المرجع السابق، نفس الصفحة.

29 انظر: **صحيح مسلم بشرح النووي:** (بيروت: دار المعرفة، ١٩٩٦م)، كتاب:٣٠، باب: ٨، رقم١٧، ج١، ص٢٤٢.

30 انظر: ابن الهمام، **فتح القدير:** ج ٤، ص ٢٩٣.

وهذا المعنى هو المراد هنا.

ثانيا- تعريفه من حيث الاصطلاح:

بعد تتبع واستقصاء التعريفات العديدة وجدنا أن الجهاد: هو قتال المسلم لكافر غير ذي عهد بعد دعوته إلى الإسلام وإبائه، لإعلاء كلمة الله.

وهناك تعريفات أخرى ذكرها أئمة المذاهب: قال ابن الهمام من الحنفية: "الجهاد دعوة الكفار إلى الحق وقتالهم إن لم يقبلوا"[١٤]. وذكر الكاساني بأن الجهاد هو: "بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله - عز وجل - بالنفس والمال واللسان أو غير ذلك أو المبالغة في ذلك"[١٥]. وابن حجر من الشافعية ذكر في فتح الباري: "الجهاد شرعا هو بذل الجهد في قتال الكفار .. ...فتقع باليد والمال واللسان والقلب"[١٦]. وكذلك عرفه السيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي: "القتال في سبيل الله مأخوذ من المجاهدة، وهي المقاتلة في سبيل الله"[١٧]. والمقصود من القتال كما قال عبد الحميد الشرواني: "الهداية وما يتبعها من الشهادة، وأما قتل الكفار فليس بمقصود"[١٨]. وقال العبدري من المالكية: بأن الجهاد بالسيف، هو قتال المشركين على الدين أي ليدخلوا من الكفر إلى الإسلام لا على الغلبة[١٩] أو بعبارة أخرى، قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله[٢٠]. وقال الدكتور وهبة الزحيلي: الحرب هو صراع مسلح بين دولتين أو بين فريقين من الدول، ويكون الغرض منه الدفاع عن حقوق ومصالح الدول المحاربة[٢١].

وفي الموسوعة البريطانية الجديدة: War in the popular sense is a conflict among political groups involving hostilities of considerable duration and magnitude"[22].

أركان السَّلْم:

---

١٣ راجع: **لسان العرب**: تاج العروس مادة: جهد.

١٤ ابن الهمام، **شرح فتح القدير**: ج٥، ص٤٣٥.

١٥ الكاساني، علاء الدين، **بدائع الصنائع**: ج٧، ص٩٧.

١٦ العسقلاني، ابن حجر، **فتح الباري**: ج٦، ص٣.

١٧ الدمياطي، السيد البكري بن السيد محمد شطا، **إعانة الطالبين**: ج٤، ص١٨٠.

١٨ الشرواني، عبد الحميد، **حواشي الشرواني**: ج٩، ص٢١١.

١٩ انظر: العبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم، **التاج والإكليل**: ج٣، ص٣٤٦.

٢٠ الفراوي، أحمد بن غينم بن سالم المالكي، **الفواكه الدواني**: ج١، ص٣٩٥.

٢١ الزحيلي، وهبة، **آثار الحرب في الفقه الإسلامي**: ص٣٥.

٢٢ The New Encyclopedia of Britannica ج٢٩، ص٦٢٨.

تعريف الحرب لغة واصطلاحا

أولا– تعريف الحرب من حيث اللغة:

الحـــرب نقـــيض السلم، أنثى، وأصلها الصفة، يعنون بها القتال، وجمعها حروب[9]. وجاءت في القرآن الكريم كلمة "**حـــرب**" بمعنى القتال. كما في قوله تعالى: ﴿كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله﴾[10]. في هذه الآية كلمة "حرب" تعني القتال كما فسرها المفسرون الأجلاء.

ثانيا– تعريف الحرب من حيث الاصطلاح:

و لم يســـتخدم الفقهاء كلمة "حرب" في الكتب الفقهية كالمصطلح ولكن استعملوها لفظة "الجهاد" لأنها أشمل وأعم مـــن الألفـــاظ الأخـــرى. والموسوعة العربية ذكرت معنى الحرب هي صراع بين مجموعتين كبيرتين تسعى إحداهما لتدمير الأخرى أو التغلب عليها[11].

وهـــذا المعـــنى لـــلحرب لا نجد له مثيلا في الإسلام، ومن هنا يقول الدكتور إسماعيل إبراهيم أبو شريعة: إنه مهما اخـــتلف تعريف الحرب، فهي ليست إلا صراعاً دمويا بين إرادتين، تبغي كل منهما التفوق على الأخرى، والتغلب عليها، وتحطيم مقاومتها[12].

تعريف الجهاد لغة واصطلاحا

أولا– تعريفه من حيث اللغة:

وقد وردت هذه الكلمة في اللغة على المعنيين:

أ– الجهد: وهو الوسع أو الطاقة، بفتح الجيم وضمها، وقيل: الجهد – بالضم – وهو الوسع والطاقة.

---

7 المرجع السابق، ص٢٧٧.

8 أبو هيف، علي صادق، **القانون الدولي العام:** (الإسكندرية: دار النقافة، ١٩٥٩م)، ص٦٩٤.

٩ انظر: لابن منظور، **لسان العرب:** مادة: حرب، **تاج العروس**، للزبيدي: (حرب).

١٠ سورة المائدة : ٦٤. انظر **الكشاف:** ج١، ص٦٢٩.

١١ الموسوعة العربية العالمية: ج ٩ ، ص١٥٨.

١٢ أبو شريعة، الدكتور إسماعيل إبراهيم محمد، **نظرية الحرب في الشريعة الإسلامية:** ص٢٢.

التي انتهى إليها هذا البحث.

تعريف السلم لغة واصطلاحا

أولا- تعريفه من حيث اللغة:

وقد وردت هذه الكلمة في اللغة على المعنيين:

أ- **السلم**: الصلح، التسالم: التصالح، المسالمة: المصالحة، السلم: - بكسر السين وفتحها -، يذكر ويؤنث وهذا المعنى هو المراد هنا.

ب- **الإسلام**: ومنه قول تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السِّلْم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين﴾[1]. وهذا المعنى غير مقصود في هذا المقام.

ثانيا- تعريفه من حيث الاصطلاح:

ولم نجد له تعريفا منضبطا عند الأقدمين من علماء الأصول والفقهاء، بل وجدناهم يعبرون السِّلْم في الشريعة لا يبعد عن حقيقته اللغوية، فهو (يعني الصلح) خلاف الحرب أو ترك الجهاد مع الكافرين مع وجود شروطه.[2] أو هو "مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره، سواء أكان فيهم من يُقر على دينه، أومن لم يُقر، دون أن يكونوا تحت حكم الإسلام".[3]

الصلح: "وهو عبارة عن عقد وضع لرفع المنازعة"[4]. أو هو "صلح يقع بين زعيمين في زمن معلوم بشروط مخصوصة"[5]. وهذا التعريف يشمل الآتي: **عقد الذمة**: وهو إقرار بعض الكفار على كفرهم في ديار الإسلام بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام الدنيوية. **والمهادنة**: وهي الاتفاق على صورة من صور السلام، ولكنها مقيدة بوقت[6]. **الحلف**: وهو عبارة عن معاهدة بين طرفين تنظم العلاقات بينهما تنظيماً يحفظ لكل منهما الرهبة والمنعة،

---

1 البقرة: ٢٠٨.

2 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، **الموسوعة الفقهية**: (مطابع دار الصفوة، ط١، ١٩٩٢م)، ج ٢٥، ص ٢٣٠.

3 الزحيلي، وهبة، **العلاقات الدولية في الإسلام**: (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨١م)، ص ١٣٨.

4 ابن الهمام، كمال الدين، **فتح القدير**: ط ٢، (بيروت: دار الفكر)، ج ٨، ص ٤٠٣.

5 الزحيلي، وهبة، **العلاقات الدولية في الإسلام**: ص ١٣٨.

6 عفيفي، محمد الصادق، **الإسلام والعلاقات الدولية**: ط ٢، (بيروت: دار الرائد العربي،١٩٨٦م)، ص ٢٧٦.

نظرية السلم والحرب في الإسلام

محمد غياث الدين حافظ*

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله ﷺ وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين.

وبعد:

فإن موضوع "السَلْم والحرب" ذو أهمية بالغة، وهو يعتبر من أهم موضوعات العلاقات الدولية في الإسلام. وذلك لأنه يكشف لنا كيف ينظر الإسلام إلى الآخرين، وما هو الأساس الذي يقيم عليه علاقته معهم. والحرب هي وسيلة لحفظ أهداف الحياة، وبها يقوم نظام الصلاح في هذه الأرض؛ لذلك فإن الحرب لا تكون واجباً، ولا أمرا ضروريا، إذا انتفت هذه الدواعي والضروريات. والحرب مشروعة في الإسلام؛ لأنها ضرورة من ضروريات الحياة، ولو لم تكن أمرا مشروعا لغلب الباطل على الحق، ولما كان الإسلام بقيمه ومبادئه باقيا على الأرض، وقد وضع الإسلام ضوابط ونظما للحرب لتحقيق أهدافه وغاياته.

هذه استفسارات حاولتُ في ثنايا هذا البحث أن أقف على إجابات شافية وواضحة، وذلك من أجل الوصول إلى إجابة واضحة وشافية للسؤال المهم، وهو : ما حكم السلام و الحرب المطروحان مع الأديان الأخرى الآن؟

وقد وقفت في هذا البحث على أقوال فقهائنا الأوائل الذين تناولوا قضية السَلْم والحرب وما يتعلق بها من أحكام في الشريعة الإسلامية. وحاولتُ قدر الإمكان لترجيح ما هو الراجح في بعض القضايا الخلافية. كما أنني نظرت فيما كتبه المحدثون في السَلْم، والذين تطرقوا إليه عبر موضوعات العلاقات الدولية في الإسلام، وكانت لهم جهود طيبة في هذا الميدان، واستفدتُ منها كثيراً، ومنهم: فضيلة الأستاذ وهبة الزحيلي، وفضيلة الأستاذ عبد المجيد خدوري، وفضيلة الأستاذ عبد الحميد أبو سليمان.

---

* أستاذ مساعد ورئيس قسم علوم القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ.

الحمد لربنا الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان مالم يعلم ـ وأفضل الصلوات وأتم التسليم على أفصح العرب والعجم الذي أعطي جوامع الكلم، وبعد،

منّ الله عز وجل على الإنسان بنعمة القلم الذي هو أفضل وسائل الإعلام والتعبير، ويدور حوله رحى الدعوة والإرشاد ·فسلفنا الصالح انطلقوا منبثقين من هذه الرؤية القرآنية الراقية إلى التقدم والازدهار، وتعمير الحياة الإنسانية، فبنوا تاريخهم المجيد وماضيهم المشرق، وأتحفوا للعالم و أهله حضارة مثالية شاملة منقطعة النظير، وأثروا مكتبة العلم والمعارف بخدماتهم القيمة النادرة،وكان لهم قصب السبق في الميادين كلها من العلم والثقافة والتكنولوجيا، حكموا العالم كله بسياستهم الرشيدة وقيادتهم الحكيمة فأصبحت الأمم كلها رهينة بخدماتهم وعلومهم في شتى المجالات ·

مما يؤلمنا أن المسلمين قد تخلفوا عن ميادين العلم والثقافة بعد العصور الذهبية ، ونبذوا وراء ظهورهم الأعمال الفكرية من الصحافة والكتابة التي أرشدنا إليها القرآن العظيم ففقدوا مكانتهم المرموقة، وسيادتهم على العالم، وأصبحوا مضطهدين ومستهدفين في أرجاء العالم كلها من قبل حاقدي الإسلام ·

وللخروج من هذا المأزق، وإيقاظ الأمة عن سباتها العميق ، واسترجاع ماضيها المجيد الضائع، ولتلعب دورها الحضاري الرائد حاملة رسالتها الإسلامية العريقة والتراث الإسلامي الأصيل الذي أنتجته العقول المسلمة في عصور التقدم والازدهارشجعت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ، بنغلاديش طلابها على إصدار مجلة علمية دعوية وبدأت سيرها في ميدان الصحافة والكتابة منذ عامين بإصدار مجلتها العلمية، وذلك لتدريبهم على ممارسة الصحافة الهادفة المبنية على الأفكار السامية والأيدلوجيات الإسلامية· ومن هذه السلسلة المتواصلة نقدم إلى القراء الكرام العدد الثاني منها ·

فنرجو من السادة القراء والباحثين أن يسمحوا عن الهفوات والأخطاء اللاشعورية الصادرة في إخراج هذه المجلة إلى حيز الوجود، فالكمال لله وحده سبحانه إنه عليم خبير.

٢٠ شوال ١٤٢٤هـ

المحتويات

نظرية السلم والحرب في الإسلام	٦	محمد غياث الدين حافظ
الجندية في عهد خير القرون	٣٠	د. أبو جمال محمد قطب الإسلام نعماني
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم	٤٠	د. عمر عبد العزيز قريشي
الاستشراق : نشأته وأهدافه	٥٤	محمد رشيد زاهد
الشاعر المخضرم كعب بن زهير وشعره	٦٤	شاكر عالم شوق

مجلة طلاب كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ٢٠٠٣ م

الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ

المستشارون

البروفيسور د. إي ، كي، إم، أزهار الإسلام
الأستاذ الدكتور أبوبكر رفيق
الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم البري
الأستاذ الدكتور عمر عبد العزيز قريشي
الأستاذ الدكتور نور الإسلام
الأستاذ الدكتور عطر علي
الأستاذ الدكتور سيد أطهر
الحاج بديع العالم
الأستاذ الدكتور مدحت عطية

هيئة التحرير

محمد غياث الدين حافظ د. أبو جمال محمد قطب الإسلام نعماني
محمود الحسن محمد هارون الرشيد

المساعدون

محمد أيوب الأنصاري
محمد عميم الإحسان

محمد أبو الكلام أحمد صفا
فاروق أمين محمد مجاهد الإسلام
أ.ف.م. نورالزمان أ.س.م. سراج الإسلام
محمد سعيد الرحمن أبو بكر صديق

مجلة طلاب كلية الشريعة ٢٠٠٣ م

إصدار :

طلاب كلية الشريعة

الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ

تشوكبازار، شيتاغونغ- ٤٢٠٣

الهاتف : ٧-٦٣٨٦٥٦ ، ٦٢٥٢٣٠-٦١٠٣٠٨، ٨٥٠٠-٦١-٣١-٨٨٠

الفاكس : ٦١٠٣٠٧-٣١-٨٨٠

البريد الإلكتروني : info@iiuc.ac.bd

الموقع : www.iiuc.ac.bd

الحرم الدائم

كوميرا، شيتاكندو، شيتاغونغ

الهاتف : ٣٢٩١٣٩-١٨٠

حرم داكا

رقم المنزل : ٦٣، رقم الشارع : ٣

دانمندي : المنطقة السكنية

داكا : ١٢٠٥، بنغلاديش

الهاتف : ٨٦١٣٢٩٤، ٨٦٢٩٩٤٧-٢٠

الفاكس : ٨٦٢٤٦٩٢-٢٠

تاريخ الإصدار:

ديسمبر ٢٠٠٣ م

شوال ١٤٢٤هـ

مجلة

طلاب كلية الشريعة
والدراسات الإسلامية ٢٠٠٣م

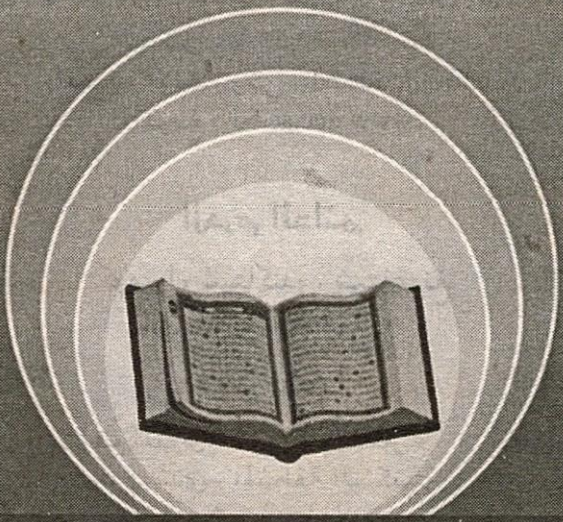

الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ
International Islamic University Chittagong

CENTRAL LIBRARY
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY, CTG.
Acc. No: J-1606
Date: 07-02-2017

مجلة

طلاب كلية الشريعة
والدراسات الإسلامية ٢٠٠٣م

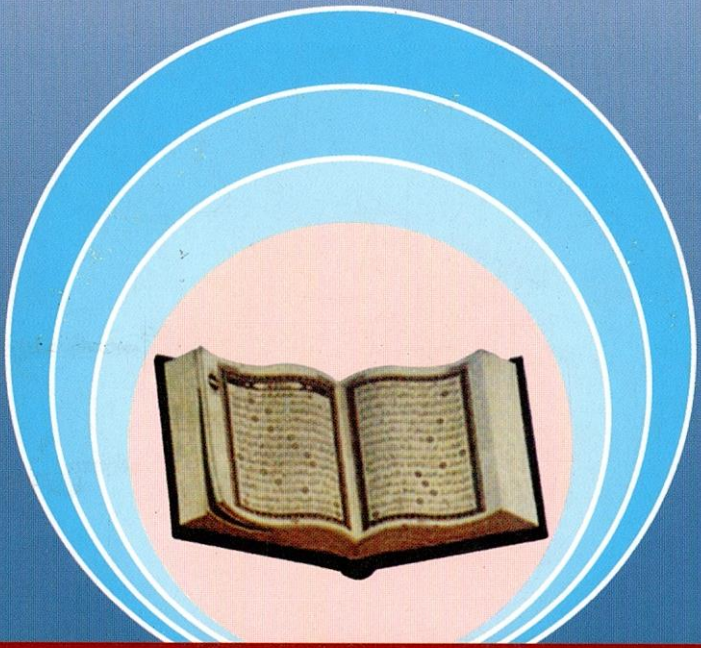

الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ
International Islamic University Chittagong